আপনার প্রশ্ন আমার জবাব
খামোখা ঝগড়া করে কী লাভ?

পূন্যের সন্ধানে

মূল:

মাওলানা ইলিয়াস ঘুম্মান সাহেব দা.বা. পশ্চিম পাকিস্তান

অনুবাদ:

ইবাদুর রহমান

লক্ষ্য করুন!

পৃথিবীতে আপত্তিরও শেষ নেই, আপত্তিকারীরও অভাব নেই। নাউযুবিল্লাহ-লোকেরা সাহাবায়ে কেরামের উপর কতইনা আপত্তি তুলেছে। এমনকি আপত্তির ক্ষেত্রে নবী-রাসূলদেরকেও ছাড়েনি। পরিশেষে আল্লাহ তায়ালার উপরও আপত্তির ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। জিহাদ ও মুজাহিদীনদের উপর আপত্তি তোলা নতুন কিছু নয়। বরং তা যুগযুগ ধরেই চলমান। মনে রাখবেন সব আপত্তির জবাব নেই, প্রত্যেক প্রশ্নেরই উত্তর দিতে আমরা বাধ্য নই। যারা ভাগ্যবান তাদের আল্লাহ তায়ালার একটি বাণীই যথেষ্ট। আর হতভাগাদের হাজারও আপত্তির জবাব দিয়েও কোন লাভ নেই। ইতিহাস যার জ্বলন্ত স্বাক্ষী।

بسم الله الرحمن الرحيم

হৃদয়ের আকুতি

আজ ২৬ জুমাদাল উখরা ১৪২২হি: মোতাবেক ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০১ খৃ: রোজ শনিবার সময় বিকাল ৩টা। রাওয়াল পিন্ডি শহরের আড়াইয়ালাহ জেলের ৪ নাম্বার চৌকির তিন নাম্বার সেলে বসে বান্দা ইলিয়াস এক আরজু পেশ করছি। মুসলিম উম্মাহর কর্ণধার,হে ওলামা, খুতাবা, মুদাররিসীন, মুবাল্লেগীন ও মাশায়েখে কেরাম! আমি এক ব্যাথাতুর হৃদয় দিয়ে আপনাদের খিদমতে এক ফিকরী দাওয়াত পেশ করছি যে, আপনাদের সকল ব্যস্ততাই দ্বীন। ইনশা আল্লাহ এতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু যদি দ্বীনের বুলন্দি এবং দ্বীনদারদের জান, মাল, ইজ্জত ও ঈমানের সংরক্ষণ এবং শাআইরুল্লাহর (পৃথিবীতে আল্লাহর নির্দেশনাবলী) মর্যাদা রক্ষা ও ইসলামের বিধানাবলীর প্রচলন এবং খিলাফতে ইসলামিয়ার পূণর্জীবন ও স্থায়ীত্ব আপনারা চেয়ে থাকেন। তাহলে নিজেদেরকে বর্তমান খিদমাতগুলোর পাশাপাশি জিহাদের জন্যও পেশ করুন। অন্যথায় নিজেদেরও মিটে যেতে হবে এবং পুরো মুসলিম উম্মাহ ও ইসলাম নিশ্চিহ্ন হবার অপরাধ কাঁধে নিয়ে হাজির হতে হবে ঐ আদালতে যেখান থেকে ঘোষনা হচ্ছে إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ।

অমূল্য বাণী

হযরত আকদাস মুফতি রশীদ আহমাদ লুধিয়ানভী দা.বা. এরশাদ করেন, আল্লাহ তা'য়ালা সকল মুসলমানকে বিশেষ করে ওলামাগনকে জিহাদের বুঝ দান করুক! কারন জিহাদ বিমুখতা ও উদাসীনতার লাঞ্চনা ও শাস্তি ওলামাগনের উপরই আসবে আল্লাহ তা"য়ালা বলেন :

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (سورة العنكبوت:13)

নিশ্চই তারা নিজেদের বোঝার সাথে অন্যদের বোঝাও বহন করবে এবং ক্বিয়ামত দিবসে নিজেদের মনগড়া কথা সমূহের ব্যাপারে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। (সূরা আনকাবুত : (জাওয়াহেরে রশীদিয়া খ:১ পৃ:১৭)

একটি স্বপ্ন

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের উপর আমরিকা হামলা করার প্রায় এক বছর পূর্বের কথা। আমি তখন ভাওয়ালপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দি। একটি স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলাম, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমাম শাইখুল হাদিস ওয়াত তাফসীর মাওলানা মোহাম্মদ সরফরায খান সফদর এর কাছে। হযরত ব্যাখ্যা দিলেন। কতিপয় বন্দুর পরামর্শে ও হযরতের নির্দেশে মুসলিম উম্মাহর প্রতি মহা সুসংবাদ হিসেবে ব্যাখ্যাটি এখানে পেশ করছি।

উস্তাদে মোহতারাম হযরত আকদাস মাওলানা মোহাম্মদ সরফরায খান সফদর সাহেব দা.বা. আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আপনার পূর্ণাঙ্গ ও স্থায়ী সুস্থতা কামনা করছি। এবং আমাদের মত অযোগ্যরা আপনার মহান সত্তা থেকে বরাবর উপকৃত হবার তাওফিক চাচ্ছি।

হযরত ! আমি ভাওয়ালপুর জেলে থাকা অবস্থায় সামান্য বিরতি দিয়ে পরপর দুটি স্বপ্ন দেখলাম। হযরতের কাছে উভয় স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার আবেদন জানাচ্ছি।

এক.

আমি দেখলাম যে, দিনের বেলা স্বপ্নে দাজ্জালকে দেখলাম। অত:পর গ্রেনেড দ্বারা তার উপর আক্রমন করলাম। কিন্তু আমার গ্রেনেড হামলা থেকে সে বেঁচে গেল। আর আমার নিক্ষিপ্ত গ্রেনেডটি যমিনের একটি গর্তে ঢুকে গেল। যা মহিষের জন্য খুটা গাড়ার স্থান তৈরী হয়েছিল।

দুই.

পরবর্তিতে দেখলাম,হযরত ওমর রা.সামনে বেড়ে গ্রেনেডটি বের করতে লাগলেন। কিন্তু পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবার রা.তাঁকে এ থেকে বিরত রাখলেন। এবং একটি ফ্লাশের মাধ্যমে গ্রেনেডটি বের করতে লাগলেন।এ অবস্থা দেখে আমি তাৎক্ষণিক ভূপৃষ্ঠে লুটিয়ে পড়লাম। গ্রেনেডটি বের করতেই তা বিস্ফোরিত হলো। আমার মনে হল, এর কারণে আমি শাহাদাত বরণ করলাম

জবাব /স্বপ্নের ব্যাখ্যা

মহান আল্লাহ তা'য়ালাই প্রকৃত সমাধান দাতা। এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো, আফগানিস্থানের বর্তমান পরিস্থিতি, সেখানে আমেরিকা দাজ্জালের ভূমিকায় রয়েছে। এবং কিছু সংখ্যক মুজাহিদ শহীদ হবে। কিন্তু শেষ পরিণতিতে ইন্‌শাআল্লাহ তালেবানরাই বিজয় লাভ করবে।

আল্লাহ তা'য়ালাই সর্বজ্ঞ।

ابو زاهد محمد سرفراز خان

(১)

মাখদুমুল উলামা শাইখুল হাদিস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধলভী রহ. এর সুযোগ্য খলিফা শাইখুল মাশাইখ ফযীলাতুশ শাইখ হযরাতুল আল্লাম আব্দুল হাফিজ মক্কী দা.বা. এর অভিমত।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ،

স্নেহাষ্পদ মুহতারাম মাওলানা ইলিয়াস ঘুম্মান সাহেব তাঁর কিতাব جهاد في سبيل الله .... এর পান্ডুলিপি অধমের কাছে পেশ করলেন। যাতে এই গুনাহগার নিজের অভিমত ব্যাক্ত করে। তাঁর এই কিতাবে আকাবিরে উলামা ও বহু মাশায়েখের অভিমত ছিলো। তাদের অভিমত থাকা অবস্থায় এই গুনাহগারের অভিমত নেয়ার কোন প্রয়োজন ছিলো না। কিন্তু তাঁর সম্প্রীতি ও ভালোবাসা, অধিকন্তু অভিমত লিখাকে আপন সৌভাগ্য মনে করে বরকতের জন্য কয়েক লাইন লিখলাম।

জিহাদ ও ক্বিতাল কুরআনুল কারীমের শত শত আয়াত ও হাদিসে নববীর সহস্রাধিক ভাষ্য দ্বারা প্রমাণিত। যার ভিত্তিতে পূর্বাপর সমস্ত ওলামায়েকেরাম এর অস্বীকারকারীকে কাফের ও ইসলামের গন্ডি থেকে বহির্ভূত ফতোয়া দিয়েছেন।

কাদিয়ানীরা কাফের হবার কারণ সুমহের মাঝে একটি মৌলিক কারণ হল, জিহাদ অস্বীকার। সকল আলেম এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন ।

আবার অন্যান্য ইবাদতের ন্যায় জিহাদের জন্যও রয়েছে কিছু শর্ত, কিছু আদব, যে এগুলোর প্রতি লক্ষ্য না রাখবে বাহ্যত তার জিহাদ আল্লাহর দরবারে মাকবুল হবে না।

কুফুরী ও তাগুতি শক্তি সর্বদাই জিহাদ বন্ধ বা জিহাদের দূর্নাম রটানোর সর্বত প্রচেষ্টা করছে। ওলামায়ে ইসলামও সর্বদা এর মুকাবিলা বিভিন্ন ভাবে করছেন। ইলমী দলীল প্রমাণ দ্বারা জিহাদের বাস্তবতা ও উপকারিতা তুলে ধরছেন।

আল্লাহ তায়ালা হযরত মাওঃ ইলিয়াছ ঘুম্মানকে আপন শান মোতাবেক জাযায়ে খায়ের দান করুন। তিনি অত্যন্ত হৃদয় আগ্রহী হয়ে ও প্রমাণ ভিত্তিক আলোচনার দ্বারা জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহর বাস্তবতা, প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারীতা তুলে ধরছেন। এবং আপন পরের পক্ষ থেকে জিহাদ সংক্রান্ত যে সকল অভিযোগ ও সংশয় উত্থাপন করা হয় তার সন্তোষজনক জবাব দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা তার এই মহান প্রচেষ্টাকে স্থায়ী অনুগ্রহে কবুল করুন। এবং মুসলিম উম্মাহকে তাঁর এই কিতাব দ্বারা উপকৃত করুন। আমীন!

وصلى الله تعالى على خير خلقه وسيد رسله وخاتم أنبيائه ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلَّم تسليما كثيرا كثيرا –

রব্বে কারীমের রহমত প্রত্যাশী
আঃ হাফিয মক্কী
শুক্রবার ৪শাবান ১৪২৬হিঃ

(২)

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়্যাহ পাকিস্তানের সম্মানিত ছদর জামিয়া ফারুকিয়া করাচীর সুযোগ্য মুহতামিম ফযীলাতুশ শাইখ হযরত মাওলানা সলীমুল্লাহ খান সাহেব দা.বা.

بسم الله الرحمن الرحيم

জিহাদ প্রসঙ্গে উর্দূ ভাষায় অনেক কিতাব লেখা হয়েছে, প্রত্যেক লিখকের সামনেই একটা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকে যেগুলো তিনি সুস্পষ্ট করতে চান।

আলোচ্য কিতাবের মধ্যে মাও: মাওলানা ইলিয়াস ঘুম্মান সাহেব জিহাদ বিষয়ে উত্থাপিত নতুন পুরাতন অনেক আপত্তি ও সংশয়ের সমাধান পেশ করেছেন। তিনি কোরআন সুন্নাহ ঐতিহাসিক প্রমাণাদীর আলোকে সন্তোষজনক উত্তর দিয়েছেন। তাঁর লিখনীর মাঝে এক ধরনের বিশেষত্ব ও আকর্ষণ রয়েছে যা কিতাবের শেষ পর্যন্ত পাঠকের কাছে আগ্রহ বজায় রাখবে।

আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন এই কিতাবকে তার সৃষ্টির জন্য উপকারী ও মকবুল বানান। আমীন !!

সলিমুল্লাহ খান
৬-৬-১৪২৬ হি:
১৪-৭-২০০৫ ইং

দারুল উলূম হাক্কানিয়ার মুহতারাম শাইখুল হাদিস মুরশিদুল মুজাহিদীন হযরত মাওঃ ডা. শের আলী শাহ দা.বা. এর অভিমত।

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد

লাহোরের কতিপয় ফুযালার মাধ্যমে আমার এক শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর হযরত মাওলানা ইলিয়াস ঘুম্মান সাহেবের পত্র পৌঁছেছে। এতে মাওঃ তার অনবদ্য সংকলন “জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ......” এর উপর কিছু অভিমত লেখার নির্দেশ দিয়েছেন। কয়েক দিন যাবৎ আমি বিছানায় শায়িত কিছু পড়া ও লেখা কোনটাই সম্ভব নয়। কিন্তু হযরত মাওঃ আমাদের সাবেক আফগান জিহাদ ও জিহাদি কাফেলা সমূহের উজ্জল নক্ষত্র যারা সাওর, বাড়ি, তোরগোর, খোস্ত ও গরদীজ ইত্যাদী এলাকার ভয়াবহ অভিযান সমূহে কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছেন। আমার অন্তর পৃষ্ঠে আজো গেঁথে আছে সেই আলোকিত চেহারাগুলো। সেই পবিত্র গুণাবলির অধিকারী বীর বাহাদুর নওজোয়ান আর বৃদ্ধদের স্মৃতিগুলো।

বিশেষ করে হরকাতুল জিহাদের একজন বয়োবৃদ্ধ মুজাহিদের কথা আজও স্মরণে পড়ে। যখন রাশিয়ান একঝাঁক যুদ্ধ বিমান অনবরত বোমা বর্ষণ করে যাচ্ছিল তখন সে বৃদ্ধ বড় আনন্দ ও উদ্দীপনার সাথে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে যাচ্ছিল। আর বলছিল দেখুন মাওলানা ! আমাদের বাদ্য বাজানো শুরু হয়ে গেছে। আমি এক কবিতা বললাম।

আসছে স্মরণ আজকে আমার স্মৃতিময় সেদিন.
ছাওর প্রান্তে হরকত নীড় বেধেছিল যেদিন।
চার দিকে দেখ আত্মা জাগানিয়া ইমানের পরিবেশ.
সুরে সুরে আজ ইসলামীগীত গেয়ে যাই বড় বেশ।
কোথায় পাবো তুমি বলো খোদা,বীর গাজীদের এ মানযার
জীবন যাদের তাকওয়ায় ভরা চেহারাতে ছিল পূর্ণ নূর।

মুহতারাম মুহা. ইলিয়াছ ঘুম্মান সাহেবের সাথে জিহাদী সম্পর্কের মাধ্যমে এই কিতাব খানা মুতালার (পড়ার) তাওফিক হয়। ফলে এ বিষয়ে অনেক কিছু জানার সৌভাগ্য হয়।

মুহতারাম মাওঃ ঘুম্মান সাহেব দা.বা. জেল জুলুমের সংকীর্ণ ও তমসাছন্ন এক পরিবেশে বসে আযীমুশ শান এই জিহাদী খিদমাত আঞ্জাম দিয়ে ফক্বীহুল উম্মত আল্লামা সারাখসী রহ. এর ইতিহাস তাজা করে দিলেন। (দেখুন-আল-মাবসুত লিস সারাখসী খন্ড:১পৃ:৫) আল্লামা সারাখসী রহ. অন্ধকার কুয়ার নির্যাতন ক্লীষ্ট এ পরিবেশের মাঝে “আল-মাবসুত” এর মত এক মহাগ্রন্থ সংকলন করেছেন। যা ৩০ খন্ডে সমাপ্ত। চাঁদনী রাতের আবছা আলোতে তার শাগরেদরা মধ্যরাতে এসে কুয়ার আশ পাশে জমা হত। আর আল্লামা সারাখসী রহ. গভীর কুয়ার মধ্য হতে তাদের দিয়ে লেখাতেন।

মাশাআল্লাহ অধ:পতনের এযুগেও এমন মহা মানব পাওয়া যায়। যারা জেলখানার নির্যাতন ক্লীষ্টপরিবেশে বসেও “কলমী জিহাদ” আঞ্জাম দিয়ে যায়। জিহাদ বিষয়ে আব্দুল্লাহ বিন মোবারক রহ. এর যমানা হতে আজ পর্যন্ত হাজারের অধিক কিতাব লেখা হয়েছে। কিন্তু আমাদের গৌরব মাওলানা ইলিয়াস ঘুম্মান সাহেবের কিতাব এক বিশেষ তা’ছীরী আন্দাযে লেখা হয়েছে। যা পাঠ করলে হৃদয় মনে এক ভিন্ন অনুভূতি ও তৃপ্তীময় আনন্দ উপলব্ধি হয়।

কবির ভাষায়

প্রতিটি ফুলেই রয়েছে ভিন্ন রুপ ভিন্ন ঘ্রাণ।

বক্ষমাণ কিতাবটি এমন এক বিপদসংকুল অবস্থায় লেখা হয়েছে যখন চারদিকে শুধু অত্যাচার নির্যাতন, হিংস্রতা, বর্বরতা, কুফুরী ফেৎনা ও তাগুতী শক্তির ঘুটঘুটে অন্ধকারে আচ্ছন্ন সমগ্র ইসলামী জগত। দিকে দিকে শুধু হতাশা আর হতাশা। ভালো ভালো নির্ভীক বক্তা যারা জিহাদের উপর উদ্দমতা সৃষ্টিকারী বক্তৃতার মাধ্যমে

শ্রোতাদের মুখ হতে "আল জিহাদ" "আল জিহাদ" "আল ক্বিতাল" "আল ক্বিতাল" এর শ্লোগান বের করে আনতেন আজ তারাও "জিহাদ" শব্দ উচ্চারণ করতে ভয় পাচ্ছেন। কিছু কিছু ছাত্র তাদের উস্তাদগণের খেদমতে উপস্থিত হয়ে অভিযোগের সুরে আরজ করে যে, হযরত! আমরা এমন কোন কবিরা গুণাহে লিপ্ত হলাম যে আগের মত আমরা আর আপনাদের মোবারক সাক্ষাতে ধন্য হতে পারি না। এবং আমাদের সাক্ষাতভীতি আপনাদের এতটাই গ্রাস করেছে যে, এক ধরণের لا مساس এর ভূমিকা নিয়ে আপনারা চলতে থাকেন। এমন অবর্ণনীয় পরিস্থিতিতে জিহাদ বিষয়ে হযরত ইলিয়াস ঘুম্মান সাহেবের লেখনীর মত কোন জানদার ও আত্মাজাগানিয়া কিতাবের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। যা দ্বারা মৃতপ্রায় অন্তর ও আশাহত হৃদয়গুলোতে প্রাণের স্পন্দন ফিরে আসবে। এবং তাতে জিহাদের জুশ ও জযবা উদ্বেলিত হবে।

দোয়া করি আল্লাহ তা'য়ালা এই আযীমুশ শান দ্বীনি ইলমী ও জিহাদী খিদমতকে কবুল করুন। এবং এই অমুল্য তোহফা দ্বারা বিশিষ্ট, সাধারণ সকলকে উপকৃত করুন।

আমীন-আমীন একবার নয় বার বার,
তৃপ্ত নহে আত্মা আমার যদি না হয় হাজার বার।

শের আলী শাহ
খাদিমুত ত্বলাবা দারুল উলূম হাক্বানিয়া
আকুড়া খটক
১৭জুমাদাল উলা ১৪২৬হি.

রঈসুল মুনাযিরীন হযরত মাও. আবুদস সাত্তার সাহেব তিউনুসুয়ী দা. বা. এর অভিমত।

بسم الله الرحمن الرحيم

মুহতারাম হযরত ইলিয়াস ঘুম্মান সাহেব “জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ আওর এ’তেরাযাত কা ইলমী জায়েযা” এই বিষয়ে যে বিশ্লেষণধর্মী কিতাব লিখেছেন আমার ধারণায় তা একটি নযীরবিহীন কিতাব। কিতাবটি তার পাঠকের জন্য ব্যাপক কল্যাণ বয়ে আনবে। আল্লাহ তায়ালা হযরত মাওলানার মেহনত কবুল করুন। আমীন ছুম্মা আমীন।

মুহা. আ. সাত্তার তিউনুসুয়ী

১৩ জুমাদাল উলা ১৪২৬

(৫)

হযরত মাওলানা মুফতি হামিদুল্লাহ জান সাহেব দা. বা. এর অভিমত।

بسم الله الرحيم الرحيم
نحمده ونصلي علي رسوله الكريم

ক্বিতাল ফি সাবীলিল্লাহ সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে শত শত আয়াত ও হাজার হাজার হাদীস এবং রাসূলে কারীম সা. এর দশ বৎসরের মাদানী জীবনে এমন সুস্পষ্ট ও অকাট্য দলির-প্রমাণ রয়েছে যা অস্বীকার করা প্রখর রোদ্রে দাঁড়িয়ে সুর্যকে অস্বীকার করার নামান্তর। এবং এটা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কুফরের শক্তি বৃদ্ধি বৈ কিছু নয়। মাওলানা ইলিয়াস ঘুম্মান সাহেব "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ আওর এ'তেরাযাত কা ইলমী জায়েযা" নামে কিতাবটি এমন এক সময়ে রচনা করেছেন যখন একদিকে কুফরি শক্তি বর্বরী তাণ্ডবের ফলে এ বিষয়ে কলম ধরাই মহাপাপ। অপরদিকে মুসলিম ঘরাণার কিছু লোক জ্ঞানগত ও রাজনৈতিক বিভিন্ন দ্বিধা ও সংশয় সৃষ্টি করে জিহাদের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। মাওলানা ঘুম্মান সাহেব অত্যন্ত সতর্কতার সাথে দুধারী কলমের তলোয়ার ব্যবহার করে উভয় পক্ষের উত্তম মোকাবেলা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তার এই মেহনতকে কবুল করে উম্মতে মুসলিমার জন্য পথের প্রদীপ বানিয়ে দিন। আমীন! ছুম্মা আমীন!!

হামিদুল্লাহ জান
খাদিমুল হাদীস ওয়াল ইফতা
জামিয়া আশরাফিয়া লাহোর
৭/১২/২৫ হি.

(৬)

হযরত মাওলানা মুহা. ইউসুফ যাই দা. বা. এর অভিমত।

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلوة والسلام علي من لا نبي بعده

এক. প্রথম শতাব্দী তথা নববী যুগ ও সাহাবা যুগের প্রতি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে তাকালে এ বাস্তবতা দোদিপ্যমান হয় যে, পৃথিবীতে ইসলাম পবিত্র জিহাদের মাধ্যমেই ছড়িয়েছে। আর স্থির থেকেছে মাদারিস-মাসজিদ ও ওলামাগণের মাধ্যমে।

দুই. যখন থেকে মুসলমানরা জিহাদ বিমুখ হয়েছে তখন থেকেই ইসলামের সম্প্রসারণ থেমে গিয়েছে। আর যে ভূখণ্ড থেকে মাদারিস মাসাজিদ ও ওলামাগণ হারিয়ে গেছেন, সেখান থেকে ধীরে ধীরে ইসলাম ও বিদায় নিয়েছে। স্পেনের ইতিহাস আজো আমাদের সামনে, এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা যেমনিভাবে ইসলামকে কিয়ামত অবধি শ্বাশত দ্বীন হিসেবে নির্ধারণ করছেন তেমনিভাবে জিহাদকেও শ্বাশত বিধানরূপে নির্দেশ দিয়েছেন।

তিন. জিহাদ হল মুসলমানদের ইবাদত, মুয়ামালা, মুআশারাহ ও ইয্যত-আব্রু সহ সকল ধর্মীয় শি'য়ারের ব্যবস্থা। তাগুত ও কুফরী বাহিনী এ ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিতে চায়। আল্লাহ না করুন যদি এ ব্যবস্থা ভেঙ্গেই গেল, তাহলে মুসলমানরা তাদের মর্যাদার উপর আর টিকে থাকতে পারবেনা, এমনকি ইসলামের স্বচ্ছ পরিচয়টুকুও দুনিয়া থেকে মুছে যাবে।

চার. জিহাদ আর সন্ত্রাসের মাঝে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। যারা জিহাদকে সন্ত্রাস বলে তারা হয়তো কাফের না হয় মুনাফিক। প্রকৃত পক্ষে সকল বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য ও সন্ত্রাস ইসলাম ও মুসলমানদের মর্যাদা। ১৪শ' বছরের ইতিহাস এর স্বাক্ষী।

পাঁচ. কুরআন অবতীর্ণের সময় কালে যারা জিহাদ থেকে গা বাঁচিয়ে রেখেছে বা জিহাদ প্রসঙ্গে দ্বিধা সংকোচ ও আপত্তি তুলেছে মহান আল্লাহ তাদেরকে মুনাফিক আখ্যা দিয়েছেন তাঁর রাসূলের যবানে। প্রকৃত মুমিন আর ভেজাল মুমিন নিরূপণের কষ্টিপাথর হল জিহাদ।

ছয়. কুরআন-হাদীস ও মুসলমানদের ইতিহাসের মাধ্যমে জিহাদ আমাদের সামনে দ্বিপ্রহরের ন্যায় ভাস্বর। এতে বিন্দু মাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু যেহেতু জিহাদ

মানে জীবনের বাজী লাগানো। বিপদসংকুল কন্টকাকীর্ণ পথে নিজেকে সোপর্দ করা। এ কারণে হীনমন্য আর কাপুরুষের দল সর্বদা জিহাদ থেকে পালানোর চেষ্টা করে থাকে। আর "নিজে বদলে কোরআন বদলাও" এ মূলনীতির আলোকে জিহাদ বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের সংশয় সৃষ্টি করতে থাকে। যদি তাদের দিলে জিহাদের সামান্য জযবাও থাকত তাহলে তারা সংশয় সৃষ্টির পরিবর্তে সৃষ্ট সংশয়ের জবাব খুঁজতো। কিন্তু এমনটা তাদের থেকে কখনোই হয়নি। এ কারণে অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল কোন এক মর্দে মুমিন এই ময়দানে আসবে এবং 'লাওমাতা লাইম' এর আশংকা ঝেড়ে ফেলে এই মহান ফরজ বিধানকে সংশয় সৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করবে। আলহামদুলিল্লাহ এই মহান খেদমতের তাজ আল্লাহ তায়ালা মাও. ইলিয়াস গুম্মানের মাথায় রেখেছেন। যিনি এই ময়দানেরই শাহসওয়ার এবং বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ আওর এ'তেরাযাত কা ইলমী জায়েযা" নামে এক অত্যন্ত মূল্যবান সংকলন উম্মতের সামনে পেশ করেছেন। মাশা-আল্লাহ সুস্পষ্ট এবং সাবলীল ভাষায় দলিল ভিত্তিক তিনি এই বিষয়ের হক্ব আদায় করেছেন। আল্লাহ তার এই কারনামাকে কবুল করুক। এবং আখেরাতে নাজাতের উসীলা বানান। আমীন!

ফজল মুহা. বিন নূর মুহা. ইউসুফ জাই

উস্তাদ, জামিয়াতুল ইসলামীয়া বিননূরী টাউন করাচী, পাকিস্তান।

৯-১০-১৪২৫ হি.

(৭)

মুফতি আবু লুবাবাহ শাহ মানছুর এর অভিমত।

ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্টা করা মুসলমানদের একটি সামষ্টিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, সাহাবায়ে কেরাম রাসূলসা. এর কাফন দাফনের উপর একে অগ্রগণ্য করেছেন। অতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠা একমাত্র জিহাদের মাধ্যমেই হয়েছে। আর ভবিষ্যতেও জিহাদের মাধ্যমেই হবে। এবং সৌভাগ্যবান মুজাহিদ বাহিনীই হযরত ঈসা ও মাহদী আ. এর সাথে মিলিত হয়ে কুফরী শক্তিকে পরাস্ত করবে। এবং একচ্ছত্র ইসলামী খিলাফত কায়েম করবে। এ কারণে কেউ মানুক বা না মানুক জিহাদই হলো নির্যাতিতদের নিরাপত্তা ও অধিকার বঞ্চিতদের অধিকার আদায়ের একমাত্র মাধ্যম। কুরআন-সুন্নাহ, আকল-নক্বল এবং তাজরেবা ও তারীখ এর সাক্ষী। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, যখন থেকে মুসলমানদের ইতিহাসে অধঃপতনের ধ্বস নামল তখন থেকে ইসলামের নেতৃত্ব দান কারী ব্যাক্তিবর্গ গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্তির জন্য শাশ্বত জিহাদের পথ ছেড়ে বিভিন্ন কর্মপন্থা ও নুসখা অবলম্বন করতে লাগলেন। অপর দিকে মুসলিম উম্মাহর জ্ঞানীগুণীজন ইসলামী জিহাদকে কেন্দ্র করে এমন সব অভিযোগ-আপত্তি এবং ধুম্রজাল সৃষ্টি করতে লাগলেন, যার ফলে জিহাদের গুরুত্ব আর প্রয়োজনীয়তার কথা আর কি বলব, জিহাদের বৈধতা ই পশ্নবিদ্ধ হয়ে গেল।

আফগান জিহাদের সৌভাগ্যবান বীর মুজাহিদগণ জিহাদের এ মৃতপ্রায় বৃক্ষটির গোড়ায় সঠিক সময়ে রক্ত সিঞ্চন করলেন। অত:পর তালেবানদের নজীরবিহীন কুরবানীর বরকতে যেই গাফলতীর পর্দা বিদীর্ণ হল যা জাতিকে সঠিক বিষয় জানা থেকে আড়াল করে রেখেছিল। ফলে আপনরা জিহাদের অপপ্রচার করছিল না বুঝে সরলতার কারণে। আর অপররা করে যাচ্ছিল তাদের ধূর্ততার কারনে। এ তো ছিল আমলী কোরবানীর মাধ্যমে এ ময়দান পরিস্কার করা। কিন্তু এর সাথে সাথে এও প্রয়োজন ছিল যে, একটি ইলমী ও গবেষণাধর্মী কাজের মাধ্যমে এই কাঁটাগুলো বের করা। এবং এই বিষাক্ত আগাছাগুলো পরিস্কার করা, যা মুজাহিদগণের রক্তে সিঞ্চিত এই পবিত্র বৃক্ষের আশ পাশে জন্ম নিয়েছে।

বিশিষ্ট, সাধারন সবাইকে এই কিতাবের প্রকাশক, পাঠক, থেকে শুরু করে এর সাথে যৎসামান্যও সংশ্লিষ্ট সবাইকে আনন্দ বোধ করা উচিৎ যে, আমাদের বন্ধুবর

মুহা. ইলিয়াস গুম্মান সাহেব এই "অতি প্রয়োজন" কাজটাকে অত্যন্ত সুন্দর রুপে আঞ্জাম দিয়েছেন। তাঁর এ কর্মের পূর্ণতা ও সৌন্দর্য দেখে মনের অজান্তে প্রশংসা বানী বের হয়ে আসছে। অধম বান্দা কোন কিতাবের উপর কিছু লেখা থেকে সর্বদাই দূরে থেকেছে একাধিক কারণে। কিন্তু জনাব মাসউদ আযহার (দা.বা.) এর পর এটাই হল ২য় কিতাব যার জন্য এই নীতি ভঙ্গ করতে হয়েছে। প্রথম কিতাব ছিল খিলাফত সংক্রান্ত। লাহোরের এক নওজোয়ান আলেমের লেখা। এখন তার নাম স্মরণ নেই। আর বক্ষমান কিতাবটি তো আপনাদের হাতেই রয়েছে। উভয় কিতাবের বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য কাছাকাছি।

একে তো এই বিষয় বস্তুই এমন যে এর স্বপক্ষে কিছু লেখা থেকে বিরত থাকা "فرار من الزحف" জিহাদ থেকে পলায়ন" এর মত মনে হয়। ২য় তো লেখকের অজস্র কুরবানী ও এই মিশনের সাথে আন্তরিক সম্পৃক্ততা এবং জিহাদ ও তাসাউফ এর যৌথ মেহনত, রিয়ামুক্ত বিনয় নম্রতা, সুউচ্চ আখলাক ও অনন্য ব্যক্তিত্ব এসব কিছু এমন বিষয় যা দু'এক কলম লেখা থেকে বিরত থাকার অনুমতি দিচ্ছিলনা। ৩য় তো অধম নিজে যখন কিতাবখানা দেখলো তখন এক বিস্ময়কর আনন্দ দিল ও দেমাগে ছেয়ে গেলো। ফলে নিজের অনিচ্ছায়ই যেন কিছু লিখে দিতে বাধ্য হলাম। পৃথিবীতে কিতাব হাজারো লেখা হয়েছে, তবে গুম্মান সাহেব এ কিতাব লিখে একটি অতি জরুরী কিন্তু আমাদের সমাজে অবহেলিত একটি দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। যুগের বড় একটি চাহিদা পূরণ করেছেন। সাথে সাথে আলোচনার ভাবভঙ্গি ছিল পূর্ণ। সাহিত্যের মানদণ্ডে পূর্ণ অধিষ্ঠিত। শুধু কি তাই? তিনি তার এ লেখনিতে প্রতিটি আপত্তির জবাব দেয়ার ক্ষেত্রে বিতর্কের পন্থা অবলম্বন করার পরিবর্তে গ্রহণ করেছেন একজন দরদী কল্যাণকামী দায়ীর পন্থা। কোথাও কোথাও একটু "খোঁচা" অবশ্য আছে। তবে তাও এতটাই কোমল ভাবে যে, প্রতিপক্ষের মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টির পরিবর্তে ভালবাসা সৃষ্টি হবে। শঠতা দূর হয়ে দেমাগের বাধন খুলবে। ইনশা-আল্লাহ তায়ালা। "বর্শার আঘাতের মাঝেও কোমল ছোঁয়া" এ গুণটি সেই রূহানী নিসবতেরই ফলাফল যা সম্মানিত লেখক আউলিউল্লাহ থেকে অর্জন করেছেন। কিতাবের শুরুতে

জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ কে তার প্রকৃত অর্থে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা এবং শেষে "দুআ" নামক কবিতা উভয়টাই বড় আকর্ষনীয়।

আমাদের আকাবিরগণের যে সকল খিদমাত 'বন্দী জীবনে' সম্পাদিত হয়েছে বাস্তবতায় দেখা গেছে তার সবগুলোই বড় মাকবুল হয়েছে। জেলখানার ব্যারাক সমূহ যেখানে ইলমী কোন উপকরণ নেই, চারদিকে শুধু অস্থিরতা আর জঞ্জালে ভরা সেখানে বসে এমন একটি জটিল ও অস্পৃশ্য বিষয়ের এত সুন্দর ও সফল সংকলন তৈরী করা শুধুই ইখলাস, কোরবানী আর মিশনের সাথে আন্তরিক সম্পৃক্ততারই বরকত। আল্লাহ তায়ালা লেখকের ন্যায় সকল পাঠককে এই বরকতের অংশীদার বানান। এবং এই কিতাবকে তাহরীকে জিহাদ ও ইহয়ায়ে খিলাফত এর প্রচেষ্টা সমূহের মোবারক ও মাকবুল অংশ বানান যা গাযওয়ায়ে ফিলিস্তিনের জন্য মুজাহিদ তৈরীর কাজ আঞ্জাম দিবে।

আসসালাম
আবু লুবাবাহ শাহ মানছুর
২১ শাওয়াল ১৪২৫

(৮)

শাইখুল কুরআন উস্তাজুল উলামা মাও. মো. আসলাম শেখপুরী দা. বা. এর অভিমত।

বেরাদার মাও. ইলিয়াস গুম্মানকে আল্লাহ তায়ালা বহু গুণাবলী এবং বৈশিষ্টের অধিকারী করেছেন। তিনি একদিকে যেমন যোগ্য আলেম তেমনি যোগ্য মুদাররিস। তেজস্বী বক্তা, আবেগ উতল করা কবি। যোগ্য সমাজ সেবক। ওফাদার দোস্ত এবং আনুগত্য প্রবণ শাগরেদ। এসব ছাড়াও তিনি এমন মুজাহিদ যিনি ময়দানে জান-মাল শরীর-মন সব কিছুর বাজী লাগাতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন না। আরেফ বিল্লাহ হযরত মাও. শাহ হাকিম আখতার রহ. এর ইযাযত প্রাপ্ত খলিফা। প্রাণহীন কাগজ-কলমেও বক্তৃতার প্রাণ সঞ্চার করার যোগ্যতা তার অতুলনীয়। কিন্তু সবচে বড় ও উল্লেখযোগ্য যে বিষয় তা হল তিনি তার সিনায় লালন করেন একটি " দিলে দরদমান্দ" ব্যাথাতুর হৃদয়।

"দরদে দিল" এমন একটি মহান দৌলত যা থেকে এই উম্মত আজ বঞ্চিত। ধন দৌলতের প্রাচুর্য, আসবাব উপকরণের আধিক্য, রোড ভর্তি গাড়ী, সুউচ্চ ভবন, নিত্য নতুন সামগ্রী তৈরীকারী ফ্যাক্টরী কোন কিছুতেই কমতি নেই। আর বাস্তবেও এ সকল বিষয়ের কমতি উম্মতের অধঃপতনের কারণ নয়। আসল কারণ হল দরদে দিল না থাকা। অন্তরে দ্বীনের দরদ না থাকা।

শব্দের ফুলঝুড়ি দিয়ে মনোমুগ্ধকারী কবি, হাজার হাজার জনতার মাঝে জযবার উত্তাল সৃষ্টি কারী বক্তা, ক্ষুরধার লেখনি দিয়ে অন্তর বিজয়কারী কলামিষ্ট আর ভিতর বাহিরে সাজুয্যহীন বড় বড় মুসলিম নেতাতো বেশুমার, একজন খুজলে হাজার পাওয়া যাবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো এই বিপুল সংখ্যক নামধারী "মহান" ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে চায়ের কাপ, রকমারী খাবার ভর্তি দস্তরখান, হোটেল, ক্লাব আর আড়ম্বরপূর্ণ অফিস ও হলরুম গুলোতে বিপ্লব আসতে পারে কিন্তু এই উম্মতের মাঝে কোন বিপ্লব আসবে না। এই ইনকিলাবের জন্য প্রয়োজন এমন হিম্মত ওয়ালা জিম্মাদার যার দরদে দিল তাকে এমন কঠিন পরিস্থিতিতে ও জিহাদের একটি অস্পৃশ্য বিষয়ে কলম তুলতে উৎসাহিত করে।

এই মহান লেখনি কর্মের উপর অভিমত লেখার নির্দেশ এমন ব্যক্তিকে দেয়া হয়েছে, অগ্নিবর্ষণকারী আকাশ আর গুলি বৃষ্টির পরিবেশে যার এক মুহুর্ত কাটানোর ও তাওফীক হয়নি।

অধম অল্প সময়ে মোটামুটি ভাবে কিতাব খানা দেখেছি। আশা করি এই কিতাব শুধু মুজাহিদ নয় বরং তার আসপাশের লোকেরাও পড়বে। এবং বার বার পড়বে যাতে তার দ্বিধা স্বংশয় সব দূর হয়ে যায়। এবং জিহাদের ব্যাপারে তার বক্ষ উন্মোচিত হয়।

মুহতাজে দুয়া
মোহা. আসলাম শেখপুরী।

(৯)

জামেয়া ফারুকীয়া করাচীর উস্তাযুল হাদিস এবং প্রকাশনা বিভাগের প্রধান, মাসিক বেফাকুল মাদারিস এর সম্পাদক হযরত মাও. ইবনুল হাসান আব্বাসী দা. বা.।

নাম থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে, এই কিতাবটি জিহাদ এবং তদসংক্রান্ত আপত্তি ও সংশয় নিরসনে লেখা। কিতাবখানা এমন এক আলেমের সংকলন যিনি আমলী জিহাদের ময়দান সমুহের একজন সফল ও নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদ। তিনি আমার মত শুধু মসী যোদ্ধাই নন, অসির যোদ্ধাও। জিহাদ আর সন্ত্রাসকে নিয়ে ইসলামের দুশমনরা এমন ধুম্রজাল সৃষ্টি করেছে যে, উভয়ের মাঝে পার্থক্য করাই অনেকের জন্য মুশকিল হয়ে গেছে। অথচ সন্ত্রাস হল পৃথিবীর বুকে বিপর্যয় সৃষ্টি করা, পক্ষান্তরে জিহাদ হল সে বিপর্যয় খতম করে ধরনীর বুকে শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র শরয়ী ব্যবস্থা। এই কিতাবের মধ্যে উভয়ের মাঝে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। সাথে সাথে শ্রদ্ধেয় মাও. সে সকল আপত্তি সমূহের জবাব দিয়েছেন যা উত্থাপিত করা হয় অমুসলিমদের পক্ষ্য হতে। এ বিষয়ে এর আগেও আরবী-উর্দূ ভাষায় কিতাব লেখা হয়েছে এবং ছাপাও হয়েছে। তা সত্ত্বেও বক্ষমান কিতাবটিতে এমন কিছু অভিযোগ ও সংশয়ের জবাব দেয়া হয়েছে যা ইদানিং কালে সৃষ্ট।

ইবনু হাসান আব্বাসী

২৫ শাওয়াল ১৪২৫

(১০)

হযরত মাও. আ: হামীদ দা. বা. শাইখুল হাদীস ও নাযেমে তালিমাত জামেয়া বিননূরী সাইট, করাচী এর অভিমত।

চক্রান্তবাজ সম্প্রদায় ইংরেজরা যেদিন থেকে তাদের অপবিত্র পা হিন্দুস্তানের বুকে রাখল সেদিন থেকে অত্যন্ত চাতুরতার সাথে তারা ইসলামের উপর হামলা চালাতে লাগল। ইসলামের বিধি বিধানের উপর বিভিন্নমুখী খোড়া আপত্তি উত্থাপন করে মুসলমানদের স্বচ্ছ ধর্মীয় অনুভুতিকে কলুষিত করতে লাগল। ফলে ঐক্যের প্রতীক মুসলিম জাতি দুটি প্লাটফর্মে বিভক্ত হয়ে গেল। একগ্রুপ, যারা ঐ সকল অভিযোগে প্রভাবিত হয়ে ইসলামের অকাট্য বিধানগুলোর মাঝে মনগড়া ব্যাখ্যা দাড় করাতে লাগল এবং সংশ্লিষ্ট আয়াত ও হাদিস এর এমন ব্যাখ্যা করল যা ইংরেজদের মনঃপুত হয়। এদেরই অগ্রভাগে ছিলেন স্যার সৈয়্যদ আহমাদ খান। ২য় গ্রুপে ছিলেন ঐ সকল উলামায়ে কেরাম যারা এ সকল অভিযোগের জ্ঞানগর্ভ জবাব দিয়েছেন এবং আহকামে ইসলামের উপর কোন আচড় লাগতে দেননি। এই জামাতের চূড়ামনি ছিলেন হযরত মাও. মুহা. কাসেম নানুতবী রহ. । যিনি এ সকল অভিযোগের বিপক্ষে এমন ইলম ও যুক্তি নির্ভর জবাব ও দলিল-প্রমাণ পেশ করে গেছেন যা থেকে আগামী একশত বছর পর্যন্ত আমরা উপকৃত হতে থাকবো।

ইংরেজদের অভিযোগের থাবায় আক্রান্ত হওয়া আহকামগুলোর মাঝে জিহাদ হল সবচে বেশি নির্যাতিত। ভালো ভালো দ্বীনদার শিক্ষিত শ্রেণী এ ক্ষেত্রে পদস্খলনের শিকার। কবির ভাষায় “ নিজে বদলানোর নাম নাই/ সবাই মিলে কুরআন বদলাই।”

আমার উস্তাযে মুহতারাম পীর ও মুর্শিদ ইমামুল মাকুলাত ওয়াল মানকুলাত হযরত মাও. আব্দুল কারীম কোরায়শী (মৃ-১৪১৯) এ ব্যাপারে বড় সজাগ ছিলেন। এবং অধিকাংশ মজলিসে জিহাদের প্রকৃত অবস্থা নিয়ে আলোচনা করতেন। হযরত জিহাদ বিষয়ে দুইটি কিতাব লিখেছেন যা ছাপাও হয়েছে এবং আলহামদুলিল্লাহ আমাদের জন্য হিদায়াতের আলোকবর্তিকা প্রমাণিত হয়েছে।

শ্রদ্ধেয় ভাই ইলিয়াস গুম্মানকে আল্লাহ তায়ালা জাযায়ে খায়ের দান করুন তিনি আলোচ্য বিষয়ের স্পর্শকাতরতা উপলব্ধি করে কলম তুলেছেন এবং “জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ আওর এ’তেরাযাত কা ইলমী জায়েযা” এ নামে একটি বিশ্লেষণধর্মী

কিতাব সবার সামনে রেখেছেন। যার দ্বারা সাধারন লোকদের উপকার তো হবেই, ওলামায়ে কেরামও উপকৃত হবেন। আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা, তিনি কিতাবখানাকে ব্যাপক ভাবে কবুল করেন এবং এর মাধ্যমে ইসলামের দুশমনদের চক্রান্ত নস্যাৎ করেন।

আ: হামীদ

২০ শাওয়াল ১৪২৫ হি.

জামিয়া বিননূরী সাইট, করাচী।

(১১)

হযরত মাও. মুফতী শহীদ আতিকুর রহমান সাহেব, উস্তাযুল হাদিস জামিয়া বিননূরী সাইট, করাচী-এর দোয়া ও অভিমত।

الحمد لله رب الشهداء والمقاتلين والصلوة والسلام علي امام الأنبياء والمجاهدين وعلي اله الطيبين

الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه أجمعين وعلي كل من حذا حذوهم إلي يوم الدين وبعدُ

ইসলাম ধর্মের মূল শক্তি ও স্থিতির চাবিকাঠিই হল জিহাদ। এর মাধ্যমে যেমনি ভাবে ইসলামের শান শওকত প্রকাশ পায় তেমনি ভাবে ইসলামের শত্রুরাও ভয়ে তটস্থ থাকে। ফলে ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্তমূলক কর্মকাণ্ড করা থেকে বিরত থাকে। এ কারনেই প্রত্যেক যুগের বাতিল গোষ্ঠিই ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে চেষ্টা চালিয়ে গেছে, যাতে জিহাদের দূর্নাম করা যায়। এবং জিহাদের সাথে মুসলমানদের সম্পৃক্ততার অবসান ঘটানো যায়। নিকট অতিতে কাদিয়ানী ধর্মমত নামে এক অপবিত্র বৃক্ষের গোড়ায় ইংরেজ কর্তৃক পানি সিঞ্চন করা হয়েছে এ দুরভিসন্ধি বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যেই। ফলে মির্জা কাদিয়ানী মিথ্যা নবুয়্যতের উপর ভর করে ঘোষণা করে ছিল-

যুদ্ধ-জিহাদ হারাম এ যুগে সন্দেহ নেই তাতে

দিলটাকে তাই করো মুক্ত জিহাদ ভাবনা থেকে

কিন্তু মিথ্যা নবুওয়াতের দাবী করাই ছিল তার সবচে বড় দূর্বলতা। ফলে মুসলিম সমাজে তার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপক করতে সে ব্যর্থ হয়েছে। হক্বানী আলেমদের অনবরত প্রচেষ্টার বরকতে কাদিয়ানীদের জিহাদ বিরোধী আন্দোলন হাওয়ায় মিলে যায়। এবং জিহাদ অস্বীকৃতিই তাদের শবাধারে সর্বশেষ কীলক হিসেবে প্রমাণিত হয়।

বাতিল নতুনভাবে পাঁয়তারা শুরু করল। মুসলমানদের কাতারে এমন এক নতুন গোষ্ঠির জন্ম দিল যাদের পরিচয় ছিল, ইসলামী চিন্তাবিদ, মুক্ত চিন্তার অধিকারী, মধ্যপন্থায় বিশ্বাসী ইত্যাদি চমকপ্রদ উপাধী সমূহ। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে এই লোকগুলো জ্ঞান বহন করার পরিবর্তে জ্ঞান বিক্রি কারী আর দিমাগ ব্যবহার করার পরিবর্তে উদর পূর্ণকারী হিসেবে প্রমানিত হয়েছে। বিনিময়ে তারা নিজেদের জ্ঞান আর ইলমের সওদা করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। ফলে একটি স্বচ্ছ ও শ্বাশত বিধান জিহাদের

পথে বড় ধরণের বাধা সৃষ্টি করতে না পারলেও সংশয় সন্দেহের ধুলা উড়িয়ে সহজ সরল মুসলমানদের মনে দুর্বোধ্যতা ও জটিলতা সৃষ্টি করতে পিছিয়ে থাকেনি।

ইসলামের শত্রুদের আশির্বাদে সকল প্রকার মাধ্যমগুলো ছিল এই "জ্ঞানীগুণী"দের সহজ বাহন। ফলে পর্দা বেষ্টিত নারী সমাজও তাদের চক্রান্তের বেড়াজালে আটকা পড়েছে। এত কিছুর পরও সবচে বড় দুঃখজনক হলো তাদের এ নোংড়া দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর প্রভাব শুধু আম সাধারণের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং পৃথিবীর সবচে পবিত্র ও সুউচ্চ স্থান মিম্বার ও মেহরাব অলংকৃতকারী উলামাগণও এর দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকলেন। এমনকি কতিপয় জুব্বা পরিহিত পাগড়ীধারী ব্যক্তি এতুটুকু পর্যন্ত বলতে লাগলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ইসলামের সুরক্ষার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম আত্নহত্যার নামান্তর। আর এই আন্তঘাতি মুসলিম সমাজে উগ্রতা ও বাড়াবাড়ির জন্ম দিচ্ছে। আরো বলছে যে, ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়া জায়েয নেই যতক্ষন না রাষ্ট্রের শাসকবর্গ এর অনুমতি দেয়। যাদের পরিচয় হল ব্যাভিচারী, শরাবখোর, লম্পট, চরিত্রহীন নামমাত্র মুসলমান। তারা এ সকল বিষয়ে তো বড় বড় "ফতোয়া" ছাড়ছে কিন্তু একথাটা বলতে রাজি নয় যে, এহেন নাযুক পরিস্থিতিতে মুসলমানদের কী করণীয়।

তাই বর্তমান সময়ের নিতান্ত প্রয়োজন যে, উলামায়ে রব্বানিয়্যিনগণ আগে বেড়ে উম্মতের রাহনুমায়ী করবেন। বাতিল পুজারীদের দ্বিধা সংশয়ের কালো পর্দা বিদীর্ন করে জিহাদের প্রকৃত ও বাস্তব চিত্র দুনিয়ার সামনে তুলে ধরবেন।

মাও. ইলিয়াস গুম্মান সাহেব দা. বা. একজন আল্লাহর পথের মুজাহিদ ও প্রসিদ্ধ গাযী। বিভিন্ন যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন, এবং হক্ব কথা বলার দায়ে কারা নির্যাতনও ভোগ করেছেন। তিনি জিহাদ প্রসঙ্গে উত্থাপিত আপত্তি ও সংশয় সমূহের বড় চমৎকার জবাব দিয়েছেন এবং পেট পুজারী আর অর্থলোভীদের সমুচিত শিক্ষাও দিয়েছেন।

আশা করি কিতাবখানা অনেক পথহারা "বিজ্ঞজনের" জন্য আলোক মিনার হবে। ব্যক্তি স্বার্থের গ্যাড়াকলে অবরুদ্ধদের জন্য স্বাধীনতার পয়গাম হবে এবং সাধারন জনগনের জন্য উত্তম পথ প্রদর্শক হবে। আল্লাহ তায়ালা কিতাবখানাকে ব্যাপক ভাবে কবুল করুন। এবং লেখক ও পাঠক সকলের নাজাতের উসীলা বানান।

মুফতী আতিকুর রহমান

২৪শাওয়াল ১৪২৫

(১২)

দারুল উলম রেঙ্গুন, বার্মার-উস্তাযুল হাদীস, আরেফ বিল্লাহ হাকীম মো: আখতার সাহেবের খলিফা মাও. মুফতি ইদরীস দা. বা. এর দোয়া ও অভিমত।

الحمد لله وكفي وسلامٌ على عباده الذين اصطفي أما بعدُ

১৪২৫ হি. রমজানুল মোবারকের শেষ দশক স্বীয় শাইখ আরেফ বিল্লাহ হযরত আক্বদাস শাহ হাকীম মো: আখতার দা. বা. এর খানকায় কাটানোর তাওফীক

হয়েছে। এই সময়ে এক মর্দে মুজাহিদ বিজ্ঞ আলেম হযরত মাও. ইলিয়াস গুম্মান সাহেবের সাথে সাক্ষাত এর সুযোগ হয়েছে। তিনি হযরত ওয়ালার খলিফাও। তার ব্যাক্তিত্বের দিকে তাকালে সাহাবাদের স্মরণ তাজা হয়। সর্বদা ভাবনায় ডুবন্ত। বিশেষ করে মজলুম মুসলিম জাতির জন্য দিনরাত চিন্তামগ্ন। তিনি “জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ আওর এ'তেরাযাত কা ইলমী জায়েযা” নামক একটি কিতাব সংকলক করেছেন। কিতাবের পাণ্ডুলিপি বান্দাকে দেখিয়ে অভিমত সরুপ কিছু কথা লিখে দেয়ার আবেদন করলেন। বান্দা পাণ্ডুলিপি পড়ে তো অবাক। এখানে সব অভিযোগ আপত্তির এমন এমন আকলী (যৌক্তিক) নকলী (কোরআন সুন্নাহ ভিত্তিক) জবাব দেয়া হয়েছে যা অধমের কল্পনাতেও আসেনি কোনদিন।

আজ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ র প্রকৃত অর্থ না বুঝার কারণে অপাত্রে এর ব্যাবহার ঘটিয়ে করে এই মহান সাফল্যের পথ থেকে অধিকাংশ মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে। এরচে' বড় আফসোস হল কিছু মানুষ তো ঐ সকল মুজাহিদগণকেও নিন্দার পাত্র বানাচ্ছে যারা সকল অভিযোগ-আপত্তি পিছনে ফেলে আপন জান মাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে গেছে। আল্লাহর দরবারেই সকল অভিযোগ।

من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق.

এসকল নিন্দুকরাই এই হাদীসের যোগ্য প্রয়োগক্ষেত্র। যে মুসলিম দুনিয়া ত্যাগ করলো কোন দিন জিহাদে গেল না, যাওয়ার আকাংখাও পোষন করলনা সে এক প্রকার নেফাকীর উপর মৃত্যু বরণ করলো। সুতরাং জিহাদের মাসআলা বুঝা এমন জরুরী ঈমানের মাসআলা বুঝা যেমন জরুরী। কেননা ফুক্বাহায়ে কেরাম লিখেছেন, যে ব্যক্তি জিহাদ অস্বীকার করে সে কাফের। ছোট্ট একটা সুন্নত নিয়ে ঠাট্টাকারী কখনও মুসলমান থকতে পারে না। তাহলে জিহাদ যা সরাসরী আল্লাহর কালামে বর্ণিত তা অস্বীকারকারী কিভাবে মুমিন থাকতে পারে।

দোয়া করি আল্লাহ তায়ালা এই কিতাব খানার মাধ্যমে মুসলিম জাতিকে জিহাদের সঠিক অর্থ বুঝার তাওফীক দান করুন এবং মুসলিম জাতিকে এই মহান কাজে জানমাল খরচ করার সৌভাগ্য নসীব করুন। সাথে সাথে লেখকের দিলের আশা পুরা করে একে উভয় জাহানে সফলতার মাধ্যম বানান।

মো: ইদ্রিস

উস্তাযুল হাদীস, দারুল উলুম রেঙ্গুন, বার্মা।

সূচীপত্র

(কিতাবের কম্পোজ পূর্ণ হওয়ার পর ঐখান থেকে কপি/পেষ্ট করে বসাতে হবে)

উৎসর্গ

- হক্কের ঝাণ্ডা তুলে যুদ্ধরত ঐ সকল মুজাহিদগণের নামে যারা কুফুরী শক্তির ব্যারাকসমূহে সর্বদা বজ্রপাত ঘটাচ্ছে।
- ময়দানে জিহাদ থেকে গ্রেফতার হওয়া সকল মুজাহিদের নামে যারা পৃথিবীর যে কোন তাগুতি কারাগারে বসে সাহায্যের প্রহর গুনছে।
- আল্লাহর পথের ঐ সকল মুজাহিদদের নামে যাদের দাস্তাঁন শুনে অধঃপতনের এ যুগে খানসা ও খাওলার ঘটনা স্মরণ হয়ে যায়।
- জিহাদের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি অর্জনকারী ঐ সকল শুহাদায়ে কেরামের নামে যারা ইসলামের সোনালী ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের বর্তমান বিসর্জন দিয়ে জান্নাতে চলে গেছেন।

মুহা. ইলিয়াস গুম্মান।

কিছু আবেদন

এ কিতাব লেখার উদ্দেশ্য একটাই যে, জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহর উপর উত্থাপিত আপত্তি সমূহের যৌক্তিক ও ইতিবাচক জবাব প্রদান করা। যাতে জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ্‌র প্রকৃত অবস্থান ও আপন চিত্র উম্মতের সামনে ফুটে উঠে। এবং কুফরীচক্র সমূহ নস্যাৎ হয়। ফলে সাধারণ জনগণ ও ভবিষ্যত প্রজন্ম এ সকল দ্বিধা সংশয়ের শিকার হয়ে কোন ভুল বুঝাবুঝিতে নিপতিত না হয়। হঠকারিতা ও গোড়ামীর চশমা নয় যদি প্রকৃত বিষয় বুঝার নিয়তে কেউ বই খানা পড়ে তাহলে ইনশা-আল্লাহ সে উপকৃত হবে। অন্যথায় হঠকারীতার চিকিৎসা তো আমার কাছে নেই। হ্যা, আমি শুধু দোয়া করতে পারি। এ ক্ষেত্রে আমি কোন কার্পণ্য করবো না।

ওযরখাহী

এই বইয়ে কোন বিশেষ ব্যাক্তি বা দলের খণ্ডন করা হয়নি। বরং জিহাদ সংক্রান্ত মৌলিক আপত্তি সমূহেরই খণ্ডন করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও যদি এ বইয়ের

কারণে কোন ব্যাক্তি বা দলের সদস্যদের মনে আঘাত লাগে তাহলে ক্ষমা চাওয়ার কোন প্রয়োজন না থাকলেও আমি অগ্রীম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

"সংক্ষেপন"

আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে যথেষ্ট খেয়াল রেখেছি যাতে কোন আলোচনা অতি দীর্ঘ না হয়ে যায়। যা পাঠকবর্গের বিশেষত আমার হৃদয়মনি মুজাহিদ ভাইদের মূল্যবান সময় নষ্টের কারণ হয়। বরং যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি দু'একটি দলিলের

মাধ্যমে প্রকৃত বিষয়টি বুঝিয়ে দেয়ার। আর বাকী দলিল গুলো নিজেই খুঁজে নেবে কিংবা জিহাদের ময়দানে কর্মরত ওলামায়ে কেরাম থেকে জেনে নিয়ে আমলে লেগে যাবে।

এই সংক্ষেপনের কারনেই এ বইয়ে জিহাদের ফাযায়েল, মাসায়েল ও জিহাদ না করার উপর দুনিয়া আখেরাতের ক্ষতি সমূহ আলোচনা করা হয়নি। অধিকন্তু এ সকল বিষয়ে বাজারে আলহামদুলিল্লাহ অনেক বই ছাপা হয়েছে। যদিও কোন কোন জায়গায় কিছু ফাযায়েলের আলোচনাও এসে গেছে কিন্তু তা কিতাব সংকলনের উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল না।

"স্বীকারোক্তি"

ইসলামের স্বার্থে কারাবন্দীর জীবনে এই কিতাব লেখা হয়েছে। তাই যে সকল কিতাবের প্রয়োজন ছিল তা সব পাওয়া যায়নি। আর জেলের অবস্থাও ছিল এমন যে, দীর্ঘ সময় করার সুযোগ নেই। কারণ যে কোন সময় তল্লাশীর নামে সব কিছু বাজেয়াপ্ত করতে পারে। যে কয়েকটি কিতাব আমার সামনে ছিল তা এখানে উল্লেখ করছি:

১. তাফসীরে উসমানী
২. তাফসীরাতে আহমাদীয়্যাহ

৩. মাআরেফুল কোরআন
৪. মুজিহুল কোরআন
৫. কানযুল উম্মাল
৬. আল জামেউস্‌সগীর
৭. যাদুত তালিবীন
৮. মেশকাত শরীফ
৯. মুখতাসারুল কুদুরী
১০. উসুলুশ শাশী
১১. মানশুরুল কোরআন

আমার আকাবিরগণের যে সকল কিতাব ও রেসালা থেকে উপকৃত হয়েছি তাদের নামও নিচে তুলে ধরছি।

১. হযরত আকদাস মুফতি রশিদ আহমদ লুধিয়ানভী
২. উস্তাযে মুহতারাম মুফতি আ: রহীম সা.
৩. উস্তাযে মুহতারাম মাও. মুহা.আসলাম শেখপুরী দা. বা.
৪. উস্তাযে মুহতারাম মাও. মুহা.যাহেদ আর রাশেদী দা. বা.
৫. মুহা.রফী উসমানী দা. বা.
৬. মুফতী মুহা.মাসুম আফগানী দা. বা.
৭. মুফতী মুহা.ইব্রাহীম সাদেকাবাদী দা. বা.
৮. মুফতী মুহা. আবু রায়হান কাশ্মিরী দা. বা.
৯. মাও. ফযল মো. ইউসুফ যাই দা. বা.
১০. সুফী মো. ইকবাল (মদিনা মুনাওয়ারা, সাউদী) দা. বা.
১১. শাইখুত তাফসীর ওয়াল হাদীস মাও. মুহা. ইদরীস কান্ধলভী দা. বা.
১২. শাইখুত তাফসীর ওয়াল হাদীস মাও. মুহা. আ: করীম কুরাইশী দা. বা.

ইহা ছাড়াও ও অনেক আগের বিশেষত ছাত্র যমানার মোতায়ালা থেকে যা কিছু স্মরণে ছিল তা দ্বারাও বিশেষ উপকৃত হয়েছি।

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র।

“আবেদন”

এ জন্য আমার আবেদন হল, এ কিতাবের যে কথাটি উপকারী ও ভাল মনে হবে, তা আমার আকাবিরগণের সাথেই সম্পৃক্ত হবে। আর যদি কোন কথা অর্থহীন ও ভুল সাব্যস্ত হয়, তার সম্পর্ক হবে আমার সাথে। এই কিতাব দ্বারা যদি কেউ সামান্যও উপকৃত হয় তাহলে সে যেন আকাবীর ও আমার জন্য মঙ্গলের দোয়া করে। পক্ষান্তরে কারো যদি সামান্যও আঘাত লাগে তাহলে সে যেন এতে শুধু আমাকেই অভিযুক্ত করে। আর আমি তো আমার পূর্বোক্ত ওযরখাহীর ভিত্তিতে ক্ষমার যোগ্য হয়ে গেছি। যদি কেউ ক্ষমা করে তবে তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো।

"অপেক্ষা"

বাস্তবেও যদি এ বইয়ে কোন ভুল কথা এসে যায়, তাহলে আমি অপেক্ষায় থাকলাম। যাতে এ বিষয়ে আমাকে অবগত করা হয়। আমি নিঃসংকোচে ভুল মেনে নেবো। এবং তাওবা করতঃ পরবর্তী এডিশনে তা শুধরিয়ে নেবো। ইনশা-আল্লাহ। তবে শর্ত হল যে আপত্তিই হবে তা দলিল ভিত্তিক হতে হবে।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

আমি সর্ব প্রথম আমার মালিক মহান আল্লাহ্ তায়ালার শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যে, তিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে জিহাদ বিষয়ে কলম ধরার তাওফীক দিয়েছেন।

وما توفيقي الا بالله العلي العظيم

হাদীসে পাকে এসেছে

من لم يشكر الناس لم يشكر الله

যে মানুষের শুকরিয়া আদায় করলোনা সে আল্লাহর শুকরিয়াও আদায় করলোনা।

তাই এই হাদীসের উপর আমল করতঃ এ সকল কল্যাণকামী বন্ধুবর্গের শুকরিয়া আদায় করছি যারা বন্দী জীবনে এ কিতাব লেখা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে সামান্যও সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে।

جزاهم الله تعالي أحسن الجزاء في الدنيا والاخرة

দোয়া

আল্লাহ তায়ালা এই কিতাবকে আমভাবে ও খাস ভাবে কবুল করুন। একে ধর্মীয় কল্যানের মাধ্যম বানান। আমার নিজের বাবা-মা, ভাই-বেরাদার, পরিবার-পরিজন,

সন্তান-সন্ততি, উস্তাদ-মাশায়েখ, দোস্ত-আহবাব সকলের জন্য এ কিতাবকে আখেরাতের সম্বল বানান। আমীন

ভূমিকা

ইসলামী শরীয়ত মানবতার সফলতার জন্য জীবনের সকল ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বিধান দিয়েছে। এ বিধানগুলো এতটাই পরিচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট যে, তাতে অতিরিক্ত কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষনের প্রয়োজন নেই। তবে হ্যা, কোন কোন সময় কারো কাছে শরয়ী জ্ঞানের অপ্রতুলতার কারনে আগের বিধানগুলোকে যুগের বর্তমান অবস্থার উপযোগী মনে হয়না। তখন কিছু হতভাগা নিজের অজ্ঞতা ও জ্ঞানদৈন্যের স্বীকার না করে শরীয়তের বিধানাবলীর উপর আপত্তি তুলতে থাকে। আর এক বিঘত লম্বা জিহবাটা বের করে উদরস্থ মন্দ কথাগুলোর উদগীরণ করতে থাকে। এর মোকাবেলায় প্রতিটি যুগের উলামায়ে কেরাম العلماء ورثة الأنبياء। এর মানসাবে বসে সে সকল আপত্তি সমূহের আকলী ও নকলী জবাব দিয়ে আসছেন। এবং এর খণ্ডনে অত্যন্ত

জোরালো ও যুক্তিনির্ভর কিতাবাদী রচনা করে আসছেন। فجزاهم الله أحسن الجزاء

পবিত্র শরীয়ত প্রতিটি ইবাদতের জন্য পৃথক নাম, পৃথক হুকুম নির্ধারণ করেছে। শুধু ইবাদতই নয় পারস্পরিক লেনদেনের বিষয়েও প্রতিটি ক্ষেত্রের পৃথক নাম ও হুকুম বর্ণনা করেছে। যাতে একটা আরেকটার সাথে মিশে না যায়। হুকুমের মাঝে কোন জটিলতা অস্পষ্টতা সৃষ্টি না হয়।

সুতরাং জরুরী হল আল্লাহ তায়ালা যে ইবাদতের জন্য যে নাম নির্বাচন করেছেন সে নামটি সে ইবাদতের ক্ষেত্রেই ব্যবহার হবে। আসুন এই নীতিমালার আলোকে আমরা কয়েকটি ইবাদত নিয়ে পর্যালোচনা করি।

কিন্তু আলোচনা শুরু করার পূর্বে আবারও আবেদন করছি আপনি সব ধরণের হঠকারীতা গোড়ামী ক-ধারণা ও বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত হয়ে আমার আলোচনা পড়ুন। এক একটি শব্দ গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ুন ইনশা-আল্লাহ আমার কথা বুঝতে এটা অনেক সহায়ক হবে। আমার লক্ষ্য তো শুধু একটাই যে, সাধারণ মুসলমান যাতে করে নাম সর্বস্ব “চিন্তাবিদদের” প্রপাগাণ্ডায় প্রভাবিত হয়ে বাস্তবতা থেকে দুরে সরে না যায়।

আমাদের জন্য এটা কতবড় সৌভাগ্য যে, শরীয়ত কুরআন-সুন্নাহর মাধ্যমে সকল ইবাদতের নাম, আহকাম, ফাযায়েল, মাসায়েল এবং না পালনে ক্ষতি ও শাস্তির নির্দিষ্ট দিকগুলো পৃথক পৃথক বর্ণনা করে দিয়েছে। উদাহরণত:

নামাজ

নামাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। যার জন্য শরীর কাপড় এবং নামাজের স্থান পবিত্র হওয়া ও কিবলামুখী হওয়া শর্ত। এর মধ্যে রয়েছে তাকবীরে তাহরীমা, কিয়াম, রুকু, সিজদা এবং তাশহহুদ ইত্যাদী। কুরআন-সুন্নায় নামাজের জন্য যে সকল

ফাযায়েল বর্ণিত হয়েছে তা কেবল ঐ ইবাদতের জন্যই, যার মাঝে এ সকল শর্তাবলী ও রুকন পাওয়া যাবে।

সাওম

সুবহে সাদিক থেকে শুরু করে সুর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়তসহ খানা পিনা ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার নাম। রোযার যে সকল ফাযায়েল বর্ণিত হয়েছে তা শুধু এই বিধানটার সাথেই সীমাবদ্ধ।

হজ্জ

ইহরাম, তালবীয়া, তাওয়াফ, আরাফা-মুযদালিফায় অবস্থান, মিনায় প্রস্তর নিক্ষেপ, মাথা মুণ্ডন, সাফা-মারওয়ায় সাঈ ইত্যাদি আমল দ্বারা সম্পাদিত একটি ইবাদতের নাম। এ সংক্রান্ত ফাযায়েলগুলোও এর মাঝেই সীমাবদ্ধ।

জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ

শারীরীক কসরত, তীর-তরবারী চালনা, বর্শা-বল্লম নিক্ষেপ, বর্ম পরিধান, ঘোড়া ব্যাবহার আর বর্তমান যামানা হিসেবে মেশিনগান, পিস্তল, ক্লাশিনকোভ, গ্রেনেড, ট্যাংক, বোমা, ক্ষেপনাস্ত্র, যুদ্ধ জাহাজ ইত্যাদি চালনার মাধ্যমে সম্পাদিত একটি আমল। যার মধ্যে মুসলমান কাফেরকে হত্যা করলে গাজী হয়, আর কাফের কর্তৃক নিহত হলে শহীদ হয়। কাফেরের মাল ছিনিয়ে আনতে পারলে কিংবা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পরাজিত কাফের বাহিনী থেকে লব্ধ হলে সবচে পবিত্র রিযিক তথা গনিমত হিসেবে গন্য হয়। কাফেরদের বন্দি সৈন্য পুরুষ হলে গোলাম আর মহিলা হলে বাদী হয়। বিবাহ ব্যতীত এদের সাথে সঙ্গম বৈধ। এ সব কিছু আল্লাহর পক্ষ হতে মুসলমানদের প্রতি বিশেষ দান। এ সকল বিষয় যেখানে পাওয়া যাবে তাকেই বলে ইসলামের

ভাষায় কোরআনের ভাষায়, হাদীসের ভাষায় এবং দেড় হাজার বছরের মুসলমানদের গৌরবজ্জল ইতিহাসের ভাষায় " জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ"।

এমনি ভাবে যে সকল ইবাদত ইসলামের রুহ যা ব্যতীত ইসলাম কল্পনাও করাই অসম্ভব সে সকল ইবাদতের মাঝে শরীয়ত স্তর নির্ধারণ করে দিয়েছে। এক ইবাদতকে আরেকটির উপর প্রাধান্য দিয়েছে। যদি ও প্রতিটি ইবাদত আপন অবস্থানে সঠিক সময়ে ও নির্ধারিত ক্ষেত্রে আদায় কাই হল মূল ফযিলতের বস্তু ও কামালিয়্যাত অর্জনের মাধ্যম। কিন্তু এ বিষয়টি তো দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, কোন ইবাদতের সাওয়াব কম বেশী হবার সাধারণ মাপকাঠি হল ঐ ইবাদত সম্পাদনে কষ্ট কম-বেশী হওয়া। অর্থাৎ যে ইবাদতে যে পরিমান কষ্ট মোজাহাদা হবে তার সাওয়াবও সে পরিমান বেশী হবে। আর দুনিয়াতে সবচে' মূল্যবান হল মানুষের জীবন, তারপর সম্পদ। এ কথা থেকে সুস্পষ্ট রূপে জানা গেল, যে আমলে এ উভয়টা-জান-মাল উৎসর্গ করতে হবে সে আমলটাই অন্যান্য সকল আমলের থেকে মর্যাদা, ফযীলত ও সাওয়াবে বেশী হবে।

এখন আসুন আমরা দেখি সে কোন আমল যার মধ্যে জান-মাল উভয়টা কোরবানী করতে হয়। আমাদের যদি ইনসাফের দৃষ্টি থাকে তাহলে দেখতে পাবো সে আমল হল " জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ"। এ আমল সম্পাদনে কোথাও জানের প্রয়োজন বেশী হয় কোথাও মালের প্রয়োজন বেশী হয়। অথবা এভাবে বলা যায়, মানুষের স্বভাব অনুযায়ী কারো কাছে জানের মুহাব্বাত বেশী আবার কারো কাছে মালের মুহাব্বাত বেশী। কেউ সম্পদের খাতিরে জীবন লুটিয়ে দেয়। কেউ আবার জীবনের তাগীদে সম্পদ লুটিয়ে দেয়। এই স্বভাবজাত পার্থক্যের কারনেই মহান আল্লাহ তায়ালা জিহাদের আয়াত সমূহে কোথাও জানকে আগে উল্লেখ করেছেন আবার কোথাও মালকে আগে উল্লেখ করেছেন। সর্বোপরি জিহাদ সম্পাদনে যেহেতু জান মাল উভয়টাই উৎসর্গ করতে হয় তাই শরীয়তে এই মহান ইবাদতকে ذروة سنام لاسلام। ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যেমনি ভাবে উটের সকল অঙ্গ হতে তার কুজ্বটাই সবচে উচু তেমনি ভাবে ইসলামের সকল

আহকাম হতে জিহাদের হুকুমটি সবার উচ্চে। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর মধ্যে একদিন একরাত বরং এক সকাল বা এক বিকাল সময় কাটানো দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল কিছু হতে উত্তম।

عن أنس بن مالك رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها

- الصحيح للبخاري:392/1 باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم من الجنة. رقم الحديث: 2792 ، - الصحيح لمسلم :134/2 باب فَضْلِ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِى سَبِيلِ الله. رقم الحديث:4836 ، - سنن الترمذى:294/1 باب باب في الغدو و الرواح في سبيل الله. رقم الحديث:1640 ، - المصنف لإبن أبي شيبة:227/10 باب ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه. رقم الحديث:19649

অপর হাদীসে এসেছে,

عن سلمان قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول « رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليِ عمله الذى كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان ».

-الصحيح لمسلم: 142/2 باب فضل الرباط فى سبيل الله عز وجلّ. رقم الحديث:4901

-المسند للإمام أحمد : 212/6 رقم الحديث:6653 - المعجم الكبير للطبرانى : 6178

আল্লাহর পথে একদিন একরাত পাহারাদারী করা মাস ভর সিয়াম পালন ও কিয়াম সাধন থেকে উত্তম।

অপর হাদীসে এসেছে,

عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (عينان لا تمسهما النار : عين بكت من خشية الله ، وعين با تت تحرس في سبيل الله) .

-سنن الترمذى:293/1 باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله . رقم الحديث:1631 - شعب الإيمان للبيهقى:796 باب في الخوف من الله تعالى _

আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারী চোখ ও জিহাদের ময়দানে পাহারাদারী করে জাগ্রত থাকা চোখদ্বয়কে জাহান্নামের আগুন কখনো স্পর্শ করবে না। আরো বর্ণিত হয়েছে,

عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول " إن الله عزوجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله

-سنن أبي داؤود:340/1 باب في الرمي. رقم الحديث:2513 - سنن النسائى: 49/2 باب فضل من أنفق زوجين في سبيل الله . - المسند للإمام أحمد : 332/13 رقم الحديث:17233

আল্লাহ তায়ালা একটি তীরের বিনিময়ে তিনজনকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। ভালোর নিয়্যতে তীর তৈরী কারী, তীর নিক্ষেপকারী ও তীর মেরামত কারী।

অন্য হাদীসে এসেছে

عن سالم أبي النصر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبه قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف)

صحيح البخارى : 395/1 باب الجنة تحت بارقة السيوف رقم الحديث : 2718 - المصنف لإبن أبي شيبة 342/10 ما ذكر في فضل المجاهد رقم الحديث : 19856

জেনে রাখ! নিশ্চই জান্নাত তরবারীর ছায়ার নিচে।

এই মোবারক আমলে এক মিনিট অংশগ্রহণ কারীর জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে দেয়া হয়।

"من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة"

-سنن الترمذى:294/1 باب في الغدو والرواح في سبيل الله . رقم الحديث: 1643- السنن لأبي داؤود: 344/1 باب فيمن سأل الله تعالى الشهادة . رقم الحديث:2541 - سنن النسائى: 48/2 باب ثواب من قاتل في سبيل الله فواق ناقة.

যুদ্ধের ময়দানের সামান্য সময় অবস্থানকে ঘরে বসে ষাট বছর রিয়ামুক্ত ইবদতের থেকে উত্তম বলা হয়েছে:

عن أبي أمامة ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته ستين سنة

المسند للإمام أحمد : 2234- المعجم الكبير للطبراني: 7868

এই মোবারক আমলে প্রবাহিত রক্ত থেকে কাল হাশরের মাঠে মেশ্‌কের খুশবু ছড়াবে

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَتْلَى أُحُدٍ زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلْمٌ يُكْلَمُ فِي الله إِلَّا يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمَى لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ ---سنن النسائى:49/2 باب من كلم في سبيل الله عز وجل ، - المسند للإمام الأحمد:67/17 رقم الحديث:23547 ، -الصحيح لمسلم: رقم الحديث:4825 - مصنف لإبن أبي شيبة:19506

এই মোবারক আমলে ব্যবহৃত তলোয়ার যেমনি ভাবে পৃথিবী থেকে কুফরকে মিটিয়ে দেয় তেমনি ভাবে মুজাহিদের গুণাহকেও মিটিয়ে দেয়

عن عتبة بن عبد السلمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان السيف محاء للخطايا

-مسند أحمد: 454/13 رقم الحديث:17588 ، - صحيح لإبن حبان: 519/10 رقم الحديث:4663 ، - الجهاد لإبن المبارك: 62

শুধু গুণাহ থেকে পবিত্রই করেনা বরং হত্যাকারী মুসলিম আর নিহত কাফের উভয়কে চিরতরে পৃথক করে দেয়। এমনভাবে পৃথক করে যে, উভয়ে আখেরাতেও কোন দিন একত্রিত হবে না। কাফের তো নিহত হয়ে জাহান্নামে চলে যায়। আর মুজাহিদ হত্যা করে জান্নাতের উপযুক্ত হয়ে যায়।

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يجتمع الكافر وقاتله من المسلمين في النار أبدا

- مسند أحمد: 7/9 رقم الحديث:8801 ، - صحيح لإبن حبان: 521/10 رقم الحديث:4665

বরং যদি মুজাহিদ নিজেই কাফেরের হাতে শহীদ হয় তাহলে সফল। সুবহানাল্লাহ! কেমন সফলতা যে, রক্তের প্রথম ফোটা যমীনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল গুনাহ মাফ।

عن المقدام بن معدي كرب الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إن للشهيد عند الله تسع خصال أنا أشك يغفر الله ذنبه في أول دفعة من دمه

রুহ বের হবার আগেই জান্নাতের প্রাসাদ সমূহ পরিদর্শন। ويرى مقعده من الجنة ঈমানের চোখজুড়ানো পোষাক ويحلى بحلية الإيمان কবরের আযাব হতে মুক্তি ويجار من عذاب القبر হুরে ইন (আনত নয়না ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট মাতাল করা সুন্দরী রমনী) দের সাথে বিবাহ ويزوج من الحور العين হাশরের ময়দানের ভয়াবহতা হতে নিস্কৃতি و يؤمن من الفزع

لأكبر। তার মাথায় সম্মানের মুকুট পরানো হবে যার একটি ইয়াকুত পাথর দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তারচে উত্তম। ويوضع على رأسه تاج الوقار كل ياقوته خير من الدنيا وما فيها বাহাত্তরটি হুরের সাথে বিবাহ হবে। ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من حور العين

নিজে তো জান্নাতের যাবেই। সাথে সাথে আত্মীয়দের মধ্য হতে সত্তর জনের ব্যাপারে তার সুপারিশ কবুল করা হবে

ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه .

- مصنف عبد الرزاق :265/5 رقم الحديث:9559 باب أجر الشهادة

- سنن الترمذي 295/1 رقم الحديث:1653، -باب ما جاء أي الناس أفضل ، - المسند للإمام أحمد:293/13 رقم الحديث:17116

সারকথা:

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ আলাইহির রাহমাহ এর কলম থেকে শুনুন,

جهاد الكفار من أعظم الاعمال بل هو أفضل ما تطوّع به الإنسان

কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সবচে বড় আমল। বরং ফারায়েজ ব্যতীত মানুষ যত আমল করে তার মধ্যে জিহাদই সর্বশ্রেষ্ঠ। (মাজমুআ ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম পৃ: ১৯৭ খ: ১১)

এসব ফাযায়েল ছাড়াও এ মোবারক আমলকে ঈমান ও নেফাকের মাপকাঠি বানানো হয়েছে।

وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا

(আল্লাহ জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন) যাতে জেনে নেন কারা মুমিন আর কারা মুনাফিক।

আর যে ব্যাক্তি নিজে এই মোবারক আমলে শরীক হলনা বা কোন মুজাহিদের পরিবারের খোঁজ রাখলনা এবং কোন মুজাহিদকে জিহাদের ব্যাপারে সহায়তা করলনা তাকে মৃত্যুর আগে কোন না কোন কঠিন মসিবতে আক্রান্ত হবার ধমকি দেওয়া হয়েছে।

عن أبى أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من لم يغز أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة " قال يزيد بن عبد ربه في حديثه : قبل يوم القيامة .

- سنن أبي داوود:339/1 باب كراهية ترك الغزو . رقم الحديث:2503 ، - السنن الكبرى للبيهقى:92/9 باب النفير وما يستدل به على أن الجهاد فرض على الكفاية . رقم الحديث:17942،

যে ব্যাক্তি এই মোবারক আমলে শরীক হলনা আর শরীক হবার আকাংখা না নিয়েই মারা গেল তার মৃত্যুকে মুনাফেকীর উপর মৃত্যু সাব্যস্ত করা হয়েছে।

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق.

- الصحيح لمسلم :141/2 باب ذَمٍّ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ . رقم الحديث:4894 - المسند للإمام أحمد :29/9 رقم الحديث:8851 ، - سنن أبي داوود:339/1 باب كراهية ترك الغزو . رقم الحديث:2502

যে ব্যাক্তি জিহাদের কোন ক্ষত, আঘাত বা জিহাদের কোন কাজে শরীক হওয়া ছাড়াই দুনিয়া থেকে বিদায় নিল তার ব্যাপারে ঘোষনা করা হয়েছে যে, সে হাশরের ময়দানে আল্লাহর দরবারে এমন ভাবে দাঁড়াবে যে, তার গায়ে এক ধরণের ক্রুটি পরিলক্ষিত হবে বা তার দ্বীনদারিত্বে কমতি দেখা যাবে।

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم : (من لقى الله بغير أثر من جهاد لقى الله وفيه ثلمة) .

سنن الترمذى: 296/1 رقم الحديث: 1657- مستدرك للحاكم : 79/2 ،

মূল আলোচনায় আসি

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমার জিহাদের ফাযায়েল ও মর্যাদা বয়ান করা উদ্দেশ্য নয়। বরং এই গুটি কয়েক ফাযায়েল ও ধমকি বার্তা উল্লেখ করার দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হল এটা বুঝানো যে, এই মোবারক আমলটি শরীয়তের দৃষ্টিতে কত মহান। তাই এই মোবারক আমলে অংশগ্রহণকারী সৌভাগ্যবান মুজাহিদীনে কেরাম বরং সায়্যেদুল মুজাহিদীন নাবীয়্যুস্ সাইফি ওয়ার্ রাহ্মাহ্ (সা.) এর সুপুত্রদের উপর যে পরিমানই ইর্ষা করা হবে তা কমই বলতে হবে। আল্লাহ তায়ালা আপন অনুগ্রহে আমাদেরকে এতে পূর্ণ অংশ গ্রহনের তাওফীক দিন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

জিহাদ এবং আরবী ভাষা

এতো ছিল বরকতময় আমল জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহের হাক্বীকত। কিন্তু জিহাদ শব্দটি যেহেতু আরবী শব্দ আর আরবী ভাষায় এর অর্থ হল চেষ্টা করা, খুব মেহনত করা । আমি ইহাও সামর্থন করি যে, কুরআনে কারীমেও কোন কোন স্থানে এ আভিধানিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, বরং শরীয়ত অধিকাংশ সময় জিহাদ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এর গুরুত্ব ও মাহাত্বের প্রতি লক্ষ্য করে উৎসাহ ও উদ্দিপনা যোগানোর

উদ্দেশ্যে অন্যান্য কিছু ইবাদতের উপর রূপক অর্থে জিহাদ শব্দটি প্রয়োগ করেছে। এতে প্রত্যেক স্বল্প জ্ঞানী বরং (আফসোসের সাথে বলতে হচ্ছে) কিছু সংখ্যক আহলে ইলম ও লেখক সাহেবানও এর দ্বারা ধোকায় পড়ে গেছেন। আর তারা দ্বীনের প্রত্যেক কাজ যার মধ্যে নূন্যতম চেষ্টা-প্রচেষ্টা বা কষ্ট-মেহনত রয়েছে তাকে জিহাদ বলে দিচ্ছেন। অথচ ইহা সরাসরি বে-ইনসাফী ও বাড়াবাড়ি। কারণ, শরীয়ত যখন প্রতিটি আমল ও প্রতিটি ইবাদতের জন্য যথাযোগ্য ভিন্ন ভিন্ন নাম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাহলে আমাদের কী প্রয়োজন দেখা দিলো যে, আমরা খামোখা বিভিন্ন আমল ও ইবাদতের নাম ও আহকামের মধ্যে পরস্পরে গড়মিল করে ফেলবো।

দেখুন, যদি কোন মজদুর জুন মাসের গরমে অথবা আগষ্টের শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে লোহার ফ্যাক্টরীতে বা ইটের ভাটায় কাজ করে অথবা কৃষক তীব্র গরমের মৌসুমে গম ইত্যাদি কাটার কাজ করে এবং পিপাসার কাতরতা বরদাশত করে ও ক্ষুধার তীব্রতা সহ্য করে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও নামাজ কেন রমজানের রোযাকেও কাযা করা সমীচিন মনে করে না। অথবা কোন ব্যবসায়ী বেঈমানী ও সুদখোরীর সাগর থেকে নিজেকে বাচিয়ে রাখে। আর বাজারের বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার মধ্যে দৃষ্টির হেফাযত করে এবং প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার সময়ও যোহর বা আসরের আযান শুনেই দোকান বন্ধ করে আল্লাহ তায়ালার দরবারে উপস্থিত হয়। অথবা কোন ব্যক্তি শীত বা প্রচণ্ড গরমের মৌসুমে কাঁধে বিছানা নিয়ে নিজ বাসস্থান ছেড়ে সফরে বেরিয়ে, দিলে আল্লাহর দ্বীনের ফিকির নিয়ে ও যবানে আল্লাহর যিকির করতে করতে প্রথভ্রষ্ট গোনাহগার মানবজাতির সম্পর্ক সৃষ্টিজীব থেকে বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহর সাথে জুড়ে দেওয়ার কাজে সচেষ্ট। এবং মানুষের তিক্ত কথা বার্তা ও অসহনীয় মন্তব্য অপদস্থতার চরম সীমা পর্যন্ত বরদাস্ত করেও মদদ ও নুসরতের আশায় ঘরে ঘরে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে যাচ্ছে।

অথবা কোন মুসলিম বোন ইউরোপের অশ্লীল, উলঙ্গ ও দুর্গন্ধময় পরিবেশে পরিস্থিতির মোকাবেলা করে পর্দা করছে এবং নিজের ইজ্জত আব্রুর হেফাজতের জন্য পঙ্কিলতা থেকে নিজেকে রক্ষা করছে এবং গুণাহের আগত বাধা বিপত্তিকে উপেক্ষা

করে এক আল্লাহর সন্তষ্টির উদ্দেশ্যে সারা দুনিয়ার নারাজি ও অসন্তুষ্টি সয়ে নিচ্ছে। তাহলে এ কারনামাটি নি:সন্দেহে শত প্রশংসাযোগ্য ও ঈর্ষণীয়। বরং অনুসরণযোগ্যও বটে। ইহা অনেক বড় কুরবানী ও লিল্লাহিয়্যাত আর এ দ্বিগুন কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করার কারণে তার সওয়াব নি:সন্দেহে সাধারণ নামাযীদের থেকে বেশি, সাধারণ রোযাদারদের থেকে বেশি এবং সাধারণ ব্যবসায়ীদের থেকে বেশি এবং সাধারণ মহিলাদের পর্দার চেয়ে কয়েকগুন বেশি হবে। এই ব্যবসায়ী এ কাজের জন্য কিয়ামতের দিবসে আম্বিয়ায়ে কেরামের সঙ্গে থাকবে রবং সম্ভাবনা রয়েছে যে, কষ্ট-ক্লেশ সহ্য ও লিল্লাহিয়াতের উপর ভিত্তি করে তার সওয়াব অনেক ক্ষেত্রে মুজাহিদ এবং গাজীদের চেয়েও বেশি হবে। কিন্তু এতোদসত্ত্বেও এই দিনমজুর ও কৃষকের ইবাদত, রোযা এবং ব্যবসায়ীর নামায এবং এই দায়ীর দাওয়াত ও তাবলীগ অথবা উক্ত মহিলার সতিত্ব ও পর্দাকে আমরা জিহাদ নামে আখ্যায়িত করব, তা অসম্ভব।

এ সকল অবস্থা সত্ত্বেও পর্দা-পর্দাই থাকবে, রোযা-রোযা, নামাজ-নামাজ, আর দাওয়াত-দাওয়াতই থাকবে। এ সকল ব্যক্তিদের এই বরকতময় আমলকে জিহাদ নামে আখ্যায়িত করা শরীয়তের সাথে বাড়াবাড়ি ও বে-ইনসাফী এবং দ্বীনের মধ্যে বিকৃতিসাধন হবে। যা একজন মুসলমানের জন্য অসহনীয় বিষয়। বরং আমরা তো জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এর নাম দিবো শহীদ হওয়াকে। অথবা এমন মাল খরচ করা এবং দাওয়াত দেওয়াকে যা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার জন্য সহায়ক হবে।

শাইখুল হাদীস হযরত মাও. যাকারিয়া রহ. এর পত্র।

ইহা আমার ব্যক্তিগত খেয়াল নয়। বরং আমাদের আকাবিরদের আদর্শ এবং শরীয়তের ফয়সালা। সর্বোপরি ইহা স্পষ্ট রূপে সবার সামনে আসার জন্য শাইখুল হাদীস হযরত মাও. যাকারিয়া কান্ধলভী রহ. এর একটি চিঠি পেশ করছি। এর সংক্ষিপ্ত পটভূমি হলো এই, মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর মাদ্রাসার এক উস্তাদ আবুল আলা মওদুদীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। হযরত শাইখুল হাদীস রহ. তাহার ইসলাহ ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে একটি পত্র লিখলেন যার

মধ্যে আবুল আলা মওদুদীর দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা-চেতনা সবিস্তারে বর্ননা করেছেন। এই পত্রটি যদিও অনেক দীর্ঘ কিন্তু মওদূদীর দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার জন্য অত্যন্ত উপকারী। যারা পুরো পত্রটি দেখতে চান তারা শাইখুল হাদীস রহ. এর বিশিষ্ট খলীফা সূফী মুহাম্মাদ ইকবাল হুশিয়ারপূরী রচিত مودودی اور انکے تحریرات کے متعلق چند مضامین নামক কিতাবটি পড়ে নিন। বরং আমরা পরামর্শ তো এই যে, ইহা অবশ্যই পড়া চাই।

এতে হযরত শাইখুল হাদীস রহ. ইবাদত সম্পর্কে মওদূদীর দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করে এর উপর পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন, “আপনি নিজেই খেয়াল করুন যে, ইবাদতের মর্মার্থের গুরুত্ব মেনে নেওয়ার পরও যখন সে ইবাদতকে ইবাদত নয় এমন জিনিসের সাথে মিলিয়ে ফেলেন তাহলে ইবাদতের মর্মার্থের গুরুত্ব জামায়াতের মধ্যে কীভাবে বাকী থাকবে। আমার দৃষ্টিতে এই বিষয়টি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। যখন মানুষের দৃষ্টি থেকে ইবাদতের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র চলে যেতে থাকবে তখন নি:সন্দেহে ইবাদতের গুরুত্বও চলে যেতে থাকতে থাকবে। এখন ইহা লক্ষ্য করুন যে, তিনি (মওদূদি সাহেব) ইবাদতের নতুন ব্যখ্যা কী করেছেন? তিনি লিখেছেন, “ ঐ ব্যক্তি ভুল বলে যে বলে, ইবাদত শুধু তাসবীহ ও মুসল্লা এবং মসজিদ ও খানকাহ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। নেককার একজন মুমিন ব্যক্তি শুধুমাত্র ঐ সময়ই ইবাদত রত থাকে যখন সে দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে বার মাসের একমাস রোযা রাখে, বৎসরে একবার যাকাত প্রদান করে সারা জীবনে একবার হজ্ব করে। বরং তার সারাটা জীবন শুধু ইবাদতই ইবাদত যখন সে ব্যবসা বানিজ্যে হারাম ছেড়ে হালাল রুজীর উপর সন্তুষ্ট থাকে, তখন কি তার এটা ইবাদত হয় না? যখন সে মুআমালাতে যুলুম ও মিথ্যা, প্রতারণা ও ধোকাবাজি হতে বিরত থেকে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে কাজ সম্পাদন করে তখন ইহা কি ইবাদত হবে না।?

চুড়ান্ত সত্য ইহাই যে, আল্লাহ তায়ালার কানুনের পাবন্দী এবং তার শরীয়তের অনুসরণের মাধ্যমে মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতের যে কাজই করুক তা সারাসরি ইবাদত বলে গণ্য হবে। এমনকি বাজরে ক্রয়-বিক্রয় পরিবার পরিজনের সাথে তার

আচার আচরণ এবং নিজের পার্থিব কর্মব্যস্ততায় মনোনিবেশও ইবাদত। এরপর শাইখুল হাদীস রহ. এর মন্তব্য লক্ষ্য করুন, “বাহ্যিক দৃষ্টিতে আলোচনাটি অত্যন্ত সুন্দর এবং দ্বীনের গুরুত্ব সৃষ্টিকারী। কিন্তু আপনি চিন্তা করে দেখুন ইবাদতকে এমন জিনিসের সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে যা ইবাদত নয়। হাদীস পড়ুয়া সর্বনিম্নস্তরের একজন ছাত্রও এ পার্থক্য নিরুপণ করতে পারে যে, ইবাদত এবং মুআমালাত দুটি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস। হাদীস এবং ফিক্বাহের কিতাবসমূহ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই পার্থক্য দ্বারা ভরপুর যে, ইবাদত ও মুআমালাত ভিন্ন দুটি বস্তু।

(যদি আল্লাহর বিধি নিষেধের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় এবং এর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয় তাহলে এ কারনে এই কাজ দ্বারা ইবাদতের মতো সওয়াব পেয়ে যাওয়া ভিন্ন কথা আর নি:সন্দেহে সওয়াব পাবেও। এই আজর ও সওয়াবের কারণে নুসূস তথা শরীয়তের নির্দেশমালার কোন কোন জায়গায় ইহার উপর রুপক অর্থে ইবাদত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু শুধু এ কারণে যে, ইহার দ্বারাও আজর ও সওয়াব পাওয়া যায় ইহা কি ইবাদতের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে?)

ইহাতো এমন যেমন রাসূল সা. বলেছেন:

عن زيد بن خالد الجهني : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال (من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا)

-الصحيح لمسلم:137/2 باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير . رقم الحديث:4865- مسند أحمد-60/16 رقم الحديث:21577، - صحيح ابن حبان-490/10 ذكر التسوية بين الغازي وبين من خلفه في أهله بخير في الأجر. رقم الحديث:4631 ،

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুজাহিদদের সামানের ব্যবস্থা করে দিলো অবশ্যই সে জিহাদ করলো আর যে ব্যক্তি মুজাহিদের পরিবার-পরিজনের ভাল-মন্দ খোঁজ খবর রাখলো এবং তাদের সহযোগিতা করলো নিশ্চয় সে জিহাদ করলো।

হাদীস বুঝে এমন একজন সাধারন ব্যক্তিও কি এই হাদীস থেকে ইহা বুঝবে যে, কোন মুজাহিদকে সহযোগীতা করা বা তার পরিবার-পরিজনের খোজখবর নেওয়াই প্রকৃত জিহাদ।

আল্লাহর তায়ালার বাণী: إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ

উক্ত আয়াতে তো স্পষ্ট, ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা এখানে প্রকৃত ক্রয় উদ্দেশ্য নয়। বরং রূপক অর্থ উদ্দেশ্য। যেমনটি ব্যাখ্যা করেছেন ইমাম সারাখসী রহ. মাবসূত নামক কিতাবের ২য় খণ্ডের ২৪৮ পৃষ্ঠায়। এমনি ভাবে সওয়াবের প্রত্যেক কাজের উপর রূপক অর্থে ইবাদত শব্দটির ব্যবহার তার শরীয়ত প্রদত্ত মৌলিকতাকে পরিবর্তন করতে পারে না।

مودودی صاحب اور انکی تحریرات کے متعلق چند اہم مضامین صفحہ 213-215

সুপ্রিয় পাঠক-পাঠিকা! আপনারা গভীর দৃষ্টিতে শাইখুল হাদীস রহ. এর ইবারতকে বার বার পড়লে এ অধমের অবস্থান বুঝতে আপনাদের মোটেও দেরী লাগবে না। আমার আবদার হল এই যে, আমার অবস্থানটি মাথায় রেখে শাইখুল হাদীস রহ. এর ইবারতের রেখা টানা অংশটুকু বার বার পড়ুন। আমি ইহাই বলেছি যে, কোন দ্বীনি কাজে কষ্ট ও মেহনতের কারণে জিহাদের সওয়াব পেয়ে যাওয়া অথবা রূপক অর্থে এর উপর শরীয়ত কর্তৃক জিহাদ শব্দ ব্যবহার করে ফেলা আর এই সমস্ত আমলকে প্রকৃত জিহাদ হিসেবে গণনা করা দুটো ভিন্ন ভিন্ন জিনিস।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের কে সঠিক আমল ও শুভবুদ্ধি দান কর। আমীন!

দুটি স্তর

প্রথম স্তর:

জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ অর্থে ব্যাপকতা সৃষ্টিকারী দুটি স্তর। এক স্তরের সদস্যরা তো প্রবৃত্তির ক্ষুধার্ত চাহিদার গোলাম, কাপুরুষতার শীর্ষে সমাসীন এবং অকর্মণ্য ও

অলস। যারা নিজেরাও জিহাদের নাম শুনে ভয় পায়, অন্যদেরও ভয় দেখায় এবং জিহাদের নাম শুনে এমন ভয় পায় যেমন শয়তান আযানের শব্দ শুনে বায়ূ ছাড়তে ছাড়তে পলায়ন করে। এ সকল লোক ইসলাম এবং মুসলমানদের চরম শত্রু। কুরআনে হাদীসে অপব্যাখ্যাকারী বেদ্বীন ও মুনাফিকদের ঐ গ্রুপ যারা ইসলামকে নি:শেষ করার জন্য ইসলামের পোশাক পরিধান করে মুসলমানদের কাতারে ঢুকে পড়েছে। এরা পারলে কুরআন-হাদীস থেকে জিহাদের আয়াত গুলোকে খুটিয়ে খুটিয়ে তুলে পরিস্কার করে দিতো। কিন্তু শোকর শত শোকর! যে, কুরআন এবং হাদীসের শব্দ এবং এর ব্যাখ্যা সংরক্ষনের দায়িত্ব খোদ আল্লাহ তায়ালা নিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু এদের কামনা এই যে, তাদেরকে ইসলামের হিরো, মুফাক্কিরে ইসলাম, মুদাক্কিকে ইসলাম ইত্যাদি নামে ডাকা হোক এবং তাদের অসৎ চেষ্টা-প্রচেষ্টাগুলোকে মুসলমানদের জন্য আলোর মিনার সাব্যস্ত করা হোক এবং যারা জুতার সমতুল্য তাদেরকে উম্মতের রাহবার মেনে নেওয়া হোক এবং তাদের ধংসাত্মক দুষ্কর্মগুলোকে তাজদীদি কারনামা তথা নবায়নমূলক কৃতিকর্ম হিসেবে স্মরণ করা হোক বরং তাদেরকে জিহাদের নেতা ও রাহবার মেনে নিয়ে ইসলামের বিজয়ীদের মতো তাদের গলায় মালা পরিয়ে সব জায়গায় তাদেরকে ইস্তেকবাল জানানো হোক, অভ্যর্থনা করা হোক। কিন্তু *ایں خیال است ومحال است وجنوں* এদের ব্যাপারেই বলা যেতে পারে

لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنْ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ - (سورة آل عمران - 188)

অনুবাদ: যারা তাদের কৃতকর্মের প্রতি খুশি হয় এবং যা তারা করেনি তা নিয়ে প্রশংসিত হতে পছন্দ করে, তুমি তাদেরকে আযাব থেকে মুক্ত মনে করো না। আর তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

উক্ত আয়াতের তাফসীরে শাইখুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. বলেন যে, ইয়াহুদীরা মাসআলা বলতো, সুদ-ঘুস গ্রহণ করতো, জেনে

বুঝে পয়গম্বর সা. এর গুণাবলী এবং সুসংবাদ সমূহকে লুকাতো আর খুশি হতো যে, আমাদের চালাকী কেউ ধরতে পারে না। এবং আশা রাখতো যে, লোকেরা আমাদের প্রশংসা করে বলবে যে, অনেক বড় আলেম, দ্বীনদার এবং হক্বের পতাকাবাহী। অন্যদিকে মুনাফিকদের অবস্থাও এর সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিলো। যখন কোন জিহাদের সময় আসতো তখন চুপচাপ ঘরে বসে থাকতো এবং নিজেদের এই কৃতকর্মের উপর খুশি হতো যে, দেখ কীভাবে জীবন বাচিয়েছি। যখন রাসূল সা. জিহাদ থেকে ফিরে আসতেন তখন অনুপস্থিতির কারণ হিসেবে মিথ্যা অজুহাত পেশ করে চাইতো যে, রাসূল সা. এর দ্বারা নিজেদের প্রশংসা করিয়ে নিবে।

এদের সবাইকে বলে দেওয়া হয়েছে যে, এ ধরনের কথা বার্তা দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তি দিতে পারবে না। প্রথমত এ ধরনের লোক দুনিয়াতেই লাঞ্ছিত হয়। আর কোন কারণে দুনিয়াতে বেচে গেলেও আখেরাতে মুক্তি পাওয়ার কোন রাস্তা নেই।

সতর্কতা!!! এই আয়াতে যদিও ইয়াহুদী এবং মুনাফিকদের কথা আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু মুসলমানদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, খারাপ কাজ করে খুশি হয়ো না, ভাল কাজ করে অহংকার করো না। আর যে ভাল কাজ করোনি তার উপর প্রশংসা প্রাপ্তির অভিলাষ রেখো না। (তাফসীরে উসমানী- আল ইমরান)

এদের এই ভ্রান্ত ফিকির এবং অসদুদ্দেশ্যের উপর মেহনতের ফলাফল এই হয়েছে যে, দুনিয়াতে প্রত্যেক ব্যক্তি মুজাহিদ হয়ে আছে। যে ব্যক্তি দুই লাইন বক্তৃতা করে ফেললো সে বলছে আমিও মুজাহিদ। যে ট্যাক্সি চালায় সে বলছে আমিও মুজাহিদ। যে বাচ্চা লালন করে সে বলছে ইহাও জিহাদ। বুঝে আসেনা, গোটা উম্মত জিহাদে লিপ্ত এরপরেও উম্মতের লাঞ্চনা ও অপদস্থতা দূর হচ্ছে না। অথচ ইজ্জত-সম্মান তো জিহাদের অনিবার্য ফলাফল। জিহাদ হবে তো সম্মান আসবে। জিহাদ হবে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। আজ সবদিকে শুধু মুজাহিদ আর মুজাহিদ। কেউ নিজেকে জিহাদের

নিম্নস্তরটিতেও যেতে রাজি নয়। এরপরও কেন উম্মত জুলুমের স্বীকার? মুসলমানদের খুপড়ীগুলো কেন চূর্ণ-বিচুর্ণ? কুরআন শরীফগুলোকে কেন জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে? মসজিদগুলো কেন মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বায়তুল মুকাদ্দাস কেন অভিশপ্ত ইয়াহুদীদের হাতে? হারামাইন শরীফাইনের আশে-পাশে কেন মার্কিন-ইয়াহুদী সেনারা তাবু গেড়ে রেখেছে? মুসলমানরা নিজেদের দেশেও কেন স্বীয় ফয়সালা গ্রহনে স্বাধীন নয়? আসল আলোচনা এই স্তরের লোকদের সাথে নয়। কেননা এরা তো প্রবৃত্তির দাস এবং নফসের গোলাম। এদের বুঝানো আমার কলমের ক্ষমতার উর্ধ্বে। বাস্! আল্লাহকে হাযির নাযির জেনে তার কুদরাতী পায়ে ললাট ছুয়ে (সিজদা করে) দোয়া করি হে আল্লাহ সবাইকে সত্যের পথ দেখাও এবং তাতে চালাও।

দ্বিতীয় স্তর:

হ্যাঁ, একটি স্তর এমনও রয়েছে যারা মুখলিছ, দ্বীনের প্রতি মমতাশীল, জিহাদ এবং মুজাহিদদের প্রতি আক্বিদত ও মুহাব্বাত পোষন করে। যাদের ইখলাছের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করাটাও হয়তো নিজেকে ঈমানহারা করে ফেলার নামান্তর। এ সকল লোক যদিও জিহাদের ময়দান থেকে দূরে কিন্তু তাদের অন্তর সব সময় মুজাহিদদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। এবং যদি তাঁদের ইলমী, ইসলাহী এবং দ্বীনি ব্যস্ততা না থাকতো তাহলে সম্ভবত বরং নি:সন্দেহে এসকল লোক প্রথম সারির বরং মুজাহিদদের সিপাহসালারের ভূমিকা পালন করতো। তাদের ইলমি এবং ইসলাহী চেষ্টা-প্রচেষ্টাগুলো নি:সন্দেহে ইসলাম ধর্মের প্রতিটি শাখার জন্য খুব জরুরী এবং খোদ জিহাদ এবং মুজাহিদদের জন্য উপকারী।

আল্লাহ তাআ'লা এ সকল হযরতদের ইখলাছ, তাক্বওয়া এবং ইলমী ও ইসলাহী চেষ্টা-সাধনা থেকে আমাকেও পরিপূর্ণ হিসসা দান করেন। আমীন! তাঁদের জুতাগুলো আমার মাথার মুকুট, তাদের পদধূলী আমার চোখের সুরমা, তাঁদের দোয়া এবং নেক নজরই পূঁজি- আমার জন্য এবং উম্মতে মুসলিমার জন্য।

সুতরাং এই ধরণের লেখক ও আহলে ইলম হযরতদের অবস্থানকে ধাক্কা দিয়ে নাকচ করে দেওয়ার পরিবর্তে তাদের মানসিক হতবুদ্ধিতাকে সামনে এনে দলীল এবং যুক্তির মাধ্যমে পরিস্কার করে দেওয়া জরুরী। এবং আল্লাহর অনুগ্রহে প্রার্থনা করছি যে, হে আল্লাহ তুমি স্বীয় অনুগ্রহে এই বিষয়টিকে পরিপূর্ণতায় পৌছানোর তাওফীক আমাকে দান কর। এবং আমাকে আমার মাকসাদে কামিয়াবী দান কর। এবং আমার এই সামান্য মেহনতকে কবুল করে উম্মতে মুসলিমার জন্য উপকারী বানিয়ে দাও। আমীন! ইয়া রব্বাল আলামীন!

আমি সর্বপ্রথম নিজের দাবী উত্থাপন করব। এরপর ইহার দলিল ও প্রমাণসমূহ পেশ করব। অত:পর ধারাবাহিকভাবে আপত্তিগুলো উল্লেখ করে সবিস্তারে এর উত্তর প্রদান করব। ইনশা-আল্লাহ।

দাবী

জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ শুধু আর শুধু আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার নাম। অথবা প্রত্যেক ঐ আমল যা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধকারী হয় এবং এর দ্বারা জিহাদেরই সমর্থন পাওয়া যায়। চাই তা মুখের দ্বারা হোক বা কলমের দ্বারা বা অর্থ দ্বারা। সুতরাং যদি কারো কলম এজন্য লেখে চলে যে, এর দ্বারা হক্ব-বাতিলের লড়াইয়ের চিত্র অংকন করবে, যুদ্ধের ময়দানের জন্য মুজাহিদীন তৈরী হবে, মুজাহিদদের উৎসাহ প্রদান করা হবে আর কাফেরদের সাহস দমিয়ে দেওয়া হবে, গাজী এবং শহীদের অবস্থা সাধারণ মুসলমান পর্যন্ত পৌছানো হবে তাহলে এই কলমের চেষ্টা-প্রচেষ্টাও নি:সন্দেহে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এর সংজ্ঞাভুক্ত হবে। তদ্রুপ মুখের ভাষা যদি এ জন্য প্রয়োগ করা হয় যে, এর দ্বারা মুসলিম উম্মাহর অন্তরে আবেগ ও জযবার ঝড় সৃষ্টি করে যুবক শ্রেণীকে ময়দানে ও জিহাদের দিকে উদ্বুদ্ধ করা হবে। এবং পদ্য ও গদ্য, কবিতা ও কবিত্ব এবং ওয়াজ ও বক্তৃতার মাধ্যমে মুসলমানদের রক্তকে উষ্ণ করা হবে তাহলে ইহাও নি:সন্দেহে জিহাদেরই একটি শাখা। তদ্রুপ যদি অর্থের মাধ্যমে যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় করা হয়, মুজাহিদদের জন্য অন্ন-বস্ত্রের

ব্যবস্থা করা হয় এবং গাজী ও শহীদদের পরিবার পরিজনের দেখা-শোনা করা হয় তাহলে নি:সন্দেহে ইহাও জিহাদ বলে গণ্য হবে। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো এ সব কিছু আমীরের অনুসরণেই হতে হবে। রূপক অর্থে এগুলোকে জিহাদও বলা যেতে পারে কিন্তু এগুলোকে প্রকৃত জিহাদ গণ্য করা যাবে না। আর যদি কলম দিয়ে ইসলাম ধর্মের বিষয়ে লিখে যাওয়া হয় এবং মুখের ভাষা উম্মতের ইসলাহ ও রাহনুমায়ীর জন্য ব্যবহার করে যাওয়া হয় অথবা অর্থ দিয়ে মাদরাসার ভবন নির্মাণ ও উন্নতি প্রদান করা হয় তাহলে ইহাকে একটি নেক কাজ তো বলা যাবে আর নি:সন্দেহে ইহা নেক কাজই। কিন্তু ইহাকে কস্মিনকালেও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বলা যাবে না।

اللهم ارنا الحق حقًّا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه

দলিল-১

لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ّالله بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ُ ّالله الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ ُ ّالله الْحُسْنَى وَفَضَّلَ ُ ّالله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً - دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ُ ّالله غَفُوراً رَحِيماً (سورة النساء-95- 96)

অনুবাদঃ বসে থাকা মুমিনগণ, যারা ওযরগ্রস্থ নয় এবং নিজদের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীগণ এক সমান নয়। নিজদের জান ও মাল দ্বারা জিহাদকারীদের মর্যাদা আল্লাহ বসে থাকাদের উপর অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ প্রত্যেককেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং আল্লাহ জিহাদকারীদেরকে বসে থাকাদের উপর মহা পুরস্কার দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

উক্ত আয়াতে দু'ধরণের লোকের আলোচনা করেছেন (قاعدون) তথা ঘরে বসে থাকা লোক ও (مجاهدون) তথা জিহাদকারী লোক। আর (مجاهدون) কে

(قاعدون) এর মোকাবেলায় উল্লেখ করাটা একথার দলিল যে, জিহাদ অর্থ শুধুমাত্র যুদ্ধ করা। কেননা (قاعدون) এর মধ্যে রয়েছে ঐ সকল লোক যারা দ্বীনের কোন কাজ করে কিন্তু জিহাদ করে না। চাই সে তাদরীসের কাজ করুক বা তাসনীফের কাজ করুক, খানক্বায় আত্মশুদ্ধির দায়িত্বে নিয়োজিত থাকুক কিংবা নামাজ রোজার দাওয়াত নিয়ে মানুষের ঘরে ঘরে বেড়াক।

এজন্য আমি বিশেষভাবে এসকল হযরতদের কাছে দরখাস্ত করব যারা দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করে যাচ্ছেন, আর মা-শা-আল্লাহ অত্যন্ত পূণ্যময় কাজে লিপ্ত। কিন্তু তারা তাদের একাজকে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বরং এর চেয়ে বড় মর্যাদা দিয়ে থাকেন, আর দ্বীনের অন্য কোন কাজ সম্পাদনকারীকে এমনকি মুজাহিদদেরও আসল দ্বীনের জন্য মেহনতকারী মনে করেন না। তারা যেন এই আয়াতের তাফসীরের জন্য মাওলানা মুহাম্মাদ ইহতেশামুল হাসান রহ. রচিত مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ও সর্বপ্রথম আমীর হযরতজী মাও. মুহাম্মাদ ইলিয়াস রহ. এর নির্দেশে লিপিবদ্ধ করেছেন। তার উক্ত পুস্তিকাটি এখন ফাযায়েলে আ'মাল এর অংশ।

হযরত মাও. ইহতেশামুল হাসান রহ. লিখেছেন যদিও এই আয়াতে জিহাদ দ্বারা উদ্দেশ্য কাফেরদের মোকাবেলায় দৃঢ়পদ থাকা যেন ইসলামের বাণী সুউচ্চ থাকে আর কুফর ও শিরক পরাজিত ও অপদস্ত হয়। কিন্তু যদি দূর্ভাগ্যবশত আজ আমরা এই মহা সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকি তাহলে এই মাকসাদের জন্য যতটুকু চেষ্টা প্রচেষ্টা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব তাতে তো কখনই অবহেলা করা উচিত নয়। আবার আমাদের এই সামান্য কাজ ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা আমাদেরকে সামনে অগ্রসর করে দিবে।

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (سورة العنكبوت:٦٩)

অর্থাৎ যে সকল লোক আমার দ্বীনের জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা করে আমি তাদের জন্য আমার রাস্তা খুলে দেই। রেখা টানা বাক্যটি মনোযোগ সহকারে আরো একবার পড়ে নিন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে শুভবুদ্ধি দান করুন। বুযুর্গতো জিহাদকে "মহা সৌভাগ্য" আর এই দাওয়াতের কাজকে "সামান্য প্রচেষ্টা" আখ্যা দিচ্ছেন। কিন্তু আমরা ইহাকে গোটা দ্বীনের দাওয়াত, আসল কাজ, তারতীবে নবুওয়াত এবং আরো না কী কী উপাধিতে ভূষিত করছি। এবং আমাদের বুযুর্গ যেটাকে মহা সৌভাগ্য বলছেন আমরা তা থেকেই পালিয়ে যাচ্ছি। এবং অন্যকেও এর কাছে যেতে দিচ্ছি না।

বুযুর্গ আরেকটু অগ্রসর হয়ে يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ এর অধীনে বলেন, অন্য একটি বিষয় যা আমাদের কাছে মাতলূব বা প্রাপ্য তা হলো জিহাদ। আর মূলত জিহাদ যদিও কাফেরদের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহ এবং মোকাবেলার নাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জিহাদেরও মূল উদ্দেশ্য হলো ইলায়ে কালিমাতুল্লাহ বা আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করা। এবং খোদায়ী বিধান চালু করা ও তা প্রয়োগ করা। আর ইহাই আমাদের আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য।

দলিল-২

عن بشير بن الخصاصية قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه فقلت: علام تبايعني؟ يا رسول الله! فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وتصلي الصلوات الخمس لوقتها، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، وتحج البيت وتجاهد في سبيل الله، قلت: يا رسول الله! كلا نطيق إلا اثنتين فلا أطيقهما: الزكاة، والله مالي إلا عشر ذود هن رسل أهلي وحمولتهن، وأما الجهاد فإني رجل جبان ويزعمون أنه من ولى فقد باء بغضب من الله وأخاف إن حضر القتال أن أخشع بنفسي فأفر فأبوء بغضب من الله، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها ثم قال: يا بشير! لا صدقة ولا جهاد فبم إذن تدخل الجنة؟ قلت: يا رسول الله! ابسط يدك أبايعك، فبسط يده فبايعته عليهن كلهن.

- كنز العمال: 36865 حرف الفاء ، - السنن الكبرى للبيهقى: 40/9 رقم الحديث:17796 ، - المستدرك للحاكم :80/2

অনুবাদঃ হযরত বশির বিন খাসাসিয়াহ রা. বলেন আমি রাসূল সা. এর কাছে বাইয়াত হওয়ার জন্য তাঁর খেদমতে হাযির হলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম হে আল্লাহর রাসূল আপনি আমাকে কোন কোন বস্তুর উপর বাইয়াত করাবেন? তিনি স্বীয় হস্ত মুবারক বাড়িয়ে দিলেন এবং বললেন তুমি একথার সাক্ষী দাও যে, আল্লাহ এক তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। এবং হযরত মুহাম্মাদ সা. আল্লাহ তা'য়ালার বান্দা ও রাসূল। এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময় মত আদায় করবে, ফরয যাকাত আদায় করবে, রমযানের রোযা রাখবে, বাইতুল্লাহর হজ্ব করবে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আমি দুটি কাজ ছাড়া সব কাজ করতে পারবো। একটি হলো যাকাত। কেননা আমার নিকট দশটি উট-উষ্ট্রি রয়েছে। এগুলোর দুধের মাধ্যমেই আমার পরিবার পরিজনের ভরণ পোষণ হয়ে থাকে। দ্বিতীয়টি হলো জিহাদ। কেননা আমি দূর্বল মনের অধিকারী, কাপুরুষ। আর লোকেরা তো বলে, যে ব্যক্তি যুদ্ধের ময়দান থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে সে আল্লাহর অসন্তুষ্টি সাথে নিয়ে ফিরে যাবে। আমার ভয় হয় যে, যদি দুশমনদের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় আর আমি ঘাবড়ে গিয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাই তাহেল তো আমি আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিয়ে ফিরে আসবো, রাসূল সা. স্বীয় হাত পিছনে টেনে নিলেন এবং হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে বললেন যে, হে বশির! যখন তুমি না তো যাকাত দিবে আর না তো জিহাদ করবে। তাহলে কোন আমলের দ্বারা তুমি জান্নাতে যাবে। আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল সা. আপনি আপনার হাত বাড়িয়ে দিন আমি বাইয়াত হব। অতএব, তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং আমি এই সব আমলের উপর রাসূল সা. এর কাছে বাইয়াত হয়ে নিলাম।

আমার ভাই দোস্ত এবং বুযুর্গ! যদি জিহাদের অর্থ ক্বিতাল তথা যুদ্ধ করা ছাড়া অন্য কোন কিছুও হতো তাহলে বশির বিন খাসাসিয়া রাযি. কেন বললেন আমি

কাপুরুষ। এবং যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসার আশংকা কেন পেশ করলেন। অথবা নাউযুবিল্লাহ যদি সাহাবী জিহাদের অর্থ না-ই বুঝে থাকেন তাহলে রাসূল সা.-ই বলে দিতেন যে, জিহাদের অর্থ শুধু যুদ্ধ করা নয়। তুমি দ্বীনের অন্য কোন কাজ কর যাতে কষ্ট-ক্লেশ রয়েছে এ সবগুলোই জিহাদ। সুতরাং হে দোস্ত! রাসূল সা. এবং বশির রাযি. এর এই আমল একথার সাক্ষি যে, জিহাদ এর অর্থ শুধু ক্বিতাল তথা যুদ্ধ করা অন্য কিছু নয়।

দলিল-৩

রাসূল সা. এর যুগে মদীনা মুনাওয়ারায় যখন حي على الجهاد বলে জিহাদের প্রতি আহ্বান করা হতো তখন এসে দেখুন যে, সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর মুবারক আমল কি ছিল? যদি তখন নারী-শিশুসহ সকল সাহাবায়ে কেরাম জিহাদের অর্থ যুদ্ধ করাই বুঝে থাকেন এবং এই ঘোষণায় তরবারী এবং তীর-কামান নিয়ে রাসূলসা. এর খেদমতে দৌড়ে থাকেন, তাহলে তো জিহাদের অর্থ শুধু আর শুধু যুদ্ধ করাই হতে পারে। অন্যথায় কোন একট উদাহরণ তো এমন মিলতো যে, রাসূল সা. এর মুবারক যমানায় حي على الجهاد এর ঘোষণা হয়েছে আর কোন সাহাবী তো দূরের কথা কোন মুনাফেকও ইহা বলেছে যে আমি স্ত্রীর হক্ক আদায়ে লিপ্ত এও তো জিহাদ। আমার ইমান তো এখনও পরিপূর্ণ হয়নি; আমি স্বীয় ইমানের মজবুতির জন্য মুজাহাদা করে যাচ্ছি আর ইহাও তো জিহাদ। আমি তো মদীনা এবং মদীনার আশপাশে লোকদের কে দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছি; ইহাও তো জিহাদ। যদি একটি উদাহরণও এমন না পাওয়া যায়; আর সুনিশ্চিত পাওয়া যাবেও না, তাহলে তো ইয়াক্বীন করে নেওয়া চাই যে, জিহাদের অর্থ শুধু আর শুধু যুদ্ধ করা।

অথচ সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা তো ছিল এমন যে, কেউ পয়সা নিয়ে বাজারে গেছেন এবং বিয়ের জন্য প্রয়োজনীয় বাজার- সদাই করার সময় حي على الجهاد এর ঘোষণা শুনে ফেলেছেন তাহলে এই পয়সা দিয়েই তরবারী ও নেযা কিনে নিয়েছেন। এবং কেউ রাতে স্ত্রী সহবাস করার পর ভোরে গোসলের ইচ্ছা

করেছেন আর حي على الجهاد ঘোষণা শুনে এ অবস্থাতেই যুদ্ধের ময়দানে ছুটে চলেছেন।

দলিল-৪

ফুক্বাহায়ে কেরাম জিহাদের সংজ্ঞা কি করেছেন

১. আল্লামা ইবনে হাজার রহ. বলেন بذل الجهد في قتال الكفار (فتح البارى : ৬/৪) অর্থ, কাফেরদের হত্যা করতে নিজের পূর্ণ ক্ষমতা ব্যয় করা।

২. মোল্লা আলী ক্বারী রহ. বলেন الجهاد شرعا بذل المجهود في قتال الكفار (مرقات المفاتيح) অর্থ, কাফেরদের সাথে মোকাবেলা করতে নিজের পূর্ণ শক্তি ব্যয় করার নাম জিহাদ।

শাইখুত তাফসীর ওয়াল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ ইদরীস কান্ধলভী রহ. বলেন, ইবনে আব্বাস, আবু হুরাইরা, আয়েশা সিদ্দীকা এবং আবু বকর রাযি., যুহরী, সাঈদ ইবনে যুবায়ের, মুজাহিদ, উরওয়া ইবনে যুবায়ের, যায়েদ ইবনে আসলাম, ক্বাতাদাহ, মুকাতিল ইবনে হাইয়্যান এবং অন্যান্য আকাবির হযরত থেকে বর্ণিত যে, জিহাদের অনুমতি প্রদান করে যে আয়াত প্রর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে তা হলো এই,

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا (سورة الحج - 39)

ঐ সকল লোকদের জিহাদ এবং ক্বিতালের অনুমতি দেওয়া হলো যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে। এই অনুমতি এ জন্য দেওয়া হলো যে, এরা বড়ই নির্যাতিত, নিপীড়িত। (এখন তো স্পষ্ট হয়ে গেল যে, জিহাদের অনুমতি দেওয়া এবং ক্বিতালের আয়াত নাযিল করা একথার দলিল যে, জিহাদের অর্থ কেবল যুদ্ধ করা।-লেখক)
তিনি একটু পরেই লিখেন,

সারকথা:

সারকথা হলো এই যে, আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্যশীলদের আল্লাহ তা'য়ালার অবাধ্যচারীদের সাথে যুদ্ধ করা এবং তাঁর রাস্তায় সর্বচ্চো জানবাজি দেয়া। এবং দু:সাহসিকতা দেখানোর নাম জিহাদ। একটু অগ্রসর হয়ে আরো বলেন, খোলাসায়ে কালাম তথা কথার সারমর্ম হলো এই যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে যুদ্ধ করা হয় তার নাম জিহাদ। (এখন হযরতের এসকল উক্তির পরও কি অন্য কিছু উদ্দেশ্য নেওয়ার সুযোগ থাকে? সর্বোপরী আরয এই যে, কোন একজন ফক্বীহও এমন অতিবাহিত হননি যিনি জিহাদের পারিভাষিক সংজ্ঞা ক্বিতাল তথা যুদ্ধ করা দিয়ে করেন নি।-লেখক)

দলিল-৬

আমি সর্বশেষে ঐ দলিলটি পেশ করব যেটিকে যদিও প্রথমেই উল্লেখ করা উচিৎ ছিল কিন্তু ইহা স্বয়ং ছাহেবে শরীয়ত ও সর্বশেষ নবী রাসূলপাক সা. কর্তৃক প্রদত্ত জিহাদের ব্যাখ্যা। আর হুযুর সা. প্রদত্ত ব্যাখ্যার পরে অতিরিক্ত অন্য কিছুর কোন অবকাশই বাকী থাকে না। এজন্য ইহাকে আলোচ্য বিষয়ের চুড়ান্ত দলিল হিসেবে পেশ করছি।

عن عمرو بن عبسة قال قال رجل يا رسول الله..... وما الجهاد قال أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم قال فأي الجهاد أفضل قال من عقر جواده وأهريق دمه.

-مصنف عبد الرزاق:127/11 باب الإيمان والإسلام . رقم الحديث:20107، - مسند أحمد : 242/13 رقم الحديث:16964

হযরত আমর ইবনে আবাসা রাযি. বলেন যে, রাসূল সা. এর খেদমতে আরয করা হলো হে আল্লাহর রাসূল সা. জিহাদের অর্থ কী? রাসূল সা. উত্তর দিলেন যুদ্ধের ময়দানে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা আবার কেউ জিজ্ঞাসা করে বসলো, সর্বোত্তম

জিহাদ কোনটি? রাসূল সা. ইরশাদ করলেন, যে যুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনীর পা কেটে ফেলা হয় এবং মুজাহিদদের রক্ত প্রবাহিত করে দেওয়া হয়।

আপনিই চিন্তা করুন এরপরও কি কোন অবকাশ থেকে যায় যে, আমরা জিহাদের অর্থ যুদ্ধ করা নেব না। বরং জিহাদের অর্থে ব্যপকতা প্রদান করে অন্যান্য পূণ্যময় কাজগুলোকে নিজের পক্ষ থেকে জিহাদ আখ্যা দেব। ইহা রাসূল সা. প্রদত্ত জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর অর্থের সাথে বাড়াবাড়ি নয় কি? হে আল্লাহ তুমি আমাদের সঠিক বোধশক্তি দান কর। আমীন!

গাযওয়া এবং সারিয়া

গাযওয়া: ঐ যুদ্ধকে বলে যাতে রাসূল সা. স্বশরীরে অংশ গ্রহণ করেছেন।

সারিয়া: ঐ যুদ্ধসফরকে বলা হয় যাতে রাসূল সা. স্বশরীরে অংশগ্রহণ করেননি। বরং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. কে প্রেরণ করেছেন। যেমন হাদীসে এসেছে:

أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول (والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل) .

- الصحيح للبخاري :392/1 باب تمني الشهادة. رقم الحديث:2797 ، - مصنف عبد الرزاق: 254/5 باب فضل الجهاد. رقم الحديث:9532 - الصحيح لمسلم:133/2 باب فَضْلِ الْجِهَادِ وَالْخُرُوجِ فِى سَبِيلِ ّاللهِ. رقم الحديث:4822

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন রাসূল সা. ইরশাদ করেন কসম ঐ সত্ত্বার যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ,যদি এমন কোন মুমিন না থাকতো যাদের এতে সীমাহীন

কষ্ট হয় যে, আমি জিহাদে চলে যাব আর তারা পিছনে রয়ে যাবে। আর আমর নিকট কোন বাহনও নেই যে, তাদের কে তা দিয়ে সংগে নিয়ে যাব তাহলে আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে যাওয়া কোন গাযওয়া থেকেই পিছনে রয়ে যেতাম না। বরং কসম ঐ সত্ত্বার যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, আমার তো মন চায় যে, আমি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হবো পূণরায় আমাকে জীবিত করা হবে আবার শহীদ হবো অত:পর জীবিত করা হবে আবার শহীদ হবো পুণরায় জীবিত করা হবে আবারো শহীদ হবো।

	গাযওয়ার নাম	**সন**	**সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা**
১.	গাযওয়ায়ে আবওয়া	সফর ২ হিজরী	৬০ জন মুহাজির সাহাবী
২.	গাযওয়ায়ে বুওয়াত্ব	রবিউল আউয়াল বা সানী ২ হিজরী	২০০ সাহাবায়ে কেরাম
৩.	গাযওয়ায়ে উশাইরা	জুমাদাল উলা ২ হিজরী	২০০ মুহাজির সাহাবী
৪.	গাযওয়ায়ে সাফওয়ান	২ হিজরী	
৫.	গাযওয়ায়ে বদরে কুবরা	রমযান ২ হিজরী	৩১৩ জন সাহাবী রাযি.
৬.	গাযওয়ায়ে ক্বারক্বারাতুল	শাওয়াল ২ হিজরী	২০০ সাহাবায়ে কেরাম

	কাদার		
৭.	গাযওয়ায়ে ক্বাইনুকা	২ হিজরী	
৮.	গাযওয়ায়ে সাভীক্ব	জিলহজ্ব ৩ হিজরী	২০০ সাহাবায়ে কেরাম
৯.	গাযওয়ায়ে গাতফান	১২ রবিউল আউয়াল ৩ হিজরী	৪৫০ জন সাহাবায়ে কেরাম
১০.	গাযওয়ায়ে নাজরান	রবিউস সানী ৩ হিজরী	৩০০ সাহাবায়ে কেরাম
১১.	গাযওয়ায়ে উহুদ	১৫ শাওয়াল ৩ হিজরী	৭০০ সাহাবায়ে কেরাম
১২.	গাযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ	১৬ শাওয়াল ৩ হিজরী	উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ৩১৩
১৩.	গাযওয়ায়ে বনু নাযীর	রবি. আউয়াল ৪ হিজরী	
১৪.	গাযওয়ায়ে যাতুর রিক্বা	জুমাদাল উলা ৪ হিজরী	৪০০ সাহাবায়ে কেরাম
১৫.	গাযওয়ায়ে বদরে মাউঈদ	শাবান ৪ হিজরী	১৫০০ সাহাবায়ে কেরাম
১৬.	গাযওয়ায়ে দাওমাতুল জানদাল	রবি. আউয়াল ৫ হিজরী	১০০০ সাহাবায়ে কেরাম

১৭.	গাযওয়ায়ে বনী মুস্তালেক্ব	২ শাবান ৫ হিজরী	
১৮.	গাযওয়ায়ে খনদক্ব	শাউয়াল ৫ হিজরী	৩০০০ সাহাবায়ে কেরাম
১৯.	গাযওয়ায়ে বনী কুরাইযা	যিলক্বদ ৫ হিজরী	
২০.	গাযওয়ায়ে লিহইয়ান	রবি. আউয়াল ৬ হিজরী	২০০ সাহাবায়ে কেরাম
২১.	গাযওয়ায়ে ক্বারাদ	রবি. আউয়াল ৬ হিজরী	৫০০ সাহাবায়ে কেরাম
২২.	গাযওয়ায়ে খায়বার	মুহার্‌রম ৭ হিজরী	১৪০০ সাহাবায়ে কেরাম
২৩.	গাযওয়ায়ে ছুলহে হুদাইবিয়া	৬ হিজরী	১৫০০ সাহাবায়ে কেরাম
২৪.	গাযওয়ায়ে মূতা	জুমাদাল উলা ৮ হিজরী	৩০০০ সাহাবায়ে কেরাম

ফায়েদা: মূতার যুদ্ধকে গাযওয়ার মধ্যে গণনা করা হয় অথচ তাতে রাসূল সা. স্বশরীরে উপস্থিত ছিলেন না। মুহাদ্দিসীনে কেরাম এর কয়েকটি কারণ উল্লেখ করে থাকেন, তন্মধ্যে একটি কারণ হলো এই যে, এই যুদ্ধটি আল্লাহ তায়া'লা রাসূল সা. কে

সরাসরি দেখিয়েছেন এবং মাঝখানের সমস্ত পর্দা উঠিয়ে দিয়েছেন, যেন রাসূল সা. স্বশরীরে উপস্থিতই ছিলেন।

২৫.	গাযওয়ায়ে ফাতহে মক্কা	রমযান ৮ হিজরী	১০,০০০ সাহাবায়ে কেরাম
২৬.	গাযওয়ায়ে হুনাইন	শাউয়াল ৮ হিজরী	১২,০০০ সাহাবায়ে কেরাম
২৭.	গাযওয়ায়ে ত্বায়েফ	শাউয়াল ৮ হিজরী	১২,০০০ সাহাবায়ে কেরাম
২৮.	গাযওয়ায়ে তাবূক	রজব/শাবান ৯ হিজরী	৩০,০০০ সাহাবায়ে কেরাম

সারিয়া

	সারিয়ার নাম	**সন**	**সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা**
১.	সারিয়া হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব	রবি. আউয়াল বা সানী ২ হিজরী	৩০ জন সাহাবায়ে কেরাম
২.	সারিয়া উবাইদা ইবনে হারেস রাযি.	শাউয়াল ২ হিজরী	৬০ বা ৮০ জন সাহাবায়ে কেরাম

৩.	সারিয়া সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি.	যিলক্বদ ২ হিজরী	২০ জন সাহাবায়ে কেরাম
৪.	সারিয়া মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রাযি.	১৪ ররি. আউয়াল ৩ হিজরী	৪ জন সাহাবায়ে কেরাম
৫.	সারিয়া যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি.	জুমাদাল উখরা ৩ হিজরী	১০০ জন সাহাবায়ে কেরাম
৬.	সারিয়া আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাযি.	জুমাদাল উখরা ২ হিজরী	১০০ জন সাহাবায়ে কেরাম
৭.	সারিয়া উমাইর ইবনে আদী রাযি.	২৪ রমযান ২ হিজরী	এ অন্ধ সাহাবী একাই
৮.	সারিয়া সালেম ইবনে উমাইর রাযি.	শাউয়াল ২ হিজরী	তিনি একাই
৯.	সারিয়া আবি মাসলামা রাযি.	মুহাররম ৩ হিজরী	১৫০ জন সাহাবায়ে কেরাম
১০.	সারিয়া আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রাযি.	মুহার্‌রম ৩ হিজরী	তিনি একাই
১১.	সারিয়া আছেম ইবনে ছাবেত রাযি.	সফর ৩ হিজরী	১০ জন সাহাবায়ে কেরাম
১২.	সারিয়া মুনযির ইবনে আমর আস সাঈদী রাযি.	সফর ৪ হিজরী	৭০ জন সাহাবায়ে কেরাম

১৩.	সারিয়া মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা	মুহার্‌রম ৩ হিজরী	৩০ জন সাহাবায়ে কেরাম
১৪.	সারিয়া উকাশা মিহসান	রবি. আউয়াল ৪ হিজরী	৪০ জন সাহাবায়ে কেরাম
১৫.	সারিয়া মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা	রবিউল আউয়াল বা সানী ৪ হিজরী	১০ জন সাহাবায়ে কেরাম
১৬.	সারিয়া আবু উবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ	রবি. সানী ৪ হিজরী	৪০ জন সাহাবায়ে কেরাম
১৭.	সারিয়া যায়েদ ইবনে হারেসা	রবি. সানী ৪ হিজরী	
১৮.	সারিয়া যায়েদ ইবনে হারেসা	জুমাদাল উখরা ৪ হিজরী	১৫ জন সাহাবায়ে কেরাম
১৯.	সারিয়া যায়েদ ইবনে হারেসা	জুমাদাল উখরা ৪ হিজরী	৫০০ জন সাহাবায়ে কেরাম
২০.	সারিয়া আবু বকর সিদ্দীক	জুমাদাল উখরা ৪ হিজরী	১০০ জন সাহাবায়ে কেরাম
২১.	সারিয়া আব্দুর রহমান ইবনে আউফ	রজব ৪ হিজরী	৭০০ জন সাহাবায়ে কেরাম
২২.	সারিয়া যায়েদ ইবনে হারেসা	৪ হিজরী	

২৩.	সারিয়া আলী রাযি.	৪ হিজরী	১০০ জন সাহাবায়ে কেরাম
২৪.	সারিয়া যায়েদ ইবনে হারেসা	রমযান ৪ হিজরী	
২৫.	সারিয়া আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক	রমযান ৪ হিজরী	৫ জন সাহাবায়ে কেরাম
২৬.	সারিয়া আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা	শাউয়াল ৪ হিজরী	৩০ জন সাহাবায়ে কেরাম
২৭.	সারিয়া কুরয্ ইবনে জাবের ফাহরী	৪ হিজরী	২০ জন সাহাবায়ে কেরাম
২৮.	সারিয়া আমর ইবনে উমাইয়া খমরী	৪ হিজরী	
২৯.	সারিয়া আবান ইবনে সাঈদ	মুহার্‌রম ৭ হিজরী	
৩০.	সারিয়া উমর ইবনে খাত্তাব	শাবান ৭ হিজরী	
৩১.	সারিয়া আবু বকর সিদ্দীক	শাবান ৭ হিজরী	
৩২.	সারিয়া বশির ইবনে সা’দ	শাবান ৭ হিজরী	৩০ জন সাহাবায়ে কেরাম
৩৩.	সারিয়া গালেব ইবনে	রযমান ৭ হিজরী	১৩০ জন সাহাবায়ে

	আব্দুল্লাহ লাইছী		কেরাম
৩৪.	সারিয়া বশির ইবনে সা'দ	শাউয়াল ৭ হিজরী	৩০০ জন সাহাবায়ে কেরাম
৩৫.	সারিয়া আখরাম সুলামী	যিলহজ্ব ৭ হিজরী	৫০ জন সাহাবায়ে কেরাম
৩৬.	সারিয়া গালেব ইবনে আব্দুল্লাহ লাইছী	৮ হিজরী	১৫ জন সাহাবায়ে কেরাম
৩৭.	সারিয়া গালেব ইবনে আব্দুল্লাহ লাইছী	সফর ৮ হিজরী	২০০ জন সাহাবায়ে কেরাম
৩৮.	সারিয়া শুজা ইবনে ওয়াহাব	রবি. আউয়াল ৮ হিজরী	২৪ জন সাহাবায়ে কেরাম
৩৯.	সারিয়া কা'ব ইবনে উমাইর	রবিউল আউয়াল ৮ হিজরী	১৫ জন সাহাবায়ে কেরাম
৪০.	সারিয়া কা'ব ইবনে উমাইর	রবিউল আউয়াল ৮ হিজরী	১৫ জন সাহাবায়ে কেরাম

ফায়েদা: এ দুটি ভিন্ন ভিন্ন সারিয়া। দ্বিতীয় সারিয়াটিতে হযরত কা'ব রাযি. ও তাঁর সকল সাথী শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। শুধুমাত্র একজন সাহাবী জীবিত ছিলেন। তিনিই মদীনায় আগমন করে রাসূল সা. কে অবগত করেছিলেন।

৪১.	সারিয়া আমর ইবনুল আস	জুমাদাল উখরা ৮ হিজরী	৩০০ জন সাহাবায়ে কেরাম
৪২.	সারিয়া আমর ইবনে মুররা আল জুহানী	রজব ৮ হিজরী	৩০ জন সাহাবায়ে কেরাম
৪৩.	সারিয়া আবু ক্বাতাদা ইবনে হারেছ সুলামী	৮ হিজরী	
৪৪.	সারিয়া আবু ক্বাতাদা ইবনে হারেছ সুলামী	শাবান ৮ হিজরী	১৬ জন সাহাবায়ে কেরাম
৪৫.	সারিয়া উসামা ইবনে যায়েদ	রমযান ৮ হিজরী	৮ জন সাহাবায়ে কেরাম
৪৬.	সারিয়া সা'দ ইবনে যায়েদ আশহালী	রমযান ৮ হিজরী	
৪৭.	সারিয়া খালেদ ইবনে ওয়ালীদ	রমযান ৮ হিজরী	২০ জন সাহাবায়ে কেরাম
৪৮.	সারিয়া আবু আমের উবাউদ আল আশআরী	রমযান ৮ হিজরী	৩০ জন সাহাবায়ে কেরাম
৪৯.	সারিয়া আমর ইবনে আস	রমযান ৮ হিজরী	৩৫০ জন সাহাবায়ে কেরাম
৫০.	সারিয়া খালেদ ইবনে ওয়ালীদ	রমযান ৮ হিজরী	

৫১.	সারিয়া আবু আমের উবাইদ আল আশআরী	শাউয়াল ৮ হিজরী	
৫২.	সারিয়া তোফায়েল ইবনে উমর ওয়ায়েলী	শাউয়াল ৮ হিজরী	
৫৩.	সারিয়া ক্বায়েছ ইবনে সা'দ	যিলক্বদ ৮ হিজরী	৪০০ জন সাহাবায়ে কেরাম
৫৪.	সারিয়া খালেদ ইবনে ওয়ালীদ	যিলহজ্ব ৮ হিজরী	
৫৫.	সারিয়া উয়াইনা ইবনে হিসন ফায়ারী	মুহার্‌রম ৯ হিজরী	৫০ জন সাহাবায়ে কেরাম
৫৬.	সারিয়া আব্দুল্লাহ ইবনে আউসাজাহ	সফর ৯ হিজরী	
৫৭.	সারিয়া কুতবা ইবনে আমের আনসারী	সফর ৯ হিজরী	২০ জন সাহাবায়ে কেরাম
৫৮.	সারিয়া যাহ্‌হাক ইবনে সুফয়ান ক্বিলাবী	সফর ৯ হিজরী	

জান্নাতী দুলহা এবং জাহান্নামের জ্বালানী

রাসূল সা. এর নবুওয়াতীর সময়কালে উভয়পক্ষের সর্বমোট ১ হাজার ১৮ জন লোক মারা যায়। তন্মধ্যে ২৫৯ দুই শত উনষাট জন সাহাবায়ে কেরাম যারা

শাহাদাতের অমীয় সূধা পান করে হুরদের জান্নাতী দুলহা হয়ে গেলেন। আর ৭৫৯ সাত শত উনষাট জন কাফের যারা হালাক ও অভিশপ্ত হয়ে জাহান্নামের চিরস্থায়ী ইন্ধনে পরিণত হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুদ্ধাস্ত্র

রাসূল সা. এর নিকট বিভিন্ন সময় যে সমস্ত সমরাস্ত্র বিদ্যমান ছিলো তার বর্ণনাঃ

তরবারী :

১. মাছুর ২. আল আযব ৩. যুল ফাক্বার ৪. আল-ক্বাল্‌ঈ ৫. আল বাত্তার ৬. আল হাত্‌ফ ৭. আল মিখযাম ৮. আর-রসূব ৯. আল ক্বাযীব ১০. ছামছামা ১১. আল লাহীফ

লৌহবর্ম : (বুলেট প্রুফ জ্যাকেট)

১. যাতুল ফুযুল ২. যাতুল ভিশাহ ৩. যাতুল হাওয়াশী ৪. আস-সাদিয়া ৫. ফিদ্দাহ ৬. আল-বাতরা ৭. আল-খারীক্ব

কামান :

১. আয-যাউরা ২. আর-রাউহা ৩. আস-সাফরা ৪. শাউহাত ৫. আল-কাতুম ৬. আস-সাদাদ

তুনীরঃ

১. আল-কাফূর ২. আল-জাম্‌উ

ঢাল :

১. আয যালূক ২. আল ফুতাক ৩. আল মূজিয ৪. আয যাক্বান

নেযা :

১. আল মুছভী ২. আল মুছনী ৩. আল বাইদা ৪. আল আনযাহ ৫. আস-সাগা

শিরস্ত্রান: (লৌহ নির্মিত টুপি)

১. যাস সাবূগ ২. আল মুশাহ

রাসূল সা. এর রক্ষীবাহিনী

রাসূল সা. আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও ইতেমাদের সর্বোচ্চ স্তরে সমাসীন হওয়ার পরও পাহারার ব্যবস্থা করতেন, এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সাহাবী এ সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। কিন্তু তাদের থেকে অল্প কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে যাদের এ সৌভাগ্য খুব বেশি পরিমাণে অর্জিত হয়েছে,

১। আবু বকর সিদ্দীক ২। উমর ফারুক ৩। আলী মুরতাজা ৪। যুবায়ের ইবনে আউয়াম ৫। আব্বাস ৬। সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ৭। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ৮। আবু ত্বলহা ৯। বেলাল হাবশী ১০। আবু যর গেফারী ১১। সাআদ ইবনে মুয়ায ১২। হুযাইফা ১৩। আম্মার ১৪। আবু আইয়ুব আনসারী ১৫। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা ১৬। ক্বায়েস ইবনে সা'দ ১৭। আব্বাস ইবনে বশীর ১৮। আনাস ইবনে মারছাদ ১৯। আবু রাইহানা

২০। যাকওয়ান ইবনে আবদে ক্বায়েস ২১। ইছমত ইবনে মালেক খিতমী ২২। আদরা আসলামী ২৩। মিহজান ইবনে আদরা

ইলমী নুকতা

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (سورة الحديد:٢٥)

অনুবাদ: নিশ্চয় আমি আমার রাসূলদেরকে স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও (ন্যায়ের) মানদণ্ড নাযিল করেছি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি আরো নাযিল করেছি লোহা, তাতে প্রচুর শক্তি ও মানুষের জন্য বহু কল্যাণ রয়েছে। আর যাতে আল্লাহ জেনে নিতে পারেন, কে না দেখেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলদেরকে সাহায্য করে। অবশ্যই আল্লাহ মহাশক্তিধর, মহাপরাক্রমশালী।

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ লোহা তো আল্লাহ তায়ালা যমীন থেকে সৃষ্টি করেছেন, আসমান থেকে নয় সুতরাং বাস্তবতার দাবী ছিল আল্লাহ তায়ালার ইহা বলা وَأَنْشَئنَا الْحَدِيدَ বা خلقنا কিন্তু বলেছেন أَنْزَلْنَا ইহার হেকমত বা দর্শন হলো এই যে, কিতাবুল্লাহ বাস্তবায়ন ও স্থায়ীত্বের ক্ষেত্রে লোহার কার্যকারীতা ও ভূমিকা এমন যেন ইহাও কিতাবুল্লাহর মত আসমান থেকে নাযিলকৃত। فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ লোহা সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে যুদ্ধকে আগে উল্লেখ করা এবং মানুষের উপকারীতাকে পরে উল্লেখ করা একথার দলিল যে, লোহা সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হলো بَأْسٌ شَدِيدٌ তথা যুদ্ধ আর দ্বিতীয় পর্যায়ে একে অন্যান্য উপকারের জন্যেও ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু আফসোস! শত আফসোস!! আজ কুফুরী শক্তিতো এর উপর আমল করেই যাচ্ছে কিন্তু মুসলমানরা এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি থেকে সম্পূর্ণ গাফেল ও বে-খবর। উল্লেখিত তাফসীর ঐ সুরতে যখন مَنَافِعُ لِلنَّاسِ দ্বারা লোহার অন্যান্য সরঞ্জামাদি উদ্দেশ্য নেওয়া হবে। যেমন দরজা, আলমারী, পাখা, ট্রেন ইত্যাদি। কিন্তু কাশশাফ গ্রন্থের লেখক বলেন, লোহার মাধ্যমে জিহাদ করা হয় এবং জিহাদের মাধ্যমে ফেতনা নির্মূল হয় ফলে জনগণ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে জীবন যাপন করে مَنَافِعُ لِلنَّاس এর উদ্দেশ্য ইহাও হতে পারে।

وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ আয়াতের এ অংশে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন যে, আমি দেখব কে লৌহ নির্মিত যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে আল্লাহর দ্বীনের সহযোগীতা করে অর্থাৎ জিহাদের ময়দানে গমন করে এবং এই লোহাকে আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। إِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ নি:সন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমতাশীল, মহা পরাক্রমশালী। তিনি নিজেই পারেন দুশমনদের ধ্বংস করতে কিন্তু জিহাদের হুকুম এজন্য দিয়েছেন যেন মুসলমান এর উপর আমল করে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ফায়েদা হাসিল করে।

যুদ্ধাস্ত্র

১. অস্ত্র চালনা শিখাকে কুরআন জরুরী ও ওয়াজীব আখ্যা দিয়েছে।
২. যুদ্ধাস্ত্র রাসূল সা. এর সুন্নত।
৩. যুদ্ধাস্ত্রের সঙ্গে মুহাব্বত স্বয়ং রাসূল সা. এর সঙ্গে মুহাব্বত।
৪. যুদ্ধাস্ত্র রাসূল সা. এর এতই প্রিয় ছিলো যে, তিনি স্বীয় যুদ্ধাস্ত্রে হাতলে রুপা লাগিয়ে রেখে ছিলেন।
৫. যুদ্ধাস্ত্রের গুরুত্ব রাসূল সা. এর কাছে এত বেশি ছিল যে, তিনি নিজের কাছে উল্লেখযোগ্য পরিমানে অস্ত্র রেখেছেন।
৬. যুদ্ধাস্ত্র নবী-চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
৭. অস্ত্র মসজিদে আনার আদব রাসূল সা. নিজে শিখিয়েছেন।
৮. রাসূল সা. পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অস্ত্র ছাড়া কিছুই রেখে যাননি।
৯. রাসূল সা. অস্ত্র হিসেবে সর্বপ্রথম মিনজানীক বানিয়েছেন।
১০. অস্ত্র ব্যবহার সম্পর্কেই রাসূল সা. বলেছেন হে সা'দ তীর নিক্ষেপ করো, আমার আব্বা-আম্মা তোমার উপর কোরবান হোক।
১১. যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে লৌহবর্ম ও শিরস্ত্রান বানানো দাউদ (আ.) এর সুন্নত।
১২. সাহাবায়ে কেরাম অস্ত্রকে কখনো দেহ থেকে পৃথক করতেন না।
১৩. সাহাবায়ে কেরাম অস্ত্রের তরবিয়ত দিতেন মসজিদে নববীতে।
১৪. যুদ্ধাস্ত্রের দান-অনুদান হয়েছিল মসজিদে নববীতে।
১৫. অস্ত্রের জোরে জাযিরাতুল আরবকে কুফরী এবং শিরকী থেকে পবিত্র করা হয়েছিল।

১৬. অস্ত্রকে যে ব্যক্তি দেহে বাঁধে সে আল্লাহ তায়ালার হাতে বাইয়াত করে নেয়।
১৭. অস্ত্রের বিনিময়ে অর্জিত সম্পদ গণীমত, পবিত্র এবং হালাল।
১৮. অস্ত্র ইসলামের মহত্ব ও দাপট।
১৯. অস্ত্র ইসলামের শক্তি ও ক্ষমতা।
২০. অস্ত্র ইসলামের ইজ্জত ও সম্মান।
২১. অস্ত্রের মাধ্যমে কাফেরদের মাঝে আতংক ছড়িয়ে পড়ে।
২২. অস্ত্রের মাধ্যমে জুলুম এবং ফেতনা ফাসাদ নির্মুল হয়।
২৩. অস্ত্র থেকে অমনোযোগীতা কাফেরদের আন্তরিক চাহিদা।
২৪. অস্ত্র থেকে বিমুখতা কুরআন, সুন্নাহ এবং আমলে সাহাবা থেকে বিমুখতা।
২৫. অস্ত্রের প্রতি মুহাব্বত ও ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ।

সারকথা:

এই যে, অস্ত্রের প্রতি মুহাব্বত মূলত: কুরআনের প্রতি মুহাব্বত, নবীর প্রতি মুহাব্বত, এবং সাহাবায়ে কেরামের প্রতি মুহাব্বতের বাস্তব প্রমাণ, আর অস্ত্রের দ্বারাই সম্ভব কিতাবুল্লাহর আইন-কানুনের হেফাযত এবং ইসলামের বাস্তবায়ন।

ঘোড়া

রাসূল সা. এর বাণী

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

- الصحيح للبخاري: 399/1 بَاب الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. رقم الحديث: 2852 ، - صحيح إبن خزيمة: 10/4 باب ذكر بعض ألوان مانع الزكاة . رقم الحديث: 2252 ، - صحيح إبن حبان: 524/10 باب الخيل ذكر إثبات الخير في ارتباط الخيل في سبيل الله جل وعلا. رقم الحديث: 4668

ঘোড়ার কপালে কল্যাণ রেখে দেওয়া হয়েছে কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য। আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় যুদ্ধকারী মুজাহিদদের ফযীলত তো অগণিত এবং স্বস্থানে স্বীকৃত। কিন্তু আসুন ঐ বাহনটিকেও দেখে নিই যার সম্পর্ক মুজাহিদের সাথে- শরীয়তে কী তার মাক্বাম ও মর্যাদা।

১. জিহাদের জন্য ঘোড়া পালনের নির্দেশ কুরআন দিয়েছে।
২. ঘোড়া রাখা রাসূল সা. এর সুন্নত।
৩. ঘোড়ার খাদ্য-পানি এমনকি পায়খানা-পেশাবকে কিয়ামতের দিন মুজাহিদের আমল নামায় নেক আমলের সাথে মাপা হবে।
৪. ঘোড়ার পায়ের কসম খেয়েছে কুরআন।
৫. ঘোড়ার কপালে কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য কল্যাণ রেখে দেওয়া হয়েছে।
৬. ঘোড়া উত্তম বস্তু হওয়ার নিদশন রাসূল সা. বর্ণনা করেছেন।
৭. ঘোড়া জিহাদের জন্য যে ঘরে থাকে সে ঘর জিনদের আশ্রয় থেকে নিরাপদ থাকে।
৮. ঘোড়ার জন্য খরচ করাকে সদকার সমতুল্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে।
৯. রাসূল সা. বনু কুরাইযার গনীমতের মাল দিয়ে ঘোড়া খরিদ করেছেন।
১০. রাসূল সা. বনু নাযীর এর গনীমতের মাল দিয়ে ঘোড়া খরিদ করেছেন।
১১. রাসূল সা. ঘোড়াকে স্ত্রীদের পরে সবচেয়ে পছন্দনীয় বস্তু আখ্যা দিয়েছেন।
১২. বদর যুদ্ধে রাসূল সা. এর নিকট দুটি ঘোড়া ছিল।
১৩. বনু কুরাইযা যুদ্ধে রাসূল সা. এর নিকট ছয়টি ঘোড়া ছিলো।
১৪. বনু মুসতালিক যুদ্ধে রাসূল সা. এর নিকট ত্রিশটি (৩০) ঘোড়া ছিলো।
১৫. খায়বার যুদ্ধে রাসূল সা. এর নিকট দুইশত ঘোড়া ছিলো।
১৬. তাবুক যুদ্ধে রাসূল সা. এর নিকট দশ হাজার ঘোড়া ছিলো।
১৭. ঘোড়ায় আরোহী মুজাহিদ পদাতিক মুজাহিদের দ্বিগুণ গণীমত লাভ করে।
১৮. অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সত্ত্বেও আজো বিশ্বে সকল যুদ্ধে ঘোড়ার গুরুত্ব অনুধাবন করা হয়।

জিহাদ

১. আল্লাহ তায়ালা জিহাদ সম্পর্কে কুরআন শরীফে চারশরও বেশি আয়াত নাযিল করেছেন।
২. জিহাদ শিরোনামে ইমাম বুখারী রহ. দুইশত একচল্লিশটি পরিচ্ছেদ লিপিবদ্ধ করেছেন।
৩. জিহাদ শিরোনামে ইমাম মুসলিম রহ. একশত পরিচ্ছেদ লিপিবদ্ধ করেছেন।
৪. জিহাদ শিরোনামে ইমাম আবু দাঊদ রহ. একশত ছিয়াত্তরটি পরিচ্ছেদ লিপিবদ্ধ করেছেন।
৫. জিহাদ শিরোনামে ইমাম তিরমিযী রহ. একশত পনেরটি পরিচ্ছেদ লিপিবদ্ধ করেছেন।
৬. জিহাদ শিরোনামে ইমাম ইমাম নাসায়ী রহ. আটচল্লিশটি পরিচ্ছেদ লিপিবদ্ধ করেছেন।
৭. জিহাদ শিরোনামে ইমাম ইবনে মাজা রহ. ছিচল্লিশটি পরিচ্ছেদ লিপিবদ্ধ করেছেন।
৮. জিহাদ শিরোনামে ফেক্বাহ্‌র প্রতিটি কিতাব জিহাদের মাসআলা দ্বারা সুসজ্জিত।
৯. জিহাদ ইবাদত এবং জরুরত উভয়টাই।
১০. জিহাদ পর্যটনও আবার বৈরাগ্যতাও।
১১. জিহাদ মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যম আবার ফরযও।
১২. জিহাদ ঈমানের নিদর্শন।
১৩. জিহাদের দ্বারা ঈমানের পরিপূর্ণতা অর্জিত হয়।
১৪. জিহাদের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হয়।
১৫. জিহাদের দ্বারা আল্লাহর রহমত হাছিল হয়।
১৬. জিহাদের দ্বারা গুণাহ মাফ হয় এবং আখেরাতে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।
১৭. জিহাদের মাধ্যমে মিনিটে মিনিটে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয় যা জিহাদ ব্যতীত কয়েক বৎসরের রিয়াযত-মুজাহাদার দ্বারা অর্জন হয় না।
১৮. জিহাদের জন্য হযরত সুলাইমান আ. একশত স্ত্রী বানিয়েছিলেন।
১৯. জিহাদের দ্বারা এ উম্মতের ফেরআউন আবু জেহেল ও রাসূল সা. এর পর সর্ব প্রথম ফেতনা যাকাতের অস্বীকৃতি ও ইরতিদাদ তথা ধর্ম ত্যাগ নির্মূল হয়েছে।
২০. জিহাদের দ্বারাই এ উম্মতের সর্বশেষ ও সর্ববৃহৎ ফেৎনা দাজ্জাল ধ্বংস হবে।

২১.জিহাদের মাধ্যমে উলামায়ে কেরাম সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দানের দায়িত্ব আদায় করে আম্বিয়া কেরামের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন।
২২.জিহাদের দ্বারা উলামায়ে কেরাম বিচার ব্যবস্থার বিভিন্ন পদবী অলংকৃত করেন।
২৩.জিহাদের দ্বারা দ্বীন প্রচার এবং উলূমে শরীয়ত প্রসারের রাস্তা মসৃণ হয়ে থাকে।
২৪.জিহাদের দ্বারা উলামায়ে কেরামের আযমত এবং আমীর-উমারাদের অনুসরণ হয়ে থাকে।
২৫.জিহাদের দ্বারা উত্তম ও শরীয়ত সমর্থিত বিষয়াদির প্রচলন ও উন্নতি সাধিত হয়। আর মন্দ এবং শরীয়তে নিষিদ্ধ কার্যকলাপ মিটে যায়।
২৬.জিহাদের দ্বারা শরীয়তের বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়।
২৭.জিহাদের দ্বারা ঈমান, জান, মাল এবং ইজ্জতের হেফাজত হয়।
২৮.জিহাদের দ্বারা কাফেরদের মুসলমানদের কাছে এসে ইসলাম ধর্মকে দেখা ও বুঝার সুযোগ মিলে।
২৯.জিহাদের দ্বারা কাফেরদের ইসলাম গ্রহনের তাওফীক্ব হয় আর হঠকারী কাফেরদের ধ্বংস নিশ্চিত হয়।
৩০.জিহাদের দ্বারা ইবাদতখানার সংরক্ষণ হয় যদিও কাফেরদেরই হোক না কেন।
৩১.জিহাদের দ্বারা পাপাচারী ও ফাসেকরা বেদআত, অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে ফিরে আসে।
৩২.জিহাদের দ্বারা মানব প্রকৃতিতে থাকা হত্যা ও অরাজকতার যোগ্যতা সঠিক স্থানে ব্যায় হয়।
৩৩.জিহাদের দ্বারা ধন সম্পদের প্রাচুর্য লাভ হয় এবং পরমুখাপেক্ষীতা দূর হয়।
৩৪.জিহাদের দ্বারা গোলাম-বাদীর নেয়ামত হাসিল হয়।
৩৫.জিহাদের কারণে ফেরেস্তারা আসমান থেকে সহযোগিতা নাযিল করে।
৩৬.জিহাদ মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া কাফেরদের জন্য শাস্তি এবং অপদস্ততা।
৩৭.জিহাদ মুসলমানদের হৃদয়ের আরোগ্যতা এবং অন্তরের আক্রোশ ও ক্রোধ দমনের মাধ্যম।
৩৮.জিহাদ আল্লাহর নুসরাত লাভের সবচেয়ে বড় মাধ্যম।

৩৯. জিহাদের দ্বারা গোটা সৃষ্টিজীব মুসলমানদের অনুগত হয়ে যায়।
৪০. জিহাদে হাত ব্যবহার হয় মুসলমানদের কিন্তু শক্তি ব্যবহার হয় স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার।
৪১. জিহাদ আমাদের হেফাযত কারী, আমাদের প্রতিরক্ষাকারী এবং আমাদের দূর্গ।
৪২. জিহাদের কারণে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রও নস্মাৎ হয়ে যায়।
৪৩. জিহাদের দ্বারা জিম্মী কাফেরদেরও জান-মাল ও ইজ্জত সংরক্ষিত থাকে।
৪৪. জিহাদের দ্বারা কাপুরুষতা থেকে বেচে থাকা যায়, যা পুরুষের ক্ষেত্রে অনেক বড় ত্রুটি।
৪৫. জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা ওয়াজিব।
৪৬. জিহাদের প্রশিক্ষণ কাফেরদের থেকে গ্রহণ করাও বৈধ।
৪৭. জিহাদকারী মুসলিম মুজাহিদ যদি যুদ্ধ করতে থাকে তাহলে গাজী আর যদি নিহত হয়ে যায় তাহলে শহীদ।
৪৮. জিহাদে সংখ্যাগত ফায়েদার জন্য শরীয়ত চার বিয়ে করাকে জায়েয করেছে।
৪৯. জিহাদ ছেড়ে দিলে অর্থনৈতিক দূরাবস্থা, ভয়-ভীতি, অনিরাপত্তা, হতাশা এবং নৈরাশ্যতার সৃষ্টি হয়।
৫০. জিহাদ ছেড়ে দিলে মুসলমানদের উপর ব্যাপক আযাব পতিত হয়।
৫১. জিহাদ ছেড়ে দিলে দাসত্বের জীবন এবং কাপুরুষতা সুনিশ্চিত হয়ে যায়।
৫২. জিহাদ ছেড়ে দিলে দ্বীনি আহকাম প্রতিষ্ঠার বরকত থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়।
৫৩. জিহাদ ছেড়ে দিলে জান-মাল এবং ইজ্জত দুশমনের অনুগ্রহ নির্ভর হয়ে পড়ে।
৫৪. জিহাদ ছেড়ে দিলে যমীনে ফেতনা-ফাসাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।
৫৫. যৌক্তিক কারণ ব্যতীত জিহাদ ছেড়ে দিলে ঐ ব্যক্তি ফাসেক হয়ে যায়।
৫৬. জিহাদের মধ্যে অপব্যাখ্যাকারী মুরতাদ ফিল আক্বীদাহ তথা খারাপ আক্বীদা পোষণকারী হয়ে থাকে।
৫৭. জিহাদের মধ্যে তাহরীফকারী তথা অপব্যাখ্যাকারী সঠিক অর্থে বিকৃত সাধনকারী এবং জিহাদকে অস্বীকারকারী কাফের।
৫৮. জিহাদ ছেড়ে দিলে অন্তর থেকে কুফুরী এবং পাপাচারের প্রতি ঘৃণা দূর হয়ে যায়।
৫৯. জিহাদ ছেড়ে দিলে মানুষ মৃত্যুর পূর্বেই বিভিন্ন মুসীবতের সম্মুখিন হয়।

৬০. জিহাদ ছেড়ে দিয়ে মৃত্যুবরণ করাটা মুনাফেকীর উপর মৃত্যুবরণ করার নামান্তর।

মুজাহিদ

১. মুজাহিদ আল্লাহর যমীনে আল্লাহর প্রতিনিধি।
২. মুজাহিদ যখন যুদ্ধের ময়দানে সদম্ভে চলাফেরা করে তখন আল্লাহ তায়ালা এতে অহংকার করেন ।
৩. যুদ্ধের ময়দানে মুজাহিদের এক মিনিট অবস্থান একজন আবেদের সত্তর বৎসর রিয়াবিহীন ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।
৪. মুজাহিদের রাতের বেলা পাহারা দেওয়া হজরে আসওয়াদের পাশে দাঁড়িয়ে লাইলাতুল ক্বদরের ইবাদতের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।
৫. মুজাহিদের একদিন এবং একরাত মুজাহিদ নয় এমন ব্যক্তির মাসব্যাপী রোজা রাখা এবং রাতের আঁধারে নামায আদায়ের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।
৬. মুজাহিদের পায়ের ধুলি এবং জাহান্নামের আগুনের ধোয়া কখনো একত্রিত হবে না।
৭. মুজাহিদের দিন অতিবাহিত হয় ঘোড়ার পিঠে আর রাত কাটে নামাযের মুসল্লায় দাড়িয়ে।
৮. মুজাহিদের ইবাদাতের উপর স্বয়ং ফেরেস্তারাও ঈর্ষা করে।
৯. মুজাহিদ সীমানাগুলো সংরক্ষণ করে গোটা উম্মতের আজর ও সওয়াব অর্জন করে।
১০. মুজাহিদের জন্য গর্তের কীট-পতঙ্গ, সমুদ্রের মৎসরাজী এবং শুণ্যে উড়ন্ত পাখ-পাখালীও দোয়া করে।
১১. মুজাহিদদের পক্ষে মাজলুমদের দোয়া থাকে।
১২. মুজাহিদের জন্য রাতের আঁধারে উম্মতের মা, কন্যা এবং বোনেরা অশ্রু প্রবাহিত করে।
১৩. মুজাহিদের হিম্মত, সংকল্প এবং দৃষ্টিশক্তির উচ্চতায় আসমানও ঈর্ষা করে।
১৪. মুজাহিদের দৃঢ় মনোবল এবং স্থিরতার সামনে পর্বতও গর্দান ঝুকিয়ে দেয় ।
১৫. মুজাহিদের অনুনয় বিনয়ের সামনে যমীনও লজ্জিত হয়ে যায়।
১৬. মুজাহিদ বিভিন্ন মুসীবতের স্বীকার হয়েও মুচকি হাসে।
১৭. মুজাহিদ সর্বপ্রকার জটিলতার সমাধান সহাস্য বদনে করে থাকে ।

১৮. মুজাহিদকে বীরত্ব এবং বাহাদুরীও সালাম করে।
১৯. মুজাহিদ ধৈর্যশীল হয়ে থাকে।
২০. মুজাহিদ পরিশ্রমী হয়ে থাকে।
২১. মুজাহিদ হয়ে থাকে অল্পতুষ্টি, বৈরাগ্য এবং অনাড়ম্বরতার অনুপম দৃষ্টান্ত।
২২. মুজাহিদ স্বীয় কাজের মাধ্যমে তাওহীদের দাওয়াত দেয় ।
২৩. মুজাহিদ নীরব দাঈ হয়ে থাকেন।
২৪. মুজাহিদের জীবনাচার দ্বীনের নমুনা হয়ে থাকে।
২৫. মুজাহিদের জান-মালের মূল্য জান্নাত।
২৬. মুজাহিদের অলংকার হল তার অস্ত্র।
২৭. মুজাহিদের মূল যুদ্ধাস্ত্র হলো আল্লাহর উপর পূর্ণ ইয়াক্বীন।
২৮. মুজাহিদ অস্ত্র সজ্জিত হয়েও স্বীয় আমীরের অনুসরণ করে।
২৯. মুজাহিদ শক্তিশালী হয়েও দূর্বলদের উপর হাত তুলে না।
৩০. মুজাহিদের নারায়ে তাকবীর কাফেরদের উপর এটম বোম হয়ে পতিত হয়।
৩১. মুজাহিদ মুসলমানের ঈমান, ইজ্জত এবং জান-মালের সংরক্ষক।
৩২. মুজাহিদ জেগে থাকে আর তাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে গোটা উম্মত নিশ্চিন্তে ঘুমায়।
৩৩. মুজাহিদ নিজের রক্ত ঢেলে দিয়ে উম্মতের রক্ত সংরক্ষণ করে।
৩৪. মুজাহিদ দ্বীন প্রচারের দুয়ার খুলে থাকেন।
৩৫. মুজাহিদের সহযোগীতার জন্য আসমান থেকে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়।
৩৬. মুজাহিদের স্ত্রীদের সম্মান মুসলমানদের কাছে মায়ের মত।
৩৭. মুজাহিদের আওয়াজে হিংস্র প্রাণীরাও জঙ্গল খালি করে দেয়।
৩৮. মুজাহিদের জন্য সৃষ্টিজীবের প্রতিটি জিনিস অনুগত হয়ে যায়।
৩৯. মুজাহিদ আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দা হয়ে থাকেন।
৪০. মুজাহিদ আল্লাহ তায়ালার সত্যিকার প্রেমিক হয়ে থাকে।
৪১. মুজাহিদ আল্লাহ তায়ালার প্রকৃত আনুগত্যশীল হয়ে থাকে।
৪২. মুজাহিদের জান-মালের ক্রেতা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা।
৪৩. মুজাহিদের জান-মালের মূল্য জান্নাত।
৪৪. মুজাহিদকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য হুরেরা জান্নাত থেকে যমীনে অবতরণ করে।
৪৫. মুজাহিদের রক্তের প্রথম ফোটায় সমস্ত গুণাহ মাফ হয়ে যায়।

৪৬. মুজাহিদ স্বীয় আত্মা শরীর থেকে পৃথক হওয়ার পূর্বেই জান্নাতে নিজের বাসস্থান দেখে ফেলে।
৪৭. মুজাহিদের কেয়ামত দিবসে আল্লাহ তায়ালার আরশের ছায়া নসীব হবে।
৪৮. মুজাহিদের জাগ্রত থাকা, ঘুমানো, খাওয়া, পান করা, উঠা-বসা চলা-ফেরা, জীবিত থাকা এবং মৃত্যুবরণ করা সব ইবাদতই ইবাদত। বরং আবেদের জন্যও ঈর্ষার বিষয়।

জিহাদের আদব

১. যখন জিহাদের জন্য বাড়ি থেকে বের হবে আল্লাহর নাম নিয়ে বের হবে।
২. অহংকার ও দাম্ভিকতার সাথে বের হয়োনা।
৩. পরস্পরে একে অন্যের সাথে ঝগড়া করো না।
৪. আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুসরণকে মূল বানাও।
৫. নিজের মুজাহিদ সাথী ভাইদের বেশি বেশি খেদমত করো।
৬. শরীয়তের দণ্ড-বিধির প্রতি লক্ষ্য রাখ।
৭. প্রচণ্ড যুদ্ধ চলাকালেও আল্লাহর যিকির খুব বেশি পরিমানে করতে থাক।
৮. নিজের এবং ক্ষমতার পরিবর্তে আল্লাহ তায়ালার সত্তার উপর ভরসা রাখ।
৯. প্রতিকূল পরিস্থিতিতে চাহিদার বিপরীত হলেও আমীরের নির্দেশ মেনে চলো।
১০. মুকাবেলার সময় দৃঢ়পদ থাকো।
১১. যখন আরোহন করতে থাকবে তখন আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ করতে থাকো এবং এই দোয়া পড়ো-

سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ – وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ (13–14)

১২. যখন উচু জায়গায় চড়বে তখন আল্লাহর আযমতের প্রতি খেয়াল করে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার পড়ো।
১৩. যখন নিচু ভূমির দিকে অবতরণ করবে তখন নিজের অসহায়ত্ব ও নিচুতা এবং আল্লাহর পবিত্রতার প্রতি খেয়াল করে সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ বলো।
১৪. বিজয়ের উপর গর্ব করোনা বরং আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করে দাও।

১৫. বিজয় এবং গণীমতের যে মাল অর্জিত হয় তার উপর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো। আর যে সমস্ত মুসীবত এবং যাতনার শিকার হও তার উপর ধৈর্য ধারণ করো।
১৬. কুকুর এবং ঘণ্টা সঙ্গে রেখ না। এতে কাফেলার সাথে ফেরেশতা থাকে না।
১৭. প্রত্যেক যুদ্ধকে জীবনের সর্বশেষ যুদ্ধ মনে করে লড়াই করো।
১৮. শাহাদাতের তামান্না রেখে এর তালাশে শুধু সামনেই এগিয়ে চলো।
১৯. যুদ্ধ যত তীব্রই হোক না কেন কোন ক্রমেই যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যেয়োনা।
২০. জিহাদের সফর থেকে ফিরে আসার সময় তাওহীদের এ বাক্যগুলো মুখে পড়ে নেওয়া সুন্নত যা হাদীস দ্বারা প্রমানিত।

عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من حج أو عمرة أو غزو فأوفى على فدفد من الأرض قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير (آيبون تائبون لربنا حامدون) صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.

- السنن الكبرى للنسائي:10374 ما يقول إذا أوفى على فدفد من الأرض صحيح إبن حبان:412/6 رقم الحديث:2695

সংশয়-১

জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বরং আক্রমনাত্মক জিহাদ সম্পর্কে একটি আপত্তি এই করা হয়ে থাকে, শরীয়ত আমাদেরকে জিহাদের অনুমতি তো দিয়েছে কিন্তু এ শর্তে যে, কাফেররা প্রথমে আক্রমণ করবে। অন্যথায় আমাদের অগ্রে বেড়ে প্রথমেই হামলা করার অনুমতি নেই। আর এর স্বপক্ষে কুরআনের নিম্নবর্ণিত আয়াত সমূহ এবং এ ধরণের অন্যান্য আয়াতকে দলিলরূপে পেশ করা হয়।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ (سورة البقرة-190)

অনুবাদ: আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় ঐ সকল লোকদের সাথে লড়াই কর যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে।

فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (سورة البقرة-194)

অনুবাদ: যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে বাড়াবাড়ি করবে তোমরাও তার বদলা নিয়ে নিতে পার তার বাড়াবাড়ির সমপরিমাণ।

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ(سورة الرعد:٤٠)

অনুবাদ: হে নবী সা. আপনার দায়িত্ব হলো বাণী পৌছে দেওয়া আর তার হিসাব গ্রহণ আমার দায়িত্বে।

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ (سورة النمل-126)

অনুবাদ: আর যদি তোমরা চাও শাস্তি দিতে তাহলে এতটুকুই দাও যে পরিমাণ তোমাদের কষ্ট দেওয়া হয়েছে।

সমাধান-

উত্তর বুঝার পূর্বে একটি কথা জেহেনে বদ্ধমূল রাখা চাই যে, কুরআনের কতক আয়াত এবং আহকাম রহিত হয়ে গেছে। যথা শুরুতে রোযা ছিল রাত ও দিনের সমষ্টির নাম। কিন্তু এখন রোযা হয় শুধু দিনের বেলা। শুরুতে জিহাদের ময়দানে প্রতিজনের দশজন কাফেরের মোকাবেলা করা বাধ্যতামূলক ছিলো। কিন্তু বর্তমানে প্রতিজনের দুইজন কাফেরের মোকাবেলা করা জরুরী ইত্যাদি। এবং কুরআন শরীফেও এ বিষয়টির সুস্পষ্ট বর্ণনা বিদ্যমান আছে।

مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ

مِثْلِهَا ..... (سورة البقرة-106)

অনুবাদ: আমি যদি কোন আয়াতকে রহিত করি অথবা বিস্মৃত করি তবে ততপেক্ষা উত্তম অথবা তদরুপ আয়াত নিয়ে আসি।

আর এই রহিত করণ চার প্রকার। যার মধ্যে এক প্রকার হলো এই যে, আয়াতের তেলাওয়াত বাকী থাকবে কিন্তু হুকুম রহিত হয়ে যাবে। যাকে منسوخ الحكم دون التلاوة বলা হয়। এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর মূল উত্তর লক্ষ্য করুন।

সুপ্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস এবং ফক্বীহ মোল্লা আহমদ জিউন মিরাঠী রহ. নিজের বিশ্ব সমাদৃত গ্রন্থ تفسير أحمدية في بيان الآيات الشرعية এর মধ্যে লিখেন। এখন আমি আপনাকে ঐ সমস্ত আয়াত সম্পর্কে অবগত করব যেগুলো منسوخ الحكم دون التلاوة আর আমি সেগুলো বিভিন্ন কিতাব ঘাটাঘাটি করে অর্জন করেছি। ঐ সকল আয়াত যেগুলো শত্রুপক্ষকে ক্ষমা করে দেওয়ার কথা উল্লেখ আছে, যেমন: ما على الرسول إلا البلاغ এবং لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ (سورة الكافرون: ٦) অথবা যেগুলোতে আগে বেড়ে প্রথমে হামলা করতে নিষেধ করা হয়েছে যেমন وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ (سورة البقرة:١٩٠) যেসব আয়াতে যুদ্ধের হুকুম দেয়া হয়েছে, তা দ্বারা এ সকল আয়াত রহিত হয়ে গেছে। যেমন:

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً (سورة التوبة-36)

এবং

فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (سورة التوبة-5)

ইমাম যাহেদ রহ. বলেন যে, প্রায় সত্তরটি আয়াত এমন যেগুলো জিহাদের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

সাহেবে ইতকান লিখেন: فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ **এ আয়াতের দ্বারা একশত বিশটি আয়াত** রহিত হয়ে গেছে। (তাফসীরাতে আহমাদীয়া।)

এজন্য এ ধরনের সকল আয়াতের হুকুম যেহেতু রহিত হয়ে গেছে তাই এগুলোকে দলিল বানিয়ে আক্রমনাত্মক জিহাদের অস্বীকার করাটা শরীয়তের একটি বিধানকে অস্বীকার করা যা কোন ভাবেই জায়েয নেই।

জিহাদের প্রকারভেদ

জিহাদ দুই প্রকার। এক প্রকার হলো আত্মরক্ষামূলক যাকে (দিফায়ী) জিহাদ বলে, অর্থাৎ কাফেরদের কোন সম্প্রদায় প্রথমে মুসলমানদের উপর হামলা করবে তখন মুসলমানরা তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য তাদের মোকাবেলা করবে। জিহাদের এই প্রকারকে আল্লাহ তা'য়ালা এভাবে বর্ণনা করেছেন

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (سورة البقرة-190)

অনুবাদ: আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ

لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ (سورة الحج-39-40)

অনুবাদ: যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে, যাদেরকে আক্রমণ করা হচ্ছে। কারণ তাদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম। যাদেরকে তাদের নিজ বাড়ী-ঘর থেকে অন্যায়ভাবে শুধু এ কারণে বের করে দেয়া হয়েছে যে, তারা বলে, 'আমাদের রব আল্লাহ্'।

জিহাদের দ্বিতীয় প্রকারটি হলো "আক্রমনাত্মক জিহাদ" অর্থাৎ যখন কুফুরীর শক্তিমত্তা ও দাপটে ইসলামের স্বাধীনতার আশংকা দেখা দিবে তখন ইসলাম তার অনুসারীদের এই নির্দেশ দেয় যে, তোমরা ইসলামের দুশমনদের উপর অগ্রে বেড়ে হামলা কর। কেননা যখন দুশমনদের পক্ষ থেকে কোন প্রকার আশংকা দেখা দেয় তখন সতর্কতার দাবী এটাই যে, তোমরা তাদের উপর আক্রমনাত্মক হামলা করবে। যেন ইসলাম এবং মুসলমান কুফুর এবং শিরক এর ফেতনা থেকে সংরক্ষিত থাকে এবং কোন প্রকার ভয় ও শংকা ছাড়াই নিরাপদ ভাবে আল্লাহ তা'য়ালার বিধি-বিধানকে পালন করতে পারে। এবং কোন শক্তি ও ক্ষমতা যেন তাদেরকে সত্য দ্বীন থেকে সরিয়ে দিতে না পারে। আর কোন পরাশক্তি যেন আল্লাহর কানুনের প্রচলন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাঁধা না হয়ে দাঁড়ায়।

এমন স্থানে আকল ও দূর দর্শিতা, ব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দাবী এটাই যে, আশংকা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই তার মূলোৎপাটন করে দেওয়া হবে। এ অপেক্ষায় থাকা যে, যখন বিপদ মাথার উপর পতিত হয়ে যাবে তখনই প্রতিহত করবো এটা চূড়ান্ত পর্যায়ের বোকামী এবং মহা আহমকী। যেমনি ভাবে বাঘ ও সিংহকে হামলা করার পূর্বেই হত্যা করে দেওয়া এবং সাপ ও বিচ্ছুকে দংশন করার পূর্বেই মাথা থেতলে দেওয়া জুলুম নয় বরং সর্বোচ্চ চিন্তাশীলতা ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক। তদ্রুপ কুফুর ও শিরক মাথা চাড়া দিয়ে উঠার পূর্বেই মূলোৎপাটন করে দেওয়া সর্বোচ্চ বুদ্ধিমত্তার কাজ।

চোর, ডাকাত এবং হিংস্রপ্রাণী যদি কোন জঙ্গল বা মরুভূমিতে জড়ো হয় তাহলে আকল ও বুদ্ধিমত্তার দাবী এই যে, এরা শহর অভিমূখে যাত্রার পূর্বেই এদেরকে নি:শেষ করে দেওয়া হবে। কারণ হিংস্র প্রাণীকে আগে বেড়ে হত্যা করে ফেলাটাই বুদ্ধিমত্তা। আর

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (سورة التوبة-5)

এবং তোমরা হত্যা করো মুশরিকদের যেখানেই তাদের পাও। এবং

أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً (سورة الأحزاب-61)

আর এদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে, গ্রেফতার করা হবে এবং হত্যা করে ফেলা হবে। ইত্যাদি আয়াতের মধ্যে ঐ ধরণের কাফেরই উদ্দেশ্য।

হিংস্র প্রাণী হত্যার ক্ষেত্রে প্রতিহতের চিন্তা করা এবং এটা ভাবা যে, “যখন এ সকল হিংস্রপ্রাণী সম্মিলিত ভাবে আমাদের উপর আক্রমণ করে বসবে তখন আমরা প্রতিহত করবো” এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা জ্ঞাণীদের নিকট পরিস্কার নির্বুদ্ধিতা। আল্লাহর বাণী

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ ِللهِ (سورة أنفال-39)

এর মধ্যে এ ধরনের জিহাদই উদ্দেশ্য।

অর্থাৎ হে মুসলমান! তোমরা কাফেরদের সাথে এ পর্যন্ত জিহাদ করো যে, কুফুরীর ফেৎনা বাকী না থাকে এবং আল্লাহর দ্বীনের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়ে যায়। এই আয়াতে ফেতনা দ্বারা কুফুরীর শক্তিমত্তা ও দাপটের ফেতনা উদ্দেশ্য । আর وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ ِللهِ।এর দ্বারা দ্বীনের বিজয় ও প্রভাব বিস্তার উদ্দেশ্য। এরই বর্ণনা এসেছে অন্য এক আয়াতে

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ (سورة الصف-9)

অর্থাৎ দ্বীনের যেন এতটুকু বিজয় সুনিশ্চিত হয় যে, কুফুরীর দাপটের কারণে তা পরাস্ত হওয়ার আশংকা না থাকে এবং দ্বীনে ইসলামকে যেন কুফুরীর ফেতনা ও সর্বপ্রকার আশংকা থেকে ইতমিনান হাসিল হয়ে যায়।

সংশয় -২

কুরআন শরীফ রাসূল সা. এর মক্কি জীবনের বর্ণনা এবং রাসূল সা. এর দাওয়াত ও তাবলীগ এবং একারণে মক্কার কাফের মুশরিক কর্তৃক প্রদত্ত কষ্ট-ক্লেশ ও দু:খ-যাতনা এবং এর উপর রাসূল সা. এর সবর ও ধৈর্য্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার হয় তা এই

فَلا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَاداً كَبِيراً (سورة الفرقان-52)

উক্ত আয়াতে রাসূল সা. এর দাওয়াত ও তাবলীগকে শুধু জিহাদই নয় বরং বড় জিহাদ আখ্যা দিয়েছেন অথচ এতে যুদ্ধ-বিগ্রহের কোন বিষয় নেই। বরং এটাতো ঐ সময়ের কথা যখন আল্লাহর বাণী

كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ (سورة النساء-77)

(নিজেদের হাতগুলোকে বিরত রাখো) এই সুস্পষ্ট ঘোষণার মাধ্যমে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। সুতরাং জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ যদি ক্বিতাল ফী সাবীলিল্লাহ এরই নাম হয়ে থাকে তাহলে কুরআন শরীফ দাওয়াত ও তাবলীগকে কেন জিহাদ শব্দে ব্যক্ত করেছে।

সমাধান-১

উক্ত আয়াতে جَاهِدْ এর অর্থ হলো কাফেরদের কাছে তাবলীগ করার ক্ষেত্রে খুব চেষ্টা করো, অক্লান্ত পরিশ্রম করো মেহনত করো। আর এই মেহনত ও পরিশ্রমের সাথে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়াটাকেই জিহাদ শব্দে ব্যক্ত করেছেন। কেননা আরবী ভাষায় প্রত্যেক ঐ কাজ যাতে কষ্ট ও মেহনত রয়েছে তাকে জিহাদই বলা হয়। চাই এই চেষ্টা-প্রচেষ্টা কোন মন্দ কাজের ক্ষেত্রে হোক বা ভাল কাজের ক্ষেত্রে। কিন্তু আরবী ভাষায় এটাকে জিহাদ নাম দিয়ে দেওয়ার দ্বারা তো এটা শরীয়তের বিধান জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ হয়ে যেতে পারে না।

সমাধান-২

যদি যে কোন কাজের জন্য জিহাদ শব্দটি ব্যবহার করাটাই দলিল হয় তা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ হওয়ার তাহলে সুরায়ে লুকমান এর আয়াত সম্পর্কে আপনি কি বলবেন যাতে আল্লাহ তায়ালা বলছেন যে, আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি যেন তারা পিতা-মাতার সাথে সদাচারণ করে এবং আমার ও নিজের পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এবং

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا (سورة لقمان-15)

তোমাদের পিতা-মাতা যদি অনেক চেষ্টাও করে যে, তোমরা আমার সাথে শিরক কর তাহলে তাদের এ কথা কখনো মানবে না।

এখন লক্ষ্য করুন উক্ত আয়াতে কুফুর ও শিরকের দিকে পিতা-মাতার দাওয়াত দেওয়াকে জিহাদ শব্দে ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং এখন যদি কেউ বলে দেয় যে, কুফুর ও শিরকীর দিকে দাওয়াত দেওয়াটাও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। কেননা আল্লাহ তায়ালা কুরআনে এটাকে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বলেছেন তাহলে আপনি তাকে কী বলবেন?

নি:সন্দেহে আপনি তাকে এটাই বলবেন যে, এখানে জিহাদ শব্দটি-শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে পারিভাষিক অর্থ বা শরীয়ত প্রদত্ত অর্থে নয়। আর আমাদের আলোচনা তো জিহাদের শরীয়তপ্রদত্ত অর্থ নিয়ে শাব্দিক অর্থ নিয়ে নয়।

সমাধান-৩

একথার উপর গোটা উম্মতের ঐক্যমত রয়েছে যে, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ একটি ফরয এবং শরীয়তের বিধান যা মদীনায় নাযিল হয়েছে আর وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَاداً كَبِيراً তো মক্কী আয়াত সুতরাং যদি এই আয়াত দ্বারা জিহাদের শরীয়ত প্রদত্ত অর্থও মুরাদ নেওয়া হয় তাহলে বলতে হবে যে, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ মক্কায় নায়িল হয়েছে। অথচ কোন আলেম এমনটি বলেন না। অতএব মেনে নিতে হবে যে, এই আয়াত দ্বারা পারিভাষিক জিহাদ ও শরীয়তের বিধান জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ মুরাদ নয় বরং স্বাভাবিক চেষ্টা করা উদ্দেশ্য আর আরবী ভাষায় চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও মেহনতকে জিহাদ বলা হয়, কিন্তু জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এক জিনিস আর শাব্দিক জিহাদ ভিন্ন জিনিস।

সমাধান-৪

আরবী ভাষায় তো صلاة অর্থ হলো تحريك الإليتين। নিতম্ব তথা শরীরের পিছনের অংশকে নাড়াচাড়া দেওয়া এবং صلاة রহমতও শান্তি প্রেরণের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এবং আরবী ভাষায় সওম এর অর্থ হলো বিরত থাকা আর হজ্ব অর্থ হলো ইচ্ছা করা চাই ভাল কাজের হোক বা মন্দ কাজের। এখন যদি কোন ব্যক্তি এটা বলে যে, আমি তো সকালে উঠেই আমার নিতম্বকে নাড়াচাড়া দেই এবং রহমতের দোয়াও করি সুতরাং এটাই আমার নামায কেননা আরবী ভাষায় এটাকেই নামায বলে। এবং কোন ব্যক্তি যদি বলে আমি এক ঘন্টা-আধ ঘন্টার জন্য পানাহার করা বা কথা বলা থেকে বিরত থাকব, তাহলে এটাই আমার রোযা হয়ে যাবে। কী প্রয়োজন আছে সারাদিন ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত অবস্থায় কাটানোর এবং প্রিয় স্ত্রী থেকে দূরে

থাকার। কেননা আরবী ভাষায় তো শুধু বিরত থাকাকেই রোযা বলা হয়েছে। অথবা কেউ যদি বলে যে, আমি বাইতুল্লাহ যাওয়ার ইচ্ছা করে নিয়েছি। এখন কী প্রয়োজন আছে লাখ-লাখ টাকা খরচ করার এবং বাড়ী ঘর ছেড়ে তীব্র গরমে সফরের কষ্ট সহ্য করার। কেননাআরবী ভাষায় শুধু ইচ্ছা করাকেই হজ্ব বলা হয়েছে। তাহলে এই মুহাক্কিক ও মুদাক্কিক্বকে এটা ব্যতীত কী জওয়াব দেবেন যে, বাবা! আরবী ভাষার দ্বারা শরয়ী পরিভাষা নির্ধারণ হয় না বরং এটাতো শরীয়ত প্রণেতা কর্তৃক নির্ধারণ হয়। এবং ভাষাকে পূজি করে শরীয়তের আমলের অবয়ব বা স্বরুপকে বিকৃত করা যায় না।

হ্যা! এটা ভিন্ন কথা যে, শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থের মাঝে মুনাসাবাত ও সামঞ্জস্যতা থাকে। এজন্য আমি বলি, কুরআন ও হাদীসে কোন আমলের উপর জিহাদ শব্দ ব্যবহার দ্বারা ঐ আমলকে শরয়ী ও পারিভাষিক জিহাদ আখ্যা দেওয়া বদদ্বীনি বা স্বল্পজ্ঞান কিংবা অসম্পূর্ণ বোধশক্তির পরিচায়ক। আমার অনুরোধ যে, এই উদ্দেশ্যে আরো একবার আমার এ কিতাবের ভূমিকায় শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া রহ. এর লেখাটি মুতালাআ করে নেওয়া জরুরী।

সংশয়-৩

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدْ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (سورة التحريم-9)

এ আয়াতে কারীমায় جَاهِدْ শব্দটি এসেছে। এখানে কিতালের অর্থ নেয়া সম্ভব নয়। কারণ আয়াতের নির্দেশ হল মুনাফিকদের সাথে জিহাদ কর। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ স. কখনও মুনাফিকদের সাথে স্বশস্ত্র জিহাদ করেন নি। তাই যদি আয়াতে جَاهِدْ কে قاتل এর অর্থে নেয়া হয় তাহলে এর উদ্দেশ্য হবে এটা এমন হুকুম যে স্বয়ং রাসূল স. ও তার উপর আমল করেননি। নাউযুবিল্লাহ!!

সমাধান-

আমরা বলব অত্র আয়াতে جَاهِدْ অর্থ হলقاتل লড়াই করুন। এর দলিল একাধিক:-

প্রথম দলিলঃ এ আয়াতটি কুরআনের দুই জায়গায় এসেছে। এক. সূরা তাওবায়। আর এটি হল মাদানী সূরা। এতে জিহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান ও জিহাদের বিধি-বিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দুই. সূরা তাহরীম। এটিও মাদানী সূরা । আর জিহাদের হুকুম মদীনায় যাওয়ার পরেই অবতীর্ণ হয়েছে।

দ্বিতীয় দলীল ঃ

এই আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ এই কাফের ও মুনাফিকদের উপর কঠোরতা করুন। কঠোরতা শুধু জিহাদের মধ্যেই হতে পারে। কারণ দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে তো আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ হলো

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ (سورة يوسف-108)

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (سورة النحل-125)

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (سورة فصلت -34)

দাওয়াত সংক্রান্ত এই তিন আয়াতের সারমর্ম হলো আপনি এই কাফেরদেরকে প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা এবং উত্তম উপদেশবাণী শুনিয়ে আপনার রবের প্রতি আহবান করুন।

তৃতীয় দলিলঃ

এই নির্দেশের পরপরই বলা হয়েছে

وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ (سورة التوبة-73)

তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম। অর্থাৎ তাদেরকে হত্যা কর। আর তাদেরকে তাদের ঠিকানা জাহান্নাম পর্যন্ত পৌছে দাও।

দাওয়াত ও তাবলীগ সম্বলিত আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি এমন হয়না। বরং সেগুলোর শেষে হিদায়েতের প্রতি উৎসাহ প্রদানমূলক বা কুফুরীর প্রতি অসন্তোষজ্ঞাপনমূলক কোন কথা থাকে। কিন্তু এখানে তো এমন কথাই বলা হয়েছে যার সম্পর্ক হল মৃত্যুর সাথে। কেননা জাহান্নাম তো মৃত্যুর পরেই আসবে। তাই এর থেকে বুঝতে পারি আয়াতের মর্ম হল এদের সাথে যুদ্ধ কর, তাদেরকে হত্যা কর। আর এভাবে তাদের আপন ঠিকানা জাহান্নামে পাঠাও।

দলীলের সমর্থনেঃ (সমাধান-২)

আমাদের এ আয়াতের সমর্থনে শাইখুল হিন্দ মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী রহ. এর অনুবাদ পেশ করা যেতে পারে। তাফসীরে উসমানীতে এ আয়াতের অনুবাদ করা হয়েছে এভাবে, "হে নবী! আপনি লড়াই করুন কাফেরদের বিরুদ্ধে এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে । এবং তাদের উপর কঠোরতা করুন । তাদের ঠিকানা তো জাহন্নাম। আর তা নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।

সমাধান-৩

এ আয়াতে দুইটি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কতল-হত্যা করা, কঠোরতা করা। তা আবার দুই প্রকার লোকের বিরুদ্ধে। কাফের ও মুনাফিক। তাই আয়াতের অর্থ দাড়াল এই যে, প্রকাশ্য কাফের যারা তাদের বিরুদ্ধে ক্বিতাল হবে আর গোপন কাফের তথা মুনাফিক যারা তাদের উপর কঠোরতা করা হবে।]

হে নবী আপনি চালান অবিরাম

কাফের-মুনাফিকের সাথে স্বশস্ত্র সংগ্রাম।

তাদের উপর হন সবচে কঠোর

দোযখের আযাব বড়ই নিঠুর।

এখানে এই প্রশ্ন থেকে যায় যে তাহলে মুনাফিকদের সাথে কিতাল করা হল না কেন? তার জবাব হল, মুনাফিক তো তাকেই বলা হয় যার কুফুরীটা প্রকাশ্য নয়। ভিতরে ভিতরে কুফুরী করে আর বাহিরে ঈমান প্রকাশ করে তার বিরুদ্ধে কিভাবে কিতাল করা হবে।

আলেমগণ সুস্পষ্ট করে একথা বলেছেন যে, নববী যুগে যেহেতু অহীর মাধ্যমে রাসূল সা. কে জানিয়ে দেয়া হত (কারা মুনাফিক) কিন্তু আমাদের কারো আভ্যন্তরীন কুফুরীর ব্যাপারে ফতোয়া দেয়ার অধিকার নেই। কিন্তু যদি কেউ স্বেচ্ছায় নিজের ভিতরে কুফুরী প্রকাশ করে তাহলে সে তো আর মুনাফিক থাকল না বরং সুস্পষ্ট কাফের হয়ে গেল।

কিন্তু এখনো একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, রাসূল সা. মুনাফিকদের সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তাদের সাথে জিহাদ তথা কিতাল করেননি কেন? তার জবাব হল মুনাফিক তো সেই হয় যার অন্তরে থাকে কুফুরী আর মুখে ইসলাম প্রকাশ করে। যার কারনে মানুষ তাকে মুসলমান মনে করে । সুতরাং রাসূল সা. যদি মুনাফিকদের কতল করেন তবে লোকেরা রাসূল সা. এর বিরুদ্ধে আপত্তি তুলবে যে, মুহাম্মাদ নিজেই নিজের লোকদের হত্যা করছে। (নববী যুগের ঘটনা দেখুন)

পঞ্চম হিজরীর শাবান মাসে বনী মুস্তালিক যুদ্ধের সফরে মুনাফিকদের সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল বলেছিল যে, মুহাজিররা আমাদের উপর প্রাধান্য পেয়ে গেছে। আল্লাহর শপথ মদিনায় পৌছে সম্মানিত লোকেরা অসম্মানিত (মুহাম্মাদ ও তার সাহাবী) লোকদেরকে মদিনা থেকে বের করে দেবে। রাসূল সা. এ বিষয়ে অবগত হলেন। হযরত উমার রা. আরজ করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিব। তখন রাসূল সা. এরশাদ করলেন : থাম, উমার! লোকেরা বাস্তব অবস্থা না জানার কারনে বলাবলি করবে যে, মুহাম্মাদ সা. নিজের সাথীদেরকে হত্যা করে। (বুখারী-কিতাবুত তাফসীর)

এখন দেখার বিষয় হল , রাসূল সা. এই কথা বলেননি যে, মুনাফিকদের হত্যা করা যাবে না। বরং এক বিশেষ কারনে হত্যা করেননি। কিন্তু মুনাফিকদের হত্যা করা পছন্দ করা এই কথার দলীল যে, মূলত মুনাফিকদের হত্যা করাও জায়েয। বরং তা সুন্নাত।

উদাহরণঃ

এটা এমনই যেমন রাসূল সা. খন্দক যুদ্ধে উয়াইনা ইবনে হিস্ন ফাযারীকে মদিনার অর্ধেক খেজুর দিয়ে সন্ধী করার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু সা'দ ইবনে মুআজ ও সা'দ ইবনে উবাদা রা. এর সাথে পরামর্শ করার পরে রাসূল সা. এই ইচ্ছা মূলতবী করে দিলেন। (ইবনে হিশাম)

কিন্তু এখন এটা মাসআলা হয়ে গেল যে যদি কোন কারনবশত কাফেরদেরকে মাল দিয়ে সন্ধি করতে হয় তবে তা জায়েয আছে।

এমনিভাবে রাসূল সা. পায়জামা ব্যবহার করেননি। কিন্তু পছন্দ করেছেন। তাই তা ব্যবহার করা সুন্নাত হয়ে গেল।

রাসূল সা. মুহাররমের দশ তারিখে রোযা রেখেছেন কিন্তু এ কথাও বলেছেন যে, যদি আগামী বছর আমি জীবিত থাকি তাহলে আরো একটি রোযা বৃদ্ধি করে রাখব। তাই এখন নয় বা এগার তারিখে রোযা রাখা সুন্নাত হয়ে গেল।

এ কারনে পরিপূর্ণ নির্ভরতার সাথে বলা যায় যে, মুনাফিকদেরকে হত্যা করাও যেন রাসূল সা. এর সুন্নাহ থেকে সাব্যস্ত হয়েছে।

এই আয়াতে সন্দেহাতীতভাবে এই কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে আয়াতে কারীমায় جَاهِدْ দ্বারা উদ্দেশ্য قاتل ই হবে।

সংশয় -8

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (سورة العنكبوت-69)

আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে আমি অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের সাথেই আছেন।

এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। এতে প্রকাশ্যভাবে দ্বীনের মেহনতকে জিহাদ বলা হয়েছে। এতে বুঝা গেল, জিহাদের অর্থ শুধু ক্বিতাল অর্থাৎ সশস্ত্র যুদ্ধে সীমাবদ্ধ নয়। বরং দ্বীনের পথের যে কোন মেহনতকেই জিহাদ বলা যায়।

সমাধান- ১

এটা সূরা আনকাবূতের আয়াত। এ সূরাটি যদিও মক্কী কিন্তু অত্র আয়াতখানা মাদানী। যারা মোটামুটি তাফসীর বিষয়ে জ্ঞাত তাদের জানা থাকার কথা যে, মক্কী সূরায় মাদানী আয়াত এবং এর বিপরীত হওয়া একটি সাধারণ ব্যাপার। বাস্তব ব্যাপারটি যদি তাই হয়ে থকে, তাহলে আর কোন আলোচনার প্রয়োজন থাকেনা। কেননা খোদার রাহে কিতাল কারীদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের পথ খুব দ্রুত খুলে দেয়া হয়।

আর যদি এই আয়াত মক্কী হয়। তাহলে এর অর্থও তো সুস্পষ্ট, যে বা যারা আল্লাহর জন্য কষ্ট সহ্য করে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের অন্তরগুলো আলোকিত করে দেন। তারা দ্রুততার সাথে আল্লাহর নৈকট্যের স্তরগুলো অতিক্রম করে ফেলেন। আমরা তো আগেই বলে এসেছি যে, আরবী ভাষায় সব ধরনের মেহনত বুঝানোর জন্য জিহাদ শব্দ ব্যবহার হয়। কিন্তু এর দ্বারা পারিভাষিক জিহাদের ব্যাপকতা কিভাবে প্রমানিত হয়?

সমাধান -২

جاهد يجاهد এটা فاعل يفاعل এর ওযনে। এর মাসদার দুই রকম হয়ে থাকে, مفاعلة ও فعال । অত্র আয়াতে যে جاهدوا বলা হয়েছে। তা مجاهدة থেকে এসেছে جهاد থেকে নয়। আমাদের আলোচনা হল جاهدوا (জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ) নিয়ে। مجاهدة নিয়ে নয়। তাই এই আয়াত পাঠ করে কোন ধরনের সংশয় সৃষ্টি হবার প্রশ্নই থাকেনা।

এখন প্রশ্ন থাকতে পারে এখানে جاهدوا যে مجاهدة থেকে এসেছে তার কী প্রমাণ? তো এর জন্য তাফসীরে উসমানী দেখা যেতে পারে। এতে শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. এ আয়াতের অধীনে লেখেন,

"অর্থাৎ যে সব লোক আল্লাহর ওয়াস্তে কষ্ট স্বীকার করে ও মেহনত বরদাশত করে এবং বহুবিধ মোজাহাদায় নিজেকে মাশগুল রাখে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এক বিশেষ নূর দান করেন। এবং সন্তুষ্টির পথসমূহ প্রদর্শন করেন। মেহনত মোজাহাদার ময়দানে সে যত অগ্রসর হতে থাকে তার খোদা প্রদত্ত সেই নূর ও নৈকট্যের স্তর সমুহেও প্রবৃদ্ধি ঘটতে থাকে।

দেখতে দেখতে তার সামনে দ্বীনের জটিল থেকে জটিলতর বিষয়ের এত সহজ সমাধান প্রকাশ পেতে থাকে যা অন্যদের কল্পনায়ও আসে না।

কবির ভাষায়ঃ-

কষ্টের পাহাড় মাড়িয়ে বন্ধু চলছ তুমি ধীরে

জান-মাল সব খোদার পথে ত্যাগ-কোরবানী করে।

তবু কেন ফের আসবেনা তার দয়ার জোয়ার ভাই

পাবে তুমি তার প্রতি কদমে রাহনুমা বলে যাই।

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সবাইকে কুরআনে কারীম বুঝার ও আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন !!!

সংশয় -৫

সুরা আল-আদীয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা ঘোড়ার পায়ের শপথ করেছেন। কিন্তু এ ফযিলত জিহাদ ও মুজাহিদদের ঘোড়ার ব্যাপারে নয়। কারন জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর হুকুম তো মদীনায় এসেছে। আর এই সূরাটি হল মক্কায় অবতীর্ণ। মক্কী সূরায় বর্ণিত ফযিলত মাদানী হুকুমের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা কিভাবে সম্ভব?

সমাধান -১

অত্র সূরাটি মক্কী না মাদানী তা নিয়ে মুফাস্সিরীনদের মাঝে মতনৈক্য রয়েছে। কেউ বলেন মক্কী, কেউ বলেন মাদানী। উভয় অভিমত অনুযায়ী আমরাও সংশয়ের অপনোদন করবো।

তাফসীর-১

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, জাবের বিন আব্দুল্লাহ, হাসান বসরী, ইকরিমা ও আতা বিন আবি-রাবাহ রা. এর মতে সূরাটি মক্কী। (তাফসীরে কুরতুবী)

এ সূরার বাহ্যিক ভাষ্য থেকে বুঝা যায় এতে যুদ্ধে ব্যবহৃত ঘোড়ার নামে শপথ করা হয়েছে। চাই সে যুদ্ধে ইসলামী জিহাদ হোক বা সাধারন যুদ্ধ হোক।

আর উদ্দেশ্য হল একথা বোঝানো যে, অবুঝ প্রাণী একটি ঘোড়া সামান্য ঘাস-পানি পেয়ে আনুগত্য প্রদর্শন করে। মালিকের সামান্য ইশারায় তুমুল যুদ্ধের বিভীষিকাময় মুহূর্তেও সামনে এগিয়ে যায়। গুলি বৃষ্টির মাঝে বুক টান করে প্রভূর প্রতি অগ্রসর হয়। প্রভূকে বাঁচাবার জন্য আপন জান পর্যন্ত লুটিয়ে দেয়।

সুতরাং হে মানব! তুমি তো তোমার প্রকৃত মালিকের এতটা গুনগ্রাহী নও, একটা ঘোড়া তার সাময়িক মালিকের যত গুনগ্রাহী হয়ে থাকে। তুমি তো ওফাদারীতে একটি প্রাণীর থেকেও নিকৃষ্ট হয়ে গেছো।

সুতরাং এ আয়াতের লক্ষ্য হলো নিন্দা জ্ঞাপন ও উৎসাহ প্রধানের মাধ্যমে মানবজাতিকে আল্লাহর কৃতজ্ঞ বানানো।

এ তাফসীর অনুযায়ী উক্ত সূরাটির জিহাদ ও মুজাহিদীনদের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। আর এটা কে জরুরী করল যে, কোরআনের প্রতিটি সূরা প্রতিটি আয়াতে জিহাদ ও মুজাহিদীনদের ফযীলত থাকতে হবে।

নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাতের ন্যায় শরীয়তের অন্যান্য আমল যেমন: শুকুর, সবর, সাহসীকতা, বদান্যতা, সততা ও লজ্জাশীলতা ইত্যাদি গুনাবলী অর্জনের নির্দেশ ও কুরআন দিয়েছে।

তাই অত্র সূরাটি মুজাহিদদের ব্যাপারে অবতীর্ন না হলেও এতে মুজাহিদদের মর্যাদায় কোন কমতি আসবেনা। কারন মুজাহিদদের শান-মর্যাদা আপন যায়গায় এক স্বীকৃত বাস্তবতা। তাদের ফযীলত কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে।

সমাধান -২

হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত আনাস রা., হযরত ইমাম মালেক ও কাতাদা রহ. এর মতে আয়াতটি মাদানী। (তাফসীরে কুরতুবী)

তাফসীর -২

এ আয়াতে শুধু যুদ্ধঘোড়া নয় বরং মুজাহিদদের ঘোড়ারই শপথ করা হয়েছে। হযরত শাহ আব্দুল কাদের রহ. তাফসীরে মুজিহুল কুরআনের টিকায় লেখেন, “এটা জিহাদে ব্যবহৃত ঘোড়ারই শপথ। আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে নিজের জান দেবার জন্য উপস্থিত হবার চাইতে বড় কাজ পৃথিবীতে আর কী আছে!”

হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. তাফসীরে উসমানীতে

إِنَّ الإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (سورة العاديات-6)

আয়াতের অধীনে লেখেন:

“মুজাহিদ অশ্বারোহীগন আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করার ক্ষেত্রে অন্যদের আদর্শ হয়ে থাকে। আর যারা আল্লাহর দানকৃত শক্তিকে তার পথে খরচ করে না তারা নিকৃষ্টতম অকৃতজ্ঞ ও অযোগ্য।

وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ (سورة العاديات-7)

সারকথা:

এই সূরাকে মক্কী ঘোষনা করে মুজাহিদদের ফজিলত নিয়ে অযথা পেরেশান হবার কোন কারন নেই। কেননা আসলাফের কেউ কেউ একে মক্কী বলেছেন আবার অনেকে একে মাদানীও বলেছেন।

সাথে সাথে একে মাদানী সূরা ঘোষনা করে মুজাহিদদের ফযীলতের সাথে বিশেষিত করাও ঠিক নয়। কারণ কেউ কেউ তাকে মাদানি বলেছেন আবার অন্যরা তাকে মক্কী বলেছেন।

আদেশ-নিষেধ অধ্যায়

সামনের কয়েক পৃষ্ঠা ব্যাপী কুরআন থেকে আদেশ-নিষেধ সম্পর্কিত আয়াত উল্লেখ করা হবে। এজন্য আমি সমিচিন মনে করছি উসুলে ফিক্বাহের আলোকে আমর-নাহীর সংঙ্গা উল্লেখ করে দিব। যাতে আগত আপত্তিও তার জবাব সমূহ বুঝতে সহজ হয়।

সুতরাং আগত প্রশ্ন গুলোর পাঠক অবশ্যই এই অধ্যায়টি মনোযোগের সাথে পড়ে নিবেন।

আমর :

আরবী ভাষায় আমর হল قول القائل لغيره إفعل কোন ব্যক্তি কাউকে এই বলা যে তুমি এই কাজটি কর। চাই নমনীয়তার সাথে হোক বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে।

শরীয়তের পরিভাষায় আমর বলা হয় إلزام الفعل على تصرف ، الغير। **কারো জন্য কোন কাজ করাকে অবশ্যক করে দেওয়া। (উসুলুস্‌শাশী)**

কেউ কেউ এই সংজ্ঞাও দিয়েছেন যে قول القائل لغيره إفعل على سبيل الإستعلاء। **কোন ব্যক্তি অপর কাউকে অধিকার বলে এই বলা যে, তুমি এই কাজটি কর।**

নাহী:

আরবী ভাষায় নাহী অর্থ **المنع** নিষেধ করা। আর পরিভাষায় নাহী বলা হয়। কোন ব্যক্তি তার চেয়ে মর্যাদায় ছোট কাউকে কোন কাজ না করার আদেশ করা।

কেউ কেউ এই সংজ্ঞা করেছেন যে, কাউকে ক্ষমতা বলে এই আদেশ করা যে, তুমি অমুক কাজ করবে না।

সারকথা:

আমর-নাহীর সংজ্ঞার সারাংশ এই দাড়ায় যে, কাউকে কোন কাজ করার বা না করার আদেশ দেয়া। তবে শর্ত হল যাকে আদেশ দেয়া হয়েছে তার উপর আদেশ দাতার কর্তৃত্ব থাকতে হবে।

সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি এমন কাউকে কোন কাজ করা বা না করার আদেশ করে যার উপর তার কোন কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা নেই তাহলে তা আদেশ হবে না। বরং অনুরোধ হবে।

উল্লিখিত ব্যাখ্যা থেকে বুঝা গেল কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আমর-নাহী সম্মলিত আয়াত ও হাদীসের উপর আমল তখনই করতে হবে যখন ক্ষমতা থাকবে। যেমনটা ইতিপূর্বে আফগানিস্তানে ইসলামী শাসনামলে দেখা গেছে। তখন আফগানিস্তানে হযরত আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর হাফিযাহুল্লাহ যখন আদেশ করতেন যে, নামাজের সময় সবধরনের দোকানপাট বন্দ থাকবে। সবাই জামাতের সাথে

নামাজে শরীক হবে। মহিলাগণ পর্দা করবে। ইত্যাদী অন্যান্য সকল বিষয়ে এগুলোকে আদেশ বলে।

অথবা তিনি যখন আদেশ দিতেন যে, কেউ দাড়ি মুন্ডাবে না, ঘরে টিভি, ভিসিআর, ডিস লাগাবেনা। কোন প্রাণীর ছবি আঁকবে না, কারো এই ক্ষমতা নাই যে, কেউ এর খেলাফ করবে। এগুলোকে নিষেধ বলে।

নোটঃ

এই ভিত্তিতেই মুসলমানদের বাদশাকে আমীরুল মুমিনীন বলা হয়। কেননা তিনি আদেশ দেন। বরং কিছু লোক আথবা কয়েক শত লোকের নেতৃত্ব দান কারীকেও শরীয়তে আমীর বলা হয়। কেননা তার কথা মানা জরুরী। এবং অন্যদের উপর তার এক ধরনের কর্তৃত্ব আছে। যে কারনে তার কোন কিছু করার আদেশকে আমর আর না করার আদেশকে নাহী বলা হয়।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ

পিছনে উল্লিখিত আলোচনাকে সামনে রেখে ইন্‌শা- আল্লাহ পাঠকের জন্য এই ফায়সালা করা খুব সহজ হয়ে যাবে যে, বর্তমানে অথবা প্রত্যেক যুগে আদেশ-নিষেধ দাতা কারা ছিলেন এবং কারা উপযুক্ত এবং এই ফরজ বিধান কারা আদায় করছেন?

আবদারঃ

এতদ সত্ত্বেও আমার অনুরোধ হল যদি আমর-নাহীর প্রকৃত অর্থের উপর আমল করা দুষ্করই হয় তবে যতটুকু সম্ভব ততটুকু করার জন্য চেষ্টা তো করা দরকার। নয়তো কমপক্ষে এতটুকু তো করা দরকার যে দ্বীনের মেহনতের স্বার্থে নিজ অনুরোধ-নিবেদন কে আমর বলা যাবে না। কেননা যখন আমরা স্বাধারণ মেহনত ও তারগীব

তারহীবকেই আমর নাহী বলতে শুরু করি তাহলে উম্মত প্রকৃত আমর-নাহীর উপর আমল করার চেষ্টাই ছেড়ে দিবে।

আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক দ্বীন বুঝাও সঠিক দ্বীন বুঝে তার উপর আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন ইয় রাব্বল আলামীন!

সংশয় -৬

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (سورة آل عمران-104)

তোমাদের মধ্যে একটি দল থাকা উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে, ভাল কাজের আদেশ করবে এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম। (তাফসীরে উসমানী)

এই আয়াতে কারীমা থেকে কিছু লোকের এই ভুল ধারনা সৃষ্টি হয় যে, মুজাহিদীনরা এই আয়াতের না মিসদাক আর না তারা এর উপর আমল করে। কেননা এই আয়াতে রয়েছে- এমন একটি দল থাকা উচিত যারা কল্যাণের প্রতি আহবান করবে, ভাল কজের আদেশ করবে এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে- মুজাহিদীনরা না দাওয়াত দেয় আর না সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ করে।

সমাধান -১

এই আপত্তির বাস্তবতা একটি ধোকা ব্যতীত কিছুই নয়। কেননা এই আয়াতে কারীমায় আদেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে একটি দল থাকা উচিত যারা তিনটি কাজ করবে-

يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ، يَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ۔

এখন আমরা এই তিনটি কাজের একটি জরীপ করবো।

১. يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِতারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে। কল্যাণ দুই প্রকার এক. পরিপূর্ণ কল্যাণ দুই. অপরিপূর্ন কল্যাণ।

পরিপূর্ন কল্যাণ বলে যাতে পরিপূর্ণ দ্বীন শামিল। অর্থাৎ নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, এবং জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ইত্যাদি। আর অপরিপূর্ণ কল্যাণ হল- যাতে পরিপূর্ণ দ্বীন থাকবে না। বরং কিছু কাজের ঘাটতি থাকবে। দেখুন যারা এমন আমলের দাওয়াত দেয় যাতে জিহাদ নেই তারা অসম্পূর্ন দ্বীনের দাওয়াত দেয়। জিহাদ ব্যতীত অন্যান্য আমলের উপর আমল করা অসম্পূর্ন কল্যাণের উপর আমল।

আর যারা জিহাদের দাওয়াত দেয় তারা পরিপূর্ণ কল্যাণের প্রতি দাওয়াত দেয়। কেননা তার মধ্যে নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, ইত্যাদি রয়েছে। জিহাদ তো

আছেই। বরং কতেক হাদীসে স্বয়ং জিহাদকেই পরিপূর্ণ দ্বীন বলা হয়েছে। রাসূল সা. এরশাদ করেন-

عن ابن عمر ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم).

- سنن أبي داؤود :490/2 باب في النهى عن العينة . رقم الحديث:3462 - مسند أحمد:114/5 رقم الحديث:5562

যখন তোমরা ইনা কারবার করবে (এক প্রকার সুদী কারবার) এবং উটের লেজ আকড়ে ধরবে (পশু পালনে ব্যস্ত হয়ে যাবে) এবং জিহাদ পরিত্যাগ করবে তখন তোমাদের উপর আল্লাহ তা'য়ালা লাঞ্চনা আরোপ করবেন। যাবৎনা তোমরা তোমাদের দ্বীনের দিকে ফিরে আসবে।

এই হাদীসের ব্যাখ্যা হজরত খলীল আহমাদ সাহারানপূরী রহ. বজলূল মাজহুদ শরহু আবী-দাউদে বলেন এখানে দ্বীনের দ্বারা উদ্দেশ্য জিহাদ।

এখন একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন যে, জিহাদের সাথে দাওয়াত দেওয়া পরিপূর্ণ কল্যাণের প্রতি দাওয়াত নাকি জিহাদ রেখে দাওয়াত দেওয়া পরিপূর্ণ কল্যাণের প্রতি দাওয়াত?

জিহাদের আমল জিন্দা হলে অন্যান্য সকল আমলও জিন্দা হয়। আর জিহাদের আমল খতম হয়ে গেলে অন্য সকল আমলও খতম হয়ে যায়। সুতরাং জিহাদের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার অর্থ অন্যান্য সকল আমলের প্রতি দাওয়াত দেওয়া। সুতরং জিহাদের প্রতি দাওয়াত দেওয়া প্রকৃত دعوة إلي الخير কল্যাণের প্রতি আহবানের সঠিক ও যথার্থ মিসদাক।

সমাধান -২

يَـأْمُـرُونَ بِـالْـمَعْرُوفِ এর জন্য আমর এর অধ্যায় দেখে নিন যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এখন এই সিদ্ধান্তে আমরা পৌছেছি যে, জিহাদ ব্যতীত সৎকাজের আদেশ তো সম্ভবই না। কেননা সৎকাজের আদেশ তো শক্তি ব্যতীত হতেই পারে না। আর শক্তি জিহাদ ব্যতীত অর্জিতও হতে পারে না। সৎকাজের আদেশতো মুজাহিদীনরাই করে থাকে। অন্য কেহ নয়। আর অন্য কারো পক্ষে করাও সম্ভব হতে পারে না।

সমাধান -৩

نـهي عَنْ ।الْـمُـنْـكَـرِ এ অধ্যায় দেখে নেয়া يَـنْـهَـوْنَ عَنْ ।الْـمُـنْـكَـرِএজন্য যেতে পারে। এখন এই সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় যে, জিহাদ ব্যতীত نـهي عَنْ ।الْـمُـنْـكَـرِ সম্ভবই না। কেননা نـهي عَنْ ।الْـمُـنْـكَـرِ এর জন্য শক্তি প্রয়োজন। আর শক্তি জিহাদ ব্যতীত সম্ভব না। এজন্য نـهي عَنْ ।الْـمُـنْـكَـرِ মুজাহিদরাই করে থাকে।

মুখের ভষায় উৎসাহ দেওয়া বড়ই সহজ কথা

অন্যায় কাজে বাধা দিয়ে দেখ কেমন জটিলতা।

অন্যায় প্রতিরোধ জেনে রেখ তাই

শক্তি ও দাপটের বিকল্প কিছু নাই।

ব্যাখ্যাঃ

যারা নিজেদেরকে এই আয়াতের সঠিক মিসদাক মনে করেন তারা তো এমন نـهي عَنْ ।الْـمُـنْـكَـرِ করেন না। কারণ তারাই বলেন যে, যদি আমরা نـهي عَنْ ।الْـمُـنْـكَـرِ করি তাহলে লোকেরা আমাদের থেকে দূরে সরে যাবে। কেননা খারাপ কাজ তাদের প্রিয় ও আকর্ষনীয় বস্তু। আর যখন প্রিয় বস্তু থেকে তাদের বাধা দেয়া

হবে। তখন তারা আমাদের কথা কিভাবে শুনবে? আর যখন কথা না শুনবে তখন তারা দ্বীনের পথে কিভাবে আসবে?

এমন ব্যক্তিদের জন্য হযরত মুফতী রশীদ আহমাদ রহ. এর একটি ওয়াজ চয়ন করে বর্ণনা করছি। অনুগ্রহ করে রশীদ আহমাদ লুধিয়ানবী রহ. এই বাণী অত্যন্ত গুরুত্ব ও মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করবেন।

তিনি বলেন , তাবলীগের জন্য জিহাদ এত জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ যে, উহা ব্যতীত তাবলীগই সম্ভব নয়। যারা ধারনা করে যে, তাবলীগ শুধু মৌখিক আমল । আর তা জিহাদ ব্যতীত সম্পাদন করা সম্ভব। তারা তাবলীগের অর্থ বুঝতে তিনটি ভুলের ভিতরে নিমজ্জিত। এক. কিছু এবাদতের তাবলীগ করে মনে করে যে, তাবলীগের হক আদায় হয়ে গেছে। অথচ প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তি একথা বুঝেন যে, পরিপূর্ণ তাবলীগতো তখনই হবে যখন পূর্ণ ইসলামের তাবলীগ হবে। শুধু নামাজ অথবা অতিরিক্ত দু'তিন আহকামের তাবলীগকে পূর্ণ দ্বীনের তাবলীগ বলা যায় না।

ইসলামের আহকাম-বিধি বিধানের চারটি শাখা এক. আক্বীদা-বিশ্বাস দুই. ইবাদত তিন. মুআমালা চার. হুদুদ-ক্বিসাস। যতক্ষন পর্যন্ত তাবলীগ পূর্ণ হবে না। আপনি তাবলীগের কাজ থেকে দায়িত্ব মুক্ত পারবেন না। যেমনিভাবে ব্যক্তিগত আমল সংক্রান্ত আহকাম রয়েছে। তেমনি মুআমালাত তথা যে সকল বিষয়ে একে অন্যের সাথে সম্পৃক্ত হয় যেমন বিবাহ, তালাক, ক্রয়,-বিক্রয়, ভাড়া নেয়া, কৃষিকাজ, চাকরী ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামের আহকাম রয়েছে। কুরআন হাদীসে যা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ব্যভিচারীকে এই শাস্তি দিতে হবে, চোরকে এই শাস্তি দিতে হবে এবং ডাকাতকে এই শাস্তি দিতে হবে। যতক্ষন পর্যন্ত ইহাকে ইসলামের পরিপূর্ণ তাবলীগ বলা যাবে না।

দুই. শুধু মৌখিক তাবলীগকে যথেষ্ট মনে করে। ধারনা করে যদি এটা জারী যাকে তাহলে জীবনাচার পরিপূর্ণ ভাবে সংশোধন হয়ে যাবে এবং সকল কাজের মুসলমানদের এই জীবনাচার দেখে ইসলামে প্রবেশ করবে। না আছে শরয়ী শাস্তির

বিধান কর্যকর করার প্রয়োজন আর না আছে কাফেরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদের। অথচ দাওয়াতও তাবলীগ একটি শরয়ী পরিভাষা। যার বিস্তারিত আলোচনা হল যদি খেতাব কাফেরদের প্রতি হয়ে থাকে তবে শুধু তাদের কাছে ইসলাম পেশ করার দ্বারা দাওয়াতের ফরজ দায়িত্ব থেকে মুক্তি লাভ হবে না। বরং ইসলাম কবুল করবে সে আমাদের ভাই। আর যে ইসলাম কবুল করবে না তাকে ইসলামী হুকুমত কবুল করার দাওয়াত দেয়া হবে অর্থাৎ রাষ্ট্র হবে ইসলামের তোমাদের জিযিয়া দিয়ে ইসলামী হুকুমতের আনুগত হয়ে থাকতে হবে। ইসলামী হুকুমত তার জান ও মালের হেফাজত করবে। যদি সে ইসলামী হুকুমতকে সমর্থন না করে তখন তার বিরুদ্ধে সশস্ত্রে জিহাদ চলবে যতক্ষন সে ইসলাম অথবা ইসলামী হুকুমত কবুল না করে।

ইসলাম জোরপূর্বক কাফেরদেরকে মুসলমান বানানোর শিক্ষা দেয় না কিন্তু আল্লাহর জমীনে কাফেরের হুকুমত করার অনুমতিও দেয় না।

তিন. তাদের ধারনা শুধু ভাল কাজের হুকুম দাও খারাপ কাজ থেকে বাধা দিও না। খারাপ কাজ নিজে নিজেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে মিটে যাবে। যেমন অন্ধকার দূর করতে হলে ছোট একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে দাও অন্ধকার দূর হয়ে যাবে। এর জরুরত নেই যে, ডান্ডা দিয়ে পিটানো শুরু করবে। বাহ্যিক ভাবে মূর্খদের এই প্রমান অনেক মজবুত মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে এই ধারনা সম্পূনই বাতিল। এবং এই ধরনাটিই দুনিয়াতে পাপাচার, অশ্লীলতা, গর্হিতকাজ বিস্তার লাভ করার অন্যতম কারন। বিবেক ও শরয়ী প্রমান এর জীবন্ত স্বাক্ষী।

কুরআন ও হাদীসে যেখানেই أمر بالمعروف এর হুকুম দেওয়া হয়েছে সাথে সাথে نهي عن المنكر এর হুকুম ও দেয় হয়েছে। যদি نهي عن المنكر এর কোন গুরুত্ব ও প্রয়োজন না থাকে, أمر بالمعروف ই যথেষ্ট হয়ে থাকে তাহলে নাউযুবিল্লাহ , আল্লাহ তা’য়ালা ও রাসূল সা. এর এই দর্শন কি বুঝে আসেনি যে, সৎকাজের আদেশ দিলেই সকল খারাপ কাজ আপনা আপনিই মিটে যায়। উপরন্তু এটাও অবাস্তব হয়ে পড়বে যে, উম্মতের উলামায়ে কেরাম যারা সামর্থ থাকা অবস্থায়

نـهـي عن الـمـنـكـر এর তিন অবস্থা- হাত দ্বারা, মুখ দ্বারা, অন্তর দ্বারা- এগুলিকে ফরজ ও ওয়াজিব বলে থাকেন। তারাও নাউযুবিল্লাহ শরীয়তের বিধানও মেযাজ সম্পর্কে অবগত নন।

আকল ও বাস্তবতা থেকে এর গুরুত্ব অনেক সুস্পষ্ট। মানুষের প্রকৃতিগত ভাবে আত্মিক চাহিদা ও গুনাহের প্রতি টান রয়েছে। ভাল কাজে যতই দাওয়াত দেওয়া হোক نـهـي عن الـمـنـكـر এর উপর আমল না করা হলে সমাজ থেকে অশ্লীলতা ও খারাবী মিটানো সম্ভব নয়।

এখন তো এর থেকে ও বড় সংবাদ শুনা যায় যে, মানুষদেরকে দ্বীনদার বানানোর জন্য এবং তাদেরকে তরবিয়ত দিয়ে তাদেরকে কাছে আনার জন্য তাদের সাথে বিদআত ও গুনাহের বৈঠকে অংশ গ্রহণ করাও যায়েজ। বরং অত্যাবশ্যক মনে করা হয়। এটা স্পষ্ট দ্বীনের তাহরীফ। লোকদেরকে জান্নাতী আমলে নিজেদের সাথে শরীক করার পরিবর্তে তাদের জাহান্নামী কর্মকান্ডে শরীক হয়ে জাহান্নামের সওদা তৈরী করছে। শুধু তাই নয় বড়ই জুলুমের কথা এ কাজকে জায়েয নয়। বরং সওয়াবের কাজ এবং নবুওয়তের মেজাঝ ও দ্বীনের তাবলীগ মনে করা শুরু করেছে। যদি বাস্তবতা এমন হয় যেমন শুনা যাচ্ছে তাহলে তার ঈমান নেই।

একটি মূলনীতি খুব ভালবাবে মনে রাখবে এবং অন্যের কাছে পৌছে দিবেন: لا يـقـام الـديـن بـهـدمـه দ্বীনকে ধ্বংস করে তা প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

দ্বীন-বিরোধী স্বরন রাখবেন আল্লাহ তা'য়ালা। পূর্ববর্তী নবীগন। রাসূল সা. সাহাবায়ে কেরাম। উলামায়ে উম্মত ও বাস্তবতার চুড়ান্ত আকাট্য সিদ্ধান্ত হল কুফুরও শিরক এবং অপরাধ থেকে সমাজকে পবিত্র করতে হলে এবং আল্লাহর দ্বীনকে বিজয় করতে হলে শুধু মৌখিক তাবলীগ যতেষ্ট নয়। যাবৎ না ক্বিতাল এর মাধ্যমে কাফেরদের বড় বড় রাষ্ট্রের শান-শাওকাত চুরমার করা হবে। ততদিন পর্যন্ত সাধারণ কাফেররা ইসলামের সত্যতা নিয়ে ভালভাবে চিন্তা ফিকির করতে পারবে না। আর মুসলমানগন তাদের কর্তৃত্ব প্রযুক্তির উন্নত এবং প্রোপাগান্ডার নিজেদের সমাজকে পবিত্র করতে পারবে না।

আল্লাহ এই বাস্তবতা বোঝার তৌফিক দান করুন এবং উপকারী বানিয়ে দিন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন!

আমার আবেদন ঃ

হযরত রশীদ আহমাদ লুধিয়ানভী রহ. এর উক্ত ইলমী দিক নির্দেশনার পরে আরজ করছি যে, শরীয়তের বিধানও মাসাইল শুধু দৃষ্টান্ত বা প্রমান বিহীন দলীল দ্বারা না প্রমানিত হয় আর না পরিবর্তিত হয়। যদি এমন প্রবাদ প্রবচনের দ্বারাই কাজ হত তহলে দেখুন, রাফেজী লেংটা ফকিরা ও দাবী করে যে, প্রকৃত সাইয়্যেদ তো আমরাই। যখন বলা হয় অনেক সুন্নিও তো সাইয়েদ হওয়ার দাবী করে তখন তারা এই প্রবাদ বাণী দিয়ে তা প্রত্যক্ষান করেঃ যেমন কাঠের হাড়ীতে ভাত হয় না, তেমন কোন সূন্নি সাইয়্যেদ হয় না।

এ বিষয়ে আমার ছাত্র জীবনের একটি ঘটনা স্বরণ হয়েছে। যখন আমি জামিয়া ইমদাদিয়া ফায়সালাবাদে পড়ি এবং সমবয়সী বন্ধুদের সাথে এর আলোচনা করি তখন আমার এক বন্ধু মাওঃ সাঈদ আহমাদ (যে এখন জামিয়া ইমদাদিয়তেই শিক্ষক- মাশাআল্লাহ- আনেক যুগ্যতা সম্পুর্ন এবং নেককার ব্যক্তিত্ব। দোয়া করি আল্লাহ তা'য়ালা তার দ্বারা দ্বীনের খুব কাজ নিন আমীন।) বলে উঠলেন

পানির যদি চেরাগ হতো শিয়ারাও সাইয়্যেদ হতো।

একই ভাবে কমিউনিষ্টদের মধ্যে যারা আপন, বোন, মেয়ে নাউযুবিল্লাহ কামভাব পূর্ণ করার উপযুক্ত মনে করে দলীল দেয় যে, যখন ঘরের মধ্যে সেব ফল পাওয়া যায় তখন বাজার থেকে কিনে আনার কি প্রয়োজন? সর্বশেষ আপন বোন এবং অপরের বোনের মাঝে কী পার্থক্য? চাচাতো বোন এবং আপন বোনের দাদা তো একই এবং একই রক্ত। যখন একই দাদার ছেলে অর্থাৎ চাচার মেয়েকে বিবাহ করা যায়েজ তখন আপন পিতার মেয়েকে বিবাহ করা যাযেজ নয় কেনঃ? এই দলীলের উপর ভিত্তি করে খৃষ্টনদের কাছে চাচাতো বোন বিবাহ করা হারাম। আমি শুধু দুটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছি।

যা থেকে আপনি বুঝতে পেরেছেন যে, যদি শুধু দৃষ্টান্ত দ্বারা কাজ চলতো তাহলে কথা কোন পর্যন্ত পৌছতো?

কিন্তু আমি এই দৃষ্টান্তের বিশ্লেষন করতে চাই। তাহলো হে আমার ভাই! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মোমবাতি জ্বালালে অন্ধকার আপনা আপনি দূর হয়ে যায় তবে এটা তখন যখন মোমবাতির প্রজ্জ্বলন অব্যহত থাকবে। যেমনিভাবে সাধারণ একটি মোমবাতি আনেক বড় অন্ধকারকে দূর করতে পারে তেমনি অনেক বড় মোমবাতিকেও সাধারণ একটি বাতাশ নিভিয়ে দিতে পারে। এই শরীয়তকে আবদ্ধ কামরার অন্ধকার দূর করার জন্য মোমবাতি হিসেবে পাঠানো হয়নি। বরং গোটা দুনিয়ার জল-স্থল, লোকালয়, মরু সব জায়গার অন্ধকারকে দূর করার জন্য সূর্য এবং কুফুর ও শিরকের তুফানকে প্রতিহত করার জন্য লৌহ পিন্ড কুসংস্কার ও রুসুমাতের অন্ধকারের মুকাবেলার জন্য বেগবান বাতাশ এবং অশ্লীলতা ও খারাবীর সয়লাবকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য চাটান বানিয়ে পাঠানো হয়েছে।

পবিত্র শরীয়তকে ছোট ছোট উদাহরণ ও দৃষ্টান্তের মধ্যে আবদ্ধ করে প্রজ্জোজ্বল শরীয়তকে অপদস্ত করো না। অন্যের ঈমানের ফিকিরে নিজের ঈমানকে বরবাদ করো না। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে শরীয়তের উপর আমল করার এবং তা যথাযথভাবে তাবলীগ করার তাওফিক দান করেন। আমীন! ইয়া রব্বাল আলামীন!!

সংশয় -৭

আজকাল ব্যপকভাবে কিছু 'খাইরুল উম্মত' হওয়ার ব্যাক্ষ্যা করে যে, মানুষেদের দ্বীনের দিকে ডাকো, নামাজ এবং রোজার কথা বলো। আর এ বলে মানুষদের উদ্বুদ্ধ করে যে, ফজিলত শুনিয়ে দ্বীনের দিকে আনাই এই উম্মতের কাজ এবং এ কারণেই এই উম্মত সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত।

সুতরাং যে, সমস্ত আলেম মসজিদের মিম্বরে খৎবা দিচ্ছে, মাদ্রাসায় দরস প্রদান করছে। অথবা ঐ সকল মাশায়েখ যারা খানকায় বসে "আল্লাহ" "আল্লাহ" যিকির করছে, এবং যে সকল মুজাহিদ ময়দানে জিহাদ করে নিজেদের জান কুরবানী দিচ্ছে তারা এ বিষয়টি বুঝছেনা, অযথা নিজেদের সময় নষ্ট করছে। এজন্য তাদেরও উচিৎ তারা যেন দাওয়াত ও তাবলীগের নামে যে কাজ হচ্ছে তাতে অংশগ্রহণ করে এবং শ্রেষ্ঠ উম্মতের বাস্তব রূপ হয়।

সমাধান -১

উম্মতে মুহাম্মদিয়া এর 'খাইরুল উম্মত' হওয়ার একারণ যা ব্যপকভাবে হয় সম্পূর্ণরূপে তা ভূল এবং কোরআন সুন্নাহকে সঠিক রূপে না বুঝার প্রমান বহন করে। যদি গভীরভাবে দেখা হয় তাহলে দাওয়াত ও তাবলীগের নামে যে কাজ চলছে তাকে দ্বীনের রূহ এবং মূল কাজ মনে করে বাকী সব কিছু অনার্থক ভাবা স্পষ্ঠ ভ্রান্তি। বরং দ্বীনকে হেয় করা। যার দ্বারা উলামা, মাশায়েখ এবং মুজাহিদীনদের হেয় পতিপন্ন করার পথ খুলে যায় যা বড় ধরনের বে-আদবী ও মাহরূমীর আলামত। আসুন এবার দেখি এ উম্মত 'খায়রুল উম্মত' হওয়ার কারণ কী?

খায়রুল উম্মত হওয়ার কারণ:

পাকিস্তানের মুফতী হযরত মুফতী শফী সাহবে রহ.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ (سورة آل عمران-110)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় নিজ তাফসীর গ্রন্থে লিখেন:-

এ আয়াতে মুহাম্মাদ সা. এর উম্মত শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, সৃষ্টির প্রতি কল্যাণ পৌছানোর জন্যা এদের অস্তিত্ব হয়, আর সবচেয়ে এবং চারিত্রিক কল্যাণ সাধনের পথে প্রচেষ্টা করা খোদ প্রদত্ত দায়ীত্ব এবং সবচেয়ে বেশি সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের পূর্ণতা এই উম্মতের মাধ্যমে হয়েছে যদিও সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের দায়িত্ব পূর্ববর্তী উম্মতের উপরও ছিল যার বিস্তরিত বিবরণ সহীহ হাদীসগুলোতে উল্লেখ আছে কিন্তু প্রথমত হল, পূর্ববর্তী অনেক সৎকাজের আদেশও অসৎ কাজের নিষেধ শুধু অন্তর এবং যাবান দ্বারা হত আর মুহাম্মাদ সা. উম্মতে এর (আদেশ-নিষেধের) তৃতীয় ধাপ হাতের দ্বারা সৎকাজের আদেশ ও আর যার মধ্যে জিহাদের সকল প্রকার অন্তর্ভক্ত। এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়েগের দ্বারা ইসলামের বিধি-বিধান বাস্তবায়নও তার একটি অংশ। (মাআ'রেফুল কোরআন ২/১৫০)

নিখিল ভূবনের শ্রেষ্ঠমানের উম্মত তাই এ উম্মত সর্বসেরা, কারণ তাদের দাওয়াতের পশ্চাতে আছে তারবারী ক্ষমতা।

সৃষ্টির সেরা জীব তারা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি

তলোয়ারের শক্তি যাদের দাওয়াতী কাজের সাথী।

সমাধান -২

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ এর তাফসীরে হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা শুনুন।

قَالَ خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ تَأْتُونَ بِهِمْ فِي السَّلَاسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ

الصحيح البخارى: 654/2 بَاب { كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ }

মুনুষের মধ্যে অন্যের হকের ব্যপারে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে, কাফেরদের গর্দানে কিল পড়িয়ে বন্ধি করে নিয়ে আসে, অবশেষে ঐ সকল কাফের (তাদের এই কাজের বরকতে) ইসলাম গ্রহন করে নেয়।

সমাধান -৩

এই আয়াতে কারিমায় نهي عن المنكر ও أمر بالمعروف আলোচনা করা হয়েছে। অথচ প্রচলিত দাওয়াত ও তাবলীগের মধ্যে أمر بالمعروف ও نهي عن المنكر নেই। বরং রয়েছে কিছু আবেদন ও অনুরোধ। যাকে আয়াতের মেসদাক সাব্যস্ত করা সংশয় থেকে খালি নয়। বিস্তারিত যানার জন্য দেখুন : আমর নাহী অধ্যায়।

সামধান -৪

এ আয়াতের দুটি অংশ এক. সৎ কাজের আদেশ।

দুই. অসৎ কাজের নিষেধ। দাওয়াতে তাবলীগের লোক শুধু মাত্র এক অংশের উপর আমল করে, তাও এমন অবস্থা যে যদি তাদের এ কাজকে সৎকাজের আদেশ মেনে নেয় হয় কিন্তু তা ‘সৎকাজের আদেশ হওয়ার ব্যপারে সংশয় আছে।

লক্ষণীয়:

এসকল কথার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, আমি দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের উপকারীতা বা গুরুত্বকে অস্বীকার করছি। বরং দাওয়াত ও তাবলীগের উপকারীতা ও গুরুত্বের অবশ্যই স্বীকার করি। কারণ পূরো জগতে এ মোবারক কাজের সুফল ও ফায়েদা খোলা চোখেই অনুধাবন করা যাচ্ছে। এবং এর উপকারীতা ও সফলকে অস্বীকার করা অতি বাড়াবাড়ি। কিন্তু এর দ্বারা কোন ফরজ হুকুমের হেয় বা ছোট করাও কঠিন বিষয় কেননা আমার শরীয়তের সকল আমলে স্তরভিত্তিক পার্থক্যের বক্তা।

সংশয় -৮

প্রারম্ভিকা :

শরীয়তের অহকাম দুই ধরনের। কিছু তো আছে মৌলিকভাবে ভাল। যেমন: আল্লাহ তা'য়ালার যিকির, নামাজ উত্যাদী। কেননা এতে অক্ষমাত, বিনয়ী, অনুগ্রহকারী কৃতজ্ঞতা আছে যা মৌলিকভাবেই ইবাদত। আর ধরণের অহকামকে "হাসান লি আইনিহি" মৌলিক ভাবে ভাল) বলে।

আর দ্বিতীয় প্রকার হল: আহকাম যেগুলো সত্বাজাত ভাবে কল্যাকর নয়। তাতে বাহ্যিক কোন নেই বরং তা শরীয়তের অন্য কোন হুকুমের মধ্যেম হয় যার মূল্যটাই কল্যাণকর। যেমন; অযু, বার বার অযু করার এবং হাত মুখ পরিস্কার থাকা সত্ত্বেও অযু করলে পানির অপচয় হয় ।এরং পানি না থাকলে তায়াম্মুম করার দ্বারা তো ধূলায় ধূসরিত হয়ে যায়, কিন্তু যেহেতু এগুলো নামাজের মাধ্যম (অর্থাৎ নামাজ আদায়ের জন্য এগুলোর প্রয়োজন হয়) যার মূলটাই ভাল, এজন্য পবিত্র শরীয়ত এগুলোর মধ্যেও ভাল গন্য করে নিয়েছে। আর এ ধরনের আহকামকে 'হাসান লি গাইরিহি' (অর্থাৎ অন্যের কারণে কল্যাণকর) বলে।

উদ্দেশ্য:

জিহাদের মূলে কোন কল্যাণ বা সুন্দর্য নেই, কেননা জিহাদের রক্ত প্রবাহিত হয় সম্মানিত মানুষকে হত্যা করা হয়, এবং মানবাঙ্গকে টুকরা টুকরা করা হয় যার দ্বারা মানবতাকে হেয় করা হয়, আবাদী অনাবাদীতে পরিবর্তন হয়ে যায়, স্বামীর ভালবাসেক জলাঞ্জলি দিতে হয়, বাচ্চারা ইয়াতিম হয়, এতো কোন কল্যাণকর কথা নয়। কিন্তু যেহেতু এটা ইসলাম প্রচারের মাধ্যম, আর ইসলামের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটাই কল্যানকর। এজন্য জিহাদও কল্যাণকর গন্য করা হয়েছে। সুতরাং মূল বিষয় ইসলামের প্রচারের জিহাদের নয়।

দাওয়াতে তাবলীগের যে কাজ চলছে তার পূরোটাই ইসলামের প্রচার এবং এটা হাসান লি আঈনিহি অর্থাৎ এটার মূলে কল্যাণই আছে, আর জিহাদ হল ইসলাম প্রচারের মাধ্যম এবং এটা হাসান লি গাইরিহি অন্যের কারনে কাল্যাণ মেনে নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যেহেতু দাওয়াত ও তাবলীগ ইসলামের সবচেয়ে উঁচু হুকুম পালন করছে তাই জিহাদের ফযীলতের আসল এবং সর্বপ্রথম উপযুক্ত ব্যক্তি এসকল লোকই (দাওয়াত ও তাবলীগের লোক)।

সুতরাং দাওয়াত ও তাবলীগের লোকেরা যদি জিহাদে না যায় তাহলে জিহাদ ছাড়ার শাস্তির আওতাধীন হবে না। এবং তাদেরকে জিহাদ পরিত্যগকারীও বলা যাবে না। বরং দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ ছেড়ে জিহাদে যাওয়া তো বড় কাজ ছেড়ে ছোট কাজের দিকে (যাওয়া) আসল ছেড়ে শাখার দিকে এবং হাসান লি আইনিহি ছেড়ে হাসান লি গায়রিহির দিকে যাওয়ার নামন্তর।

সামধান -১

শরীয়তের সকল আহকামেই কল্যাণকর বিদ্যমান, কোনটার মধ্যেই দোষ-ত্রুটি নেই। আর ফুকাহায়ে কেরাম আমাদের মত নগন্যদের জন্য হাসান লি আইনিহি এবং হাসান লি গায়রিহির প্রকারভেদ করে দিয়েছেন, যাতে আমরা শরীয়তের প্রত্যেকটি হুকুমের স্তর ও মর্যাদা অনুধাবন করতে পারি, এবং প্রত্যেকটিকে স্তর অনুযায়ী গুরুত্ব দেই। কিন্তু এর কোন একটিকে হেয় প্রতিপন্ন করা ঈমান ধ্বংসের কারণ হিসেবে যথেষ্ঠ।

সমাধান -২

এ ব্যপারে তো কোন সন্দেহ নেই যে জিহাদ হাসান লি গায়রিহি কিন্তু দাওয়াত ও তাবলীগ হাসান লি আইনিহি নয় বরং হাসান লি আঈনিহি হল এলায়ে কালিমাতুল্লাহ আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা। আর জিহাদ আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার মাধ্যম হয় যেমনটা হাদীসে স্পষ্ট আসে যে,

عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز و جل)

- صحيح البخارى:394/1 باب من من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. رقم الحديث:2810 - صحيح مسلم:139/2 باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رقم الحديث:4882 - مسند أحمد :508/14 رقم الحديث:19435

যে আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য জিহাদ করল সে আল্লাহর রাস্তায় আছে। (বুখারী, মুসলিম)

এজন্য শুধু একথার উপর ভিত্তি করে জিহাদ থেকে দুরে থাকা যে, জিহাদ হাসান লি গায়রিহী এবং বর্তমানে প্রচলিত তাবলীগের উপর এ ভিত্তিতে ক্ষ্যন্ত থাকা যে তা হাসান লি আইনিহি অতপর আর আগে বেড়ে জিহাদের গুরুত্বকে নি:শ্বেস করা ও জিহাদ পরিত্যাগ অপরাধকে না মানা বরং খুশি হওয়া এবং এভেবে বগল দাবানো যে,ক্ষত-বিক্ষত ও নিহত হওয়া থেকে জান বেঁচে গেছে আর মুজাহিদদের সকল ফযীলত বরং তার চেয়েও বেশি ফযীলত অর্জন হয়ে গেছে।এতো বড় ধরনের জুলুম এবং নিজেকে ধোকায় ফেলার নমান্তর।

সমাধান -৩

জিহাদ যদিও হাসান লি গায়রিহি (অন্যের কারণে তাতে কল্যাণ মেনে নেয়া হয়েছে।) কিন্তু এর দ্বারা জিহাদের গুরুত্ব তো শেষ হয়ে যায়নি, কেননা এটার উপর আল্লাহর দ্বীন সমুন্নত করা নির্ভরশীল। উদ্দেশ্য যত উচু হয় তা যার উপরে নির্ভরশীল তার গুরুত্বও তেমন বাড়ে। আর যার উপরে কোন বস্তু নির্ভরশীল হয় তা ভিত্তি প্রস্তরের মর্যাদা রাখে। এবং কোন বিল্ডিং বা প্রাসাদ ভিত্তি প্রস্তর ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

উদাহরণঃ

যদি কোন ব্যক্তি একটি বিল্ডিং দাড় করাতে চায় মরমর পাথর আর কাঁচের উপর কিন্তু ভিত্তিতে কংক্রিট লোহাকে শুধু একরণে দেয়নি যে, আমার ঘর তো মরমর পাথরের যা খুব সুন্দুর আর এ লোহা ও কংক্রিটগুলো তো নিম্নমানের জিনিস আমি এগুলোকে আমার ভিত্তিতে কেন ব্যবহার করবো?

তো এ ব্যক্তিকে বলা হবে যে, হে আহমাক! যদি নিজের ঘর মজবুত করতে ও দীর্ঘস্থায়ী করতে চাও তাহলে এ কংক্রিট ছাড়া বানানোর চিন্তা করোনা। তানাহলে তোমার এ বাড়ী হালকা ঝাঁকুনিও সইতে পারবে না। অনুরূপ ভাবে ইসলামের ভিত্তিতে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ প্রবাহিত রক্ত এবং শরীরের টুকরা যদি ও স্বভাব তা অপছন্দ করে না হত তাহলে ইসলামের দালান অনেক দুর্বল হতো। কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী সা. নিজের চাচা শহীদানের সর্দার হযরত হামজা রা. মুসআব ইবনে উমায়ের রা. মত শাহাজাদাদের রক্তের উপর ইসলামের ভিত্তিস্থাপন করেছেন। তারপর ইসলাম যিন্দা হয়েছে এবং যিন্দা থাকাবে ইনশাআল্লাহ!

বাহ্যত হয় তিক্ত যদিও ভিতরে মিষ্ট স্বাদ

যে যাই বলুক আসলে পছন্দই জিহাদ

অথবা

দেখতে মাকাল কিন্তু সেটা মিষ্ট মুধুর ফল

বাস্তবে ভাই জিহাদ খোদার পছন্দের আমল।

সমাধান -৪

দেখুন! অযু তো হাসান লি গায়রিহি এবং তা নামজের মাধ্যম। এখন যদি কোন ব্যক্তি একথা বলে যে, আমার শরীর তো পরিষ্কার আছে, মাত্র গোসল করেছি। যদি সামান্য বায়ূ বের হয় তাতে কী হয়েছে! অযুর উদ্দেশ্য তো শরীরের পরিচ্ছনতা এবং প্রবিত্রতা তাতো আমার (অর্জন) আছে। সুতরাং আমি অযু করি না। তো এখন কি তার নামাজ গ্রহনযোগ্য হবে?

না হবে না, কখনো হবে না। কেননা অযু যদিও হাসান লি গায়রিহি কিন্তু নামাজ তার উপর নির্ভরশীল। যতক্ষণ পর্যন্ত যার উপর নির্ভর করা হয় তা অর্জন হবে না। তদ্রুপ যদি জিহাদ না হয় তাহলে কসম ঐ খোদার যিনি এ উম্মতের উপর জিহাদ ফরজ করেছেন। আল্লাহর দ্বীন কশ্মিনকালেও বিজয়ী হবে না।

সমাধান -৫

জিহাদ ব্যতিত আজ পর্যন্ত আল্লাহর দ্বীনের উঁচু হয়েছে, না কিয়ামত পর্যন্ত হবে। কিছু মানুষ কলিমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়া এবং মুসলমানের ন্যায় নামাজী ও রোজাদার বরং যথাসম্ভব শরীয়ত ওয়ালা হওয়ালা হওয়ার নাম আল্লাহর দ্বীনর সমুন্নত দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ইসলামের বিজয় হওয়া, অর্থাৎ ইসলামী আঈন বিজয়ী হওয়া, এবং শরীয়তের আহকাম প্রয়োগ হওয়া।

সারকথা হল, কিছু লোক মুসলমান হয়ে যাওয়া অথবা কিছু লোক দ্বীনদার হয়ে যাওয়া ভিন্ন বিষয়, আর মুসলমান হয়ে যাওয়া অথবা কিছু লোক দ্বীনদার হয়ে যাওয়া ভিন্ন বিষয় আর মুসলমান মুসলমান হিসেবে বিজয়ী হওয়া। এবং আল্লাহর আঈনকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ মহলে বাস্তবায়ন হওয়া আরেক বিষয়।

সুতরাং দুনো বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য না করা এবং পার্থক্য না বুঝা বড় মূর্খতা এবং অজ্ঞতা বৈ কিছু নয়।

আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন!!

উদাহরণঃ-

কোন এক এলাকায় একজন শাসক থাকে এবং সে এলাকায় লাখো মানুষের উপর তার ক্ষমতাও আছে, শাসক ব্যক্তিটি কফের আর তার জনগন সকলেই মুসলমান যারা নামজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, যিকির-আযকার, সব আদায় করে। এখন কি আপনি বলবেন এখানে মুসলমান বিজয়ী এবং দ্বীনের বিজয়ী অর্জন হয়েছে?

কখনো না! কেন? কারণ স্পষ্ট, আর তা হল, যখন ঐ লাখো মুসলমানের উপর শাসক কাফের এবং আঈন-কানূন ও কফেরদের বাস্তবায়ন হয়, তখন ইসলামের বিজয় কীভাবে অর্জন হয়? বরং এটা তো ঐ এলাকার মুসলমানদের জন্য অপমান এবং লাঞ্চনা যে, সংখ্যায় লাখ হওয়া সত্বেও একজনের সামনে অসহায়।এর বিপরিত যদি কোথাও শাসক মুসলমান হয় আর তার অধীনে লাখো কাফের থাকে যারা নিজেদের ধর্মের উপর আমল করে। কিন্তু আঈন-কানুন বাস্তবায়ন হয় ইসলামী এবং তারা এমন কোন বিশৃঙ্খলাও করতে পারে না যার অনুমতি শরীয়তে যিম্মিদেরও দেয়না তাহলে বলতে পারবেন যে, এখানে মুসলমান যদিও অল্প বা একদমই নেই কিন্তু ইসলাম বিজয়ী এবং আল্লাহর দ্বীন সমুন্নত হয়েছে।

সারকথাঃ

উসূলে ফেক্হার কিতাবে ফুকাহায়ে কেরাম একথা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে,

الجهاد حسن بواسطة دفع شر الكفرة وإعلاء كلمة الحق – أصول الشاشي

কাফেরদের অনিষ্ট দমন করা এবং আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার মাধ্যম হিসেবে জিহাদ কল্যাণকর।

জিহাদের উদ্দেশ্য হল, কাফেরদের অনিষ্ট প্রতিহত করা এবং সত্য বাণী অর্থাৎ ইসলামের বিজয়, এখন নিজেই ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখুন, এ দুই বিষয় অর্থাৎ

কাফেরের অনিষ্ট দূর করা এবং ইসলামের বিজয় জিহাদ ছাড়া অন্য কোন পথে হচ্ছে, না হওয়া সম্ভব ! অবশেষে আমরা যতই তাবলীগ করি আখলাক পরিশুদ্ধ হয়ে যায়, আমাদের অন্তরে দ্বীন নিশ্চিন্ন হয়ে যাওয়ার দরদ যতই সৃষ্টি হয় আমরা কি সবক্ষেত্রে রাসূল সা. এবং সাহাবায়ে কেরামগণের আগে বাড়তে পারবো? না,না, কখনো না। সুতরাং যখন তাঁদের মত ব্যক্তিদেরও তরবারী ধারণ করতে হয়েছে, তখন এটা কিভাবে সম্ভব যে, তরবারী ধারন করা ব্যতিত কফেরদের অনিষ্ট দূর করে ফেলব এবং ইসলামকেও বিজয়ী করব। ফুকাহায়ে কেরাম একথা ও স্পষ্ট ভাবে বলেছেন:

لولا الكفر المفضى إلى الحرب لا يجب عليه الجهاد – أصول الشاشى

অর্থাৎ যখন এমন কুফুর যা যুদ্ধের কারণ হয় তা না থাকে তাহলে জিহাদও ফরজ থাকে না। এখন চিন্তা করুন আজ কুফুর যুদ্ধের কারণ বা হেতু হয়, তা কি শেষ হয়ে গেছে? যে, আমরা জিহাদ ছেড়ে দিব? যখন এমন নাপাক কুফুর বিদ্যমান আছে। ইসলাম ও আল্লাহর নিদর্শনগুলোকে হেয় প্রতিপন্ন করছে, মুসলমানদের ইজ্জত নিয়ে খেলা করছে, এবং সম্মানের হানি করছে তখন কুফুর থাকা সত্বেও অপনি একথা বলতে পারবেন যে, আমরা জিহাদ না করেও জিহাদের ফুযিলত অর্জন করছি? এজন্য যতক্ষণ পর্যন্ত কাফেররা অনিষ্ট থেকে বিরত না হবে, জিযিয়া দিয়ে জীবন অতিবাহিত না করবে,এবং ইসলাম বিজয়ী না হবে, আল্লাহর আঈন বাস্তবায়ন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ শেষ হবে না। আর প্রচলিত দাওয়াত ও তাবলীগের জিহাদ থেকে অধিক ফযিলত তো দূরের কথা জিহাদের বরাবর মনে করা স্পষ্ট ভ্রান্তি, মূর্খতা এবং অজ্ঞতা (বৈ কিছু না)।

ফায়েদা :

উসুলে ফেকহার কিতাবে ফুকাহায়ে কেরাম একথা বলে দিয়েছেন যে, অযু ও জিহাদ ভিন্ন কারণে কল্যানকর। কিন্তু উভয়ের মাঝে পার্থক্য আছে, আর তা হলো

অযুর কল্যাণ নামাজের কারণে। আর অযুর পর নামাজ আলাদা অদায় করতে হয়। শুধু অযু করার দ্বারা নামজ আদায় হয় না।

কিন্তু জিহাদের মধ্যে কল্যাণ আল্লাহর দ্বীন সমুন্নত করার করণে, আর জিহাদের পর আল্লাহর দ্বীন আপনা আপনি সমুন্নত হয়ে যাবে। এজন্য আমাদের আবেদন! আল্লাহর দ্বীন সমুন্নত করার ব্যাখ্যা নিজেদের পক্ষ থেকে না করে শরীয়ত যে ব্যাখ্যা করেছে তা বর্ণনা করুন যা শরীয়তে বলেছে। আল্লাহ আমাদের হক্ব বলার, হক্বশুনার, হক্ব বুঝার এবং হক্বের উপর আমল করার তৌফিক দান করেন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন!!

সংশয় -৯

عن فضالة بن عبيد ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ....والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز و جل.

- مسند أحمد: 24013 - سنن الترمذى: 2627 - سنن النسائى: 4995 باب صفة المؤمن

(প্রকৃত মুজাহিদ ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর অনুগত্যে তার নফসের সাথে জিহাদ করে) এই হাদীসে নফসের সাথে জিহাদকে জিহাদ বলে ব্যক্ত করেছে, বরং একটু বাড়িয়ে বলেছে যে, মুজাহিদ সেই ব্যক্তিই যে নিজের নয়সের সাথে জিহাদ করে। অঅসল ও উর্দ্ধ পর্যায়ের জিহাদ হল নফসের সাথে জিহাদ করা। ক্বীতাল নয়। এই জন্য শুধু ক্বীতালকে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বলা ঠিক নয়।

সমাধান -১

হাদীস শরীফের মর্ম হল, আসল ও প্রকৃত মুজাহিদ ঐ ব্যক্তি যে তার নফসকে আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্য ও অনুগামীতে রেখে দিয়েছে। অর্থাৎ জিহাদ তখনি জিহাদ হবে যখন শুধু আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টির জন্যই করা হবে। যদি অন্য কোন উদ্দেশ্যে জিহাদ করা হয় যেমন জাতীয়তার জন্য স্বদল প্রীতির জন্য দেশাত্মবোধের জন্য লোক খোনের জন্য প্রসিদ্ধির জন্য তাহলে কখনই জিহাদ হবে না।

যেরূপ এই হাদীসের মধ্যে في طاعة الله (আল্লাহর অনুগত্ব্য) শব্দমালা এনে এর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এ বিষয়টা পরিপূর্ন এমনি। যেমনটি এক দুই রেওয়ায়েতে রয়েছে। যে, হযরত মুসা রা. বলেন: এক ব্যক্তি রাসূল সা. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল: হে আল্লাহর রাসূল স. এক ব্যক্তি গণিমতের জন্য যুদ্ধ করে। দ্বিতীয় জন প্রসিদ্ধতা ও লোক দেখানোর জন্য যুদ্ধ করে তাদের মধ্য হতে কে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে।

রাসুল সা. বললেন:

عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز و جل)

- صحيح البخارى:394/1 باب من من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. رقم الحديث:2810 - صحيح مسلم:139/2 باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رقم الحديث:4882 - مسند أحمد :508/14 رقم الحديث:19435

যে আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য যুদ্ধ করে সেই আল্লাহর রাস্তায় রয়েছে।

সমাধান -২

যদি হাদীসের মর্ম এটা নেওয়া হয় যা সাধারনত নেওয়া হয়ে থাকে। অর্থাৎ কামেল মুজাহিদ সেই যে নিজের নয়সের বিরুদ্ধে জিহাদ করে। তাহলে তুমি নিজেই চিন্তা করো যেভাবে একজন মুজাহিদ নিজের নফসের সন্তানাদী, প্রিয়জন, অত্মীয়-স্বজন থেকে দূরে থাকা এমনকি নিজের সন্তানদেরকে যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যু মুখে পতিত করা। এবং উত্তপ্ত গরম, প্রচন্ড ঠান্ডায় যুদ্ধ কালিন ভিতিকর পরিস্থিতির মাঝে নামাযের গুরুত্ত দেওয়া ঘরহীন হয়ে নিজেকে বসবত করে শরীয়তের বিধি-বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখা। নিজের সবচেয়ে দামী জিনিস জানকে শংকায় ফেলে আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসন্ধান করা, কোন জিনিস কি উহার দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারে? (কখনো না) তাহলে এক জন মুজাহিদই সবার চেয়ে আগে বেড়ে নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে।

রক্তের ধারা গতিহারা হলে

ফাসাদ বৈ ছাড়বে কি?

আত্মার জিহাদের লক্ষ্য তো শুধু

স্বশস্ত্র জিহাদই।

সমাধান -৩

যদি হাদীসের মর্ম এমন নেওয় হয় যে, কামেল মুজাহিদ ঐ ব্যক্তি যে নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে অর্থাৎ যুদ্ধের মাঠ উত্তাপ আর মুসলমানদের ইজ্জতে, জান-মালে, মা-বোনদের সম্মানে, স্বতীত্বে, শংকা পতিত হয় এবং মুসলমানদের প্রয়োজন থেকেও পালায়ন করে। শরীয়ত ময়দানে আসার আহবান জানায় আর হযরত নিজের রুমের দরজা খোলারও নিয়ত করে ন। যে, আমারা নফসের ইসলাহ করছি। তাহলে চিন্তা করো। ইনসাফ করো। সত্য বলো। আর ফায়সালা করো এটাকি নফসে আম্মারার খারাবী নাকী নফসের গোলামী। তাহলে এটা কত বড় অভিসপ্ত ইবলিসের ধোঁকা। আল্লাহ আমাদের সকলকে উহা থেকে হেফজত করুক। আমীন!!!

সমাধান–৪

যদি কেউ ঈমানের রোকন সমূহের ও স্বীকার না করে এবং ইহা বলে যে, মুমিন হওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালার সত্ত্বা, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত, ফেরেশতা, কিয়ামত, তাকদীর, কবরের আযাবের উপর বিশ্বাস স্থাপনের প্রয়োজন নেই বরং প্রকৃত মুমিন তো সেই, যার থেকে মানুষের জান মাল নিরাপদ থাকে। আর দলীলের জন্য এই হাদীস পেশ করেঃ

..... والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم......

(অনুবাদঃ প্রকৃত মুমিন হল ঐ ব্যক্তি যার থেকে মানুষের জান মাল নিরাপদে থাকে) আবার কেউ কালেমায়ে তাইয়্যিবা স্বীকার করে না । আর একথা বলে যে, মুসলমান হওয়ার জন্য ইসলামের রোকন সমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার প্রয়োজন নেই। বরং প্রকৃত মুসলমান হল ঐ ব্যক্তি যার জবান ও হাত থেকে লোকেরা নিরাপদে থাকে। আর দলীল হিসাবে এই হাদীস পেশ করেঃ

....المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.......

অনুবাদ প্রকৃত মুসলমান হল ঐ ব্যক্তি যার হাত ও জবান থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদে থাকে । আবার কেউ আল্লাহর দ্বীনের জন্য নিজের দেশ পরিত্যাগকারীদের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্বকে অস্বীকার করে এই বলে যে, প্রকৃত মুহাজির তো সেই ব্যক্তি যে গুনাহ বর্জন করে। আর দলীল হিসেবে এই হাদীস পেশ করে:

....والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب....

অনুবাদ: প্রকৃত মুহাজির ঐ ব্যক্তি যে গুনাহ সমূহ বর্জন করে।

এখন তুমি এমন বদ আকীদা ও বেদ্বীন লোকদের ব্যাপারে কি বলবে?

সুস্পষ্ট যে, এই সব বাক্য সমূহের মর্ম হল মুমিনের জন্য আবশ্যক হল, সঠিক আক্বীদা বিশ্বাসের সাথে সাথে বান্দার হক আদায়কারী মুসলমানদের জন্য বান্দার হক্ব আদায় করা থেকে উদাসিন না হওয়া উচিৎ। এবং আল্লাহর দ্বীনের সার্থে নিজের মাতৃভূমি, দেশ ত্যাগকারীর জন্য গুনাহ ছাড়া উচিৎ তেমনিভাবে আল্লাহ রাস্তায় যুদ্ধকারীকেও শরীয়তের বিধানাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিৎ।

এ ব্যাপারে পূর্ণ হাদীস এই যা বরকত ও ফায়দার জন্য লেখা হল:

عن فضالة بن عبيد ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : في حجة الوداع الا أخبركم من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز و جل.

- مسند أحمد: 24013 - سنن الترمذى: 2627 - سنن النسائى: 4995 باب صفة المؤمن

হযরত ফুযালা ইবনে উবায়দ রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সা. বিদায় হজ্বে বলেছেন: আমি কি তোমাদেরকে প্রকৃত মুমিনের ব্যাপারে সংবাদ দিবো না? প্রকৃত মুমিন ঐ ব্যক্তি যার অনিষ্ট থেকে মানুষের জান-মাল নিরাপদে থাকে। প্রকৃত মুজাহিদ

ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর আনুগত্যে নিজের নফসের সাথে জিহাদ করে। আর প্রকৃত মুহাজির ঐ ব্যক্তি যে গুনাহ সমূহ বর্জন করে।

বিশেষ ফায়েদা:

(নফসের জিহাদের বাস্তবতা এবং একটি প্রতারনা) নফসের সাথে জিহাদ করার অর্থ হল এই যে, নিজের নফস ও জীবন নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে আদা নুন খেয়ে নামা। যেমনিভাবে মালের সাথে জিহাদ করার অর্থ হল, নিজের মালকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা। আয়াতে লক্ষ্য করুন:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ (سورة الأنفال-72)

অনুবাদ : নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে.......

আর হাদীস শরীফে আসছে:

القتلى ثلاثة رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله

- **صحيح لإبن حبان** : 168/10 ذكر البيان بأن الأنبياء لا يفضلون الشهداء إلا بدرجة النبوة فقط رقم الحديث : 4663

(নিহত তিন শ্রেনির এক. মুমিন যে নিজের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে।) কুরআন ও হাদীসের যেখানেই جهاد بالنفس (জিহাদ বিন্ নফস) ও جهاد بالمال (জিহাদ বিল মাল) এসেছে সেখানে এই অর্থই উদ্দেশ্য। কিন্তু সম্প্রতি جهاد بالنفس (জিহাদ বিন নফস) এর অর্থ ব্যপকভাবে এটা নেওয়া হয় যে, নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করো। নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করো।

নফসের চাহিদার বিরুদ্ধে জিহাদ করো। কিন্তু এই ব্যক্ষ্যা جهاد بالمال (জিহাদ বিল মাল) এর ক্ষেত্রে কেন করা হয় না। হায়! বর্তমান যুগের কোন বিচক্ষন ব্যক্তি এই দর্শনের উপর দৃষ্টি দিতো।

সংশয় -১০

قدم على رسول الله صلى عليه وسلم قوم عزاة فقال قدمتم بخير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر قيل وما الجهاد الأكبر مجهادة العبد هواه ،

অর্থ: নবীজি সা. এর নিকট একদল মুজাহিদ আগমন করলেন তখন নবীজি বললেন: তোমরা জিহাদে আসগার থেকে জিহাদে আকবার এর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছ। কেহ জিজ্ঞাসা করলো জিহাদে আকবর কি? নবীজি সা. বললেন: নিজ খাহেশাতের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। (তাফসিরে কাশশাফ)

এ বর্ননায় নবীজি সা. আপন যবান মুবারকে মুজাহাদা ও আত্বশুদ্ধিকে শুধু জিহাদই বলেননি বরং জিহাদে আকবর বলেছেন। এতো স্পষ্ট বর্ননা থাকতে জিহাদের অর্থ শুধু ফী সাবীলিল্লাহ বলা কোন ভাবেই সঠিক নয়।

সমাধান -১

আসুন আমরা খুব সংক্ষেপে একটি জরিপ করি যে, মুহাদ্দিনে কেরাম এই বর্ননার ব্যপারে কি বলেছেন। মুখতাসার প্রনেতা আল্লামা পাটনি রহ. বলেন:

رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ضعيف ـ تذكرة الموضوعات

এই বর্ননাটি জইফ দুর্বল। (তাজকিরাতুল মাওজুআত)

আল্লামা শাসুদ্দিন যাহাবী রহ. বলেন: ইহা হাদিস নয় বরং মুহাম্মাদ ইবনে আবালা এর বাণী। (সিয়ারু আলামিন নুবালা)

محمد بن زياد يقول : سمعت إبن أبى عبلة وهو يقول لمن جاء من الغزو قد جئتم من الجهاد الإصغر إلى الجهاد الأكبر جهاد القلب ـ سير أعلام النبلاء جـــــ6

মুফতীয়ে বাগদাদ আল্লাম আলুছি রহ. বলেন: এ বর্ণনাটির কোন ভিত্তি নেই। (রুহুল মাআনি) والحديث الذي ذكره لا أصل له ـ روح المعاني جـــــ3

আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা রহ. বলেন: এ বর্ণনাটির কোন ভিত্তি নেই।

أما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزوة تبوك : رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر فلا أصل له.

সমাধান -২

এ কথাটিকে যদি হাদীস বলে ধরে নেয় হয়, তাহলে কোরআনে কারীমের নিম্নক্ত আয়াতটির বিপরিত হয়ে যায়। অথচ কোরআন ও হাদীসের মাঝে বৈপরিত্ব অসম্ভব। সুতরাং ইহা বলতেই হবে যে, বর্ণনাটি হাদীস নয়।

দেখুন আল্লাহ তা’য়ালা বলেন:

فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً (سورة النساء-95)

অর্থ: নিজদের জান ও মাল দ্বারা জিহাদকারীদের মর্যাদা আল্লাহ্ বসে থাকা লোকদের উপর অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন।........

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَائِزُونَ (سورة التوبة -20)

অনুবাদ: যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, আর আল্লাহর পথে নিজদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করেছে, আল্লাহর কাছে তারা বড়ই মর্যাদাবান আর তারাই সফলকাম।

যদি উপরোক্ত বানীকে হাদীস বলে ধরে নেয়া তাহলে শরীয়তের অতিগুরুত্বপূর্ণ ফরজ বিধান জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহকে ছোট করা আবশ্যক হয়ে হড়ে।

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে লুতফী আদদ্ধবা বলেন: এই হাদীসটি দূর্বল। বরং আল্লামা ইরাকীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাতিল। কেননা ইহা সর্বোচ্চ চুড়া বলেছেন। (আল আসরারুল মারফুয়া)

সমাধান -৩

এই বর্ণনার উপর একটি আপত্তি হলো যদি "رجوع " প্রত্যাবর্তন এর অর্থ হয় এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় স্থানান্তর হওয়া। তাহলে এই বর্ণনার দ্বারা উদ্দেশ্য এটা সাব্যস্ত হবে যে, নবীজি সা. এরশাদ করেছেন: তোমরা জিহাদে আসগর থেকে অর্থাৎ এমন ক্বিতাল থেকে ফিসে এসেছ যার মধ্যে অত্বশুদ্ধি ও নফসের মুজাহাদা ছিলনা। আর এসেছ এমন জিহাদে আকবর অর্থাৎ এমন আমলের দিকে যার মধ্যে আত্বশুদ্ধি ও মুজাহাদায়ে নফস রয়েছে।

এখন খেয়াল করুন নাউযুবিল্লাহ এত সাহাবায়ে কেরামের কি পরিমান তুচ্ছ করা হলে এটা কি কারো কলিজা সহ্য করতে পারে? সাহাবায়ে কেরামের জিহাদ কি এমন

ছিল যে, তাতে কোন শরীয়তের সীমারেখা আত্মশুদ্ধি ও মুজাহাদার প্রতি কোন লক্ষ্য রাখা হত না। বরং মদিনায় এসে আত্মশুদ্ধি ও মুজাহাদার প্রতি নিমগ্ন হতেন? জিহাদের মধ্যে কি পরিমান মুজাহাদা হয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বরং নিহত করা। নিহত হওয়া আহত করা, আহত হওয়া থেকে বড় মুজাহাদা আর কি আর কি আছে?

কুরআনে কারীমের ভাষ্য অনুযায়ী।

كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ (سورة البقرة-216)

তোমাদের উপর লড়াইয়ের বিধান দেয়া হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়........

ইহা মৌলিক ও সত্তাগত ভাবে অপছন্দনীয়।

এখানে এমন কিছু ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হবে যার দ্বারা স্পষ্ট হবে যে, সাহাবায়ে কেরাম ক্বিতালের সময়ে কি পরিমান শরীয়তের পাবন্দী ও আত্মশুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখতেন।

(১) হযরত উবাদা ইবনে বশির রা. রাতে পাহারা দিচ্ছিলেন এমতাবস্থায় সক্রুর তির এসে তার শরীরে বিদ্ধ হয়। তিনি তখন নামাজ পড়ছিলেন। তখন নামজ ছাড়লেন না ইহা কি মুজাহাদায়ে নফস ছিলেন না।

(২) হযরত মুয়ায রা. বদরের দিন আপন কর্তিত হাত দিয়ে সারা দিন জিহাদ করছেন কর্তিত যখন সমস্য মনে হলো তখন পায়ের নিচে রেখে টান দিয়ে ছিড়ে ফেললেন ইহা কি মুজাহাদায়ে নফস নয় ? জিহাদে মশগুল হলেন ।

(৩) খন্দকের যুদ্ধে রাসূল সা. এর সাথে সাহবায়ে কেরাম পেটে পাথর বেধে কাজ করছেন। ইহা কি মুজাহাদায়ে নফছ নয়?

(৪) তিন সাহাবী মৃত্যুর কাছাকাছি হয়েও সাহাদাতের পেয়লা পান করলেন। পিপাশার তিব্রতা সহ্য করে অপর ভাইকে প্রধান্য দিলেন। ইহা কি মুজাহাদায়ে নফস নয়?

(৫) হযরত আলী রা. এক ইয়াহুদিকে ধরাশায়ী করলেন যখন শরীর থেকে গর্দান পৃথক করবেন তখন আলী রা. কে থুতু মারলেন, তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। এই ভেবে যে, এতে আমার ব্যক্তিগত রাগ এসে গেছে। ইহা কি মুজাহাদায়ে নফস নয়?

(৬) সারিয়্যাতুল আম্বারে সাহাবায়ে কেরাম একটি করে খেজুর প্রতিদিন গ্রহন করতেন। ইহা কি মুজাহাদায়ে নফস নয়?

উপরোক্ত কতিপয় ঘটনা প্রক্ষান্তরে হিসেবে পেশ করা হল, যাতে স্পষ্ট হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম জিহাদের মূল সময়ও ইখলাস মুজাহাদাও আল্লাহা সুবহানাহু তা'য়ালার প্রতি মনোনিবেশ সামান্য পরিমান গাফেল হতেন না। হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. এর বাণী: হযরত মাও মুফতী মুহাম্মাদ রাফি উসমানি সাহেব দা.বা. মুহতামিম দারুল উলুম করাচি লেখেন আমার সম্মানিত পিতা মুফতী আযম পাকিস্তান মুহাম্মাদ শফি রহ. বলতেন: যনৈক ব্যক্তি শাইখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান রহ. কে জিঞ্জাসা করল সুফিয়ায়ে কেরাম মুরিদদেরকে যেমন মুজাহাদ ও রিয়াজত করান নবীজি তো সাহাবায়ে কেরামদেরকে যেমন মুজাহাদা কখনো করান নি তবে কেন সুফিয়ায়ে কেরাম এমন করেন? হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. বলেন হুবহু শব্দ তো স্বরণ নেই শুধু বিস্তারিত বর্ণনা করছি। মূল কথা হলো তরিকতের মধ্যে মুজাহাদা ও রিয়াজত আসল উদ্দেশ্যে হয় না। বরং অভ্যন্তরিন আখলাকের সংশোধন উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যার সার কথা হলো আল্লাহ তা'য়ালার সাথে সম্পর্ক গড়ে যায় এবং দৃড় হয়। আর নফস যেন শরীয়তের অনুশারী হয়ে যায়। এই উদ্দেশ্যকে অর্যন করার জন্য নফসের চিকিৎসা স্বরুপ মুজাহাদা করানো হয়। যাতে নফস কষ্টও খাহেশতের বিরোধিতা করতে অব্যস্ত হয়। যখন এই অভ্যাস বৃদ্ধি পায় তখন শরীয়তকে মান সহজ হয়ে যায়।

এর পর শরীয়তের উপর আমল করার জন্য শুধু দিক নির্দেশনার প্রয়োজন দেখা দেয় যা মুর্শিদ আগাম দেয়। এই উদ্দেশ্যে নবীজির সাহয্যে জিহাদের মাধ্যমে সাহবায়ে কেরামের এত পরিমান অর্যন হতো যে, অতিরিক্ত কোন মুজহাদা বা রিয়াজতের প্রয়োজন থাকতো না। তারা এক জিহাদের মধ্যে সুলক ও তরিকতের এমন উচ্চ মাকাম ত্বয় করতেন যা হাজার হাজার বছর ধারে অন্যদের অর্যন করা সম্ভব নয়। কেননা জিহাদই একটি বড় মুজাহাদা। রুহানি ও বাতেনি উন্নত ও তায়াল্লুক মা'আল্লাহ এর জন্য পরশ পাথর।

একটি স্মরনীয় ঘটনা

সমাধান -৪

আমার ভালো করে মনে আছে যে, আজ থেকে সতের বছর পূর্বের কথা: যখন আমি জামে মসজিদ বুরহাওয়ালী শাখার মন্ডিতে পড়তাম তখন উস্তাদে মুহতারাম শাইখুল হাদীস ইমামে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত মাওলানা মুহাম্মাদ সাফরাজ খান সফদার সাকলের দরসে বলেন : رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر। এটাকে হাদীস বলে মেন নিলে এর উদ্দেশ্য হলো সাহবায়ে কেরাম এক গাজওয়া থেকে ফিরলেন। সেখানে অনেক আহত সাহাবী ছিলেন দৃর্ঘ দিন যবত ঘর থেকে দূরে ছিলেন এবং শহীদদের কারনে অন্তর ভারাক্রান্ত ছিলো। এমতাবস্থায় তার দ্বিতীয় বার জিহাদে ধাবিত হলেন। তখন রাসূল সা. বললেন: رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر তোমরা ছোট থেকে বড় জিহাদের প্রতি ফিরিতেছ। সুস্পষ্ট বিষয় হলো এখানে গাযওয়া সমুহের মধ্যে এক গাযওয়াকে বড় আর এক গাযওয়াকে ছোট বলা হয়েছে। সুতরাং এখন কোন আপত্তি থাকলো না।

জিহাদ আকবার তো হল স্বাধের প্রাণ বিসর্জন

জিহাদে আকবার তো হলো কুফুরের অনিষ্ট দমন।

জিহাদে আকবার:

এখন আসুন দেখি জিহাদে আকবারের বাস্তবতা কি এখানে বিস্তারিত আলোচনা না করে শুধু একটি বর্ণনা উল্লেখ করবো আল্লামা মোহাম্মাদ ইবনে আলী শাওকানী রহ. নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যক্ষায় লেখেন: وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِه এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বড় জিহাদ। আর তা হলো কফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। তাদেকে প্রতি হত করা যখন তারা মুসলমান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। (ফতহুল কাদির : ৩)

জিহাদে আকবার হলো প্রান উৎসর্গ কুফুরের বিনাশ। সংসয় । কিন্তু এই বর্ণনা উপর প্রশ্ন যাগে যে, ক্বিতালও গাযওয়ায়ে জিহাদে আকবার বলার দ্বারা অন্যান্য আমল সূমহ জিহাদ বলে সাব্যস্ত হবে। যদিও তা জিহাদে আসগর। সুতরাং আপনি যে জিহাদের অর্থ যে শুধু ক্বিতাল করছেন তা তিন খন্ড হয়ে গেল। পূর্বেই বলেছি যে, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ র অর্থ ক্বিতাল ফী সাবীলিল্লাহ কিন্তু কখনো যেহেতু সাদৃশ্যতার কারনে রুপক অর্থে অন্য আমলকে জিহাদ বলা হয়েছে। প্রকিত পক্ষে এর মধ্যে আসল জিহাদ যেহেতু ক্বিতাল ফী সাবীলিল্লাহ । এই কারনে তাকে কখনোও তাকে জিহাদে আকবার বলা হয়েছে।

কিন্তু ক্বিতাল ফী সাবীলিল্লাহকে জিহাদে আকবার বলার কারনে এই ভুল ধারনার স্বীকার হওয়ার কোন অবকাশ নেই যে, অন্যান্য আমলও ইসতিলাহি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এর মধ্যে দাখিল হয়ে যাবে। যেমন ইহরাম, তাওয়াফ, হলক, সায়ী এটা তো এমন যে, উমরার কিছু কিছু কাজ হজ্জের সাদৃশ্য হওয়ায় কখনো উমরাকে হজ্জে আসগর ও হজ্জেকে হজ্জে আকবার বলা হয়। যেমনই কুরআন শরীফে বলা হয়।

وَأَذَانٌ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ (سورة التوبة -3)

এখন যদি এই রুপক অর্থ ব্যবহার করার কারনে উমরাকে আসল হজ্জ বলে গন্য করে তাহলে তার আমল বুদ্ধি বিবেকের উপর মতামত করা ছাড়া আর কি করা যেতে পারে?

লতিফা : দ্বীনি মাদ্রাসা সমুহের শেষ ক্লাশকে দাওরায়ে হাদীস বলে। এর পূর্বের বছরটা হল মাওকুফ আলাইহ। কেননা দাওরা হাদীস এর বছর ঐ বছরের উপর মওকুফ। আর অনেক হযরত দাওরা হদীসের পূর্বের বছরকে মেশকাত জামাত বলে। কিন্তু পাখতুনের ছাত্ররা মাওকুফ আলাইহ হওয়ার মুনাসাবাতে একে ছোট দাওরা বলে।

সংশয় -১১

عن أبى سعيد الخدرى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر) أو (أمير جائر) .

- سنن أبي داؤود: 597/2 باب في الأمر والنهى . رقم الحديث:4344 - سنن إبن ماجة : 289 باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، - سنن الترمذى : 40/2 باب أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر،

"হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন: অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য ও ন্যায়ের কথা বলা নিশ্চয়ই সবচেয়ে বড় জিহদ"

উক্ত হাদীস শরীফে অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য বলাকে জিহাদ বলা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, মুখে সত্য কথা বলাও জিহাদ। সতরাং জিহাদের অর্থ শুধু অস্ত্রের যুদ্ধ নেয়া সঠিক নয়।

সামধান -১

মুহাদ্দিসীনে কেরাম একথা স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, বাদশাহর সমনে সত্য কথা বলা তখনই জিহাদ বলে বিবেচিত হবে যখন সত্য বলার কারণে মাথা কেটে ফেলার শুধু আশংকাই না বরং দৃঢ় বিশ্বাস হবে। বাস্তবতা হলো, অত্যাচারী বাদশাহর বিরুদ্ধে সত্য বলা জীবনের সমূহ আশংকার কারনেই জিহাদ।

সত্য প্রকাশ শ্রেষ্ঠ জিহাদ জালিম শাহির কাছে

প্রাণ বিনাশের সমূহ বিপদ সামনে যে তার আছে।

এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী তো উল্লেখিত হাদীসের অর্থ ও হত্যা করা এবং নিহত (শহীদ) হওয়া।

সামধান -২

আমরা একথা লিখে এসেছি যে, মুখের কোন কথা বা ভাষন যদি কিতালের সহায়ক হয় তাহলে তা কিতালের আংশ হিসেবেই গন্য হবে।

সমাধান -৩

আনেক সময় তীর-তরবারী চেয়ে মুখের কথাই কাফেরদের উপর বেশী প্রভাব ফেলে। আর এজাতীয় কথা নিঃসন্দেহে জিহাদ। কেননা মুখের কথা যখন কাফেরদের মনোবল দূর্বল করে যুদ্ধ থেকেই বিরত রাখে। আবার এই কথাই কখন মুসলমানদের মনোবল চাঙ্গা করে এবং তাদের আন্তর গুলোকে মজবুত করে কাফেরদের বিরুদ্ধে প্রেরণা যোগায়।

একটি জলন্ত প্রমান:

হযরত আনাস রা. বলেন: রাসূলসা. যখন “ওমরাতুল ক্বাযা” র জন্য মক্কা গমন করলেন তখন হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা রা. (গলায় তরবারী ঝুলিয়ে রাসূলসা. এর উটনীর লাগাম ধরে) আগে আগে চলতে ছিলেন। এবং এই কবিতা অবৃত্তি করতে ছিলেন।

عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بين يديه يمشي وهو يقول:

خلوا بني الكفار عن سبيله ،

اليوم نضربكم على تنزيله ،

ضربا يزيل الهام عن مقيله ،

ويذهل الخليل عن خليله
فقال له عمر يا بن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر .فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل.
- سنن الترمذى: 112/2 باب ما جاء في إنشاد الشعر. رقم الحديث:2856 - شمائل المحمدية للترمذي: 16باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر.

অর্থ:
"হে কাফেররা! সরে যাও, রাসূল সা. এর রাস্তা ছেড়ে দাও। রাসূল সা. এর পবিত্র মক্কায় আগমনে আজকে তোমাদেরকে এমন ধোলাই দিব যা শরীর থেকে মাথার খুপড়ী পৃথক করে দিবে। এবং বন্ধুকে বন্ধু থেকে দূরে সরিয়ে দিবে।

হযরত ওমর রা. বললেন: يا بن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر "হে ইবনে রাওয়াহা! তুমি মক্কায় রাসূল সা. এর সামনে (এমন) করিতা আবৃতি করছো? (যেন তিনি বিরত রাখতে চাইলেন) রাসূল সা. বললেন: خل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل"হে ওমর! তাকে বিরত রাখার চেষ্টা কর না। কেননা আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা রা. এর কবিতা আজকে কাফেরদের উপর তীরের চেয়ে কঠিন আঘাত করবে।"(শামায়েলে তিরমিযী)

অতএব এই পুরো আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, একটি হাদীসের কারণে প্রত্যেক হক্ব কথাকে আল্লাহর পথে "জিহাদ" বলা কোন ভাবেই ঠিক না।

সংশয় -১২

سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فاستأذنه في الجهاد فقال (أحي والداك) . قال نعم قال (ففيهما فجاهد)

- صحيح البخاري: 883/2 باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. رقم الحديث:5972 - مسند أحمد : 6858/11

"হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. বলেন: এক ব্যক্তি রাসূল সা. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি চাইল। তখন রাসূল সা. প্রশ্ন করলেন তোমার বাবা-মা কি জীবিত? সে বলল: জী হ্যাঁ! রাসূল সা. বললেন, তুমি বাবা-মার সেবা করে যুদ্ধ কর। অর্থাৎ তুমি গিয়ে মা-বাবার সেবা কর তোমার জন্য এটাই জিহাদ।"

এই হাদীসে মা-বাবার সেবা করাকে জিহাদ বলা হয়েছে। এতে বুঝা গেল, শুধু অস্ত্রের যুদ্ধই "জিহাদ" না, বরং মা-বাবার সেবা করাও জিহাদ?

সমাধান -১

এতে কোন সন্দেহ নাই যে, বান্দাদের "হক্বের" মধ্যে সব চেয়ে বড় "হক্ব" মা-বাবার সেবা করা। বাবার সন্তুষ্টিতে রবের সন্তুষ্টি বলা হয়েছে। মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের জান্নাত রাখা হয়েছে। সন্তানের সম্পদকে বাবার সম্পদ বলা হয়েছে। "শিরক" এর পর মা-বাবার অবাধ্যতাকেই সবচেয়ে বড় গুনাহ বলা হয়েছে। মা-বাবার অবাধ্য সন্তানের ধ্বংস ও অমঙ্গলের জন্য হযরত জিব্রাইল আ. বদদোয়া করেছেন। আর রাসূল সা. আমীন বলেছেন।

মায়ের অবাধ্য সন্তানের মুখে মৃত্যুর সময় "কালিমা" না আসা শরীর থেকে রূহ বের না হওয়া এবং ছটফট করতে থাকা। এবং মা মাফ করার পর মুখে কালিমা আসে আর সাথে সাথেই "রূহ" বের হওয়ার ঘটনাও হাদীসে বর্ণিত আছে।

মা-বাবার এসব হক্ব মা-বাবার সেবার বিষয়ে বর্ণিত ফাযায়েল এবং মা-বাবার অবাধ্যতা যে মারাত্যক অপরাধ তা নিজ যায়গায় ঠিক আছে তা আমরাও মানি। কিন্তু তাই এর কারনে সর্ববস্থায় সবার ক্ষেত্রে মা-বাবার সেবাকে আল্লাহর পথে জিহাদ বলা

কোন ভাবেই ঠিক না। কেননা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ র একটি নির্দিষ্ট অর্থ আছে। আর তা হলো, আল্লাহর পথে সশস্ত্র যুদ্ধ।

তবে এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, তাহলে হাদীস শরীফে মা-বাবার খেদমতকে কেন বা কোন অর্থে জিহাদ বলা হয়েছে? এর সহজ একটি উত্তর হলো রাসূল সা. নবী ও রাসূল হওয়া হওয়ার সাথে সাথে মুফতী, কাযী, ইমাম, খতীব, মুবাল্লিগ এবং আমীরুল মুজাহিদীন ও ছিলেন। যদিও তাঁর মৌলিক দায়িত্ব "নবুওয়াত" ই ছিলো। কিন্তু তিনি উম্মত কে শিক্ষা দেয়ার জন্য উল্লেখিত অন্যান্য দায়িত্ব ও তিনি আঞ্জাম দিয়েছেন।

রাসূল সা. এর সাহাবী তো জিহাদের নিয়তেই উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু রাসূল সা. তাঁকে ময়দানে যুদ্ধের পরিবর্তে মা-বাবার খেদমতের কাজে লাগিয়েছিলেন। সুতরাং ঐ সাহাবীর জন্য মা-বাবার খেদমতই জিহাদ। বরং এজন্য জিহাদ ছিলো যে, তা ছিলো আমীরের আনুহত্য ও তাঁর দায়িত্ব বন্টন অনুযায়ী।

টাল বাহানা করে যারা বচায় আপন প্রাণ

বাস্তবে তার খোদার সাথে নেই দৃঢ় বন্ধন।

পিতা-মাতার সেবা করা জিহাদ হয় যদিও

কিন্তু তাহার যুদ্ধের সাথে সম্পর্ক নেই কোন

অথবা

মানি সেরা পিতা-মাতার যদিও বা জিহাদ

কিন্তু যে তার রনাঙ্গনের থেকে রয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষন

মা-বাবার খেদমত তো অমনিতেই অনেক বড় বিষয়, আমীরুল মুজাহিদীন যদি কাউকে যুদ্ধের ময়দান থেকে পিছনে পঠান এবং টয়লেট পরিষ্কারের কাজে লাগান তাহলে টয়লেট পরিষ্কারের মত অতি নগন্য কাজটিও জিহাদ বলে বিবেচিত হবে। এই অর্থে যে, এর কারনে জিহাদের পূর্ণ ছাওয়াব সে পাবে।

আর এমন ঘটনা শুধু এই এক সাহাবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না। বরং এমন আরো বহু ঘটনা ইতিহাসে পাওয়া যায়।

উদাহরনতঃ হযরত উসমান রা. বদরী সাহাবীদের মধ্যে গন্য হতেন। এবং রাসূল সা, ও তাকে বদরের গনীমত থেকে অন্যদের সমান অংশ দিয়েছিলেন। অথচ হযরত উসমান রা. বদর যুদ্ধে ময়দানে শরীক ছিলেন না। বরং নিজ বিবি এবং রাসূল সা. এর মেয়ে হযরত রুকাইয়া রা. আসুস্থতার কারনে তাকে সেবা-যত্নে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু বদরীদের মধ্যে তাকে শুধু এজন্য গন্য করা হয় যে, তিনি বিবির সেবা-যত্নের জন্য নিজের থেকেই পিছে থেকে যান নাই বরং রাসূল সা. তাকে একাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

তাহলে কি শুধু এই হাদীসের কারনে যে কেউ স্ত্রীর সেবা-যত্নকে জিহাদ বলে দিবে? যেহেতু ঘটনা দুটির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। বরং এক হিসেবে হযরত উসমান রা.এর ঘটনা আরো বেশী মজবুত। কেননা তিনি তো গনীমতের অংশও পেয়েছেন অথচ যুদ্ধে শরীক ছিলেন না।

ইতিহাসে হযরত উসমান রা. ছাড়াও আরো এমন আটজন সাহাবীর নাম পাওয়া যায় যাদেরকে বদর যুদ্ধে শরীক না থাকার পরও "বদরী" বলা হয়। আর তা শুধু এজন্য যে, তাদেরকে রাসূল সা. নিজেই কাজে পাঠিয়ে ছিলেন। আর ঐ আট জন সাহাবী হলেনঃ ১. হযরত তালহা রা. ২. হযরত সাঈদ ইবনে জায়েদ ৩. হযরত আবু লুবাবা আনসারী ৪. হযরত আছেম বিন আদী ৫. হযরত হারেছ বিন হাতেব ৬. হযরত হরেছ বিন ছমরাহ রা. ৭. হযরত খাওয়াত বিন যুবায়ের ৮. হযরত জাফর রা.

সারকথা:

সুতরাং এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে আমীরের অনুমতি ব্যতিত তার দায়িত্ব বন্টনের বাইরে থেকে জিহাদ ছেড়ে দিয়ে মা-বাবার সেবা-যত্নে লেগে থাকা এবং এখানেই প্রকৃত জিহাদ মনে করে যুদ্ধের ময়দান থেকে বিমুখতা দেখানো আর (সময়মত) মুজাহিদদেরকে ওজর দেখানো নিজেই নিজেকে ধংসের সম্মুখীন করার নমান্তর। "این خیال است و محال است و جنوں " "আর তা আত্মতৃপ্তি এবং আসম্ভব বিষয় ও পাগলামীই বটে।"

মাসআলা:

জিহাদ "ফরজে আঈন" হলে মা-বাবার অনুমতি ছাড়াই বরং তাদের বাধা সত্বেও জিহাদে যাওয়া জরুরী। তবে বুঝানোর চেষ্টা করবে যেন মা-বাবা সেচ্ছায় আনুমতি দিয়ে দেয় এবং সন্তানের জিহাদের ছাওয়াবের ভাগী হয়।

আর যদি জিহাদ ফরজে কেফায়া হয় তাহলে মা-বাবার অনুমতি তখনই জরুরী যখন তাদের সেবা কারার মত আর কেউ না থাকে।

যদি মা-বাবর সেবা করার লোক থাকে আর মা-বাবা শুধু মুহাব্বতের কারনেই সন্তানকে জিহাদ থেকে ফিরিয়ে রাখতে চায় তাহলে মা-বাবার অনুমতি জরুরী না।(ফয়জুল বারী শরহে সহীহ বুখারী)

আমাদের পুর্বসীরী যারা:

এখানে দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা কাসেমুল উলুমি ওয়াল খাইরাত হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহ. এর ঘটনা উল্যেখ করা সমিচিন মনে করছি। যাতে করে আমাদের কড়দের "মেজাজ" বুঝতে সহায়ক হয়।

হযরত নানুতবী যখন জিহাদের অনুমতির জন্য মায়ের কাছে গেলেন তখন মাকে উদ্দেশ্য কারে বললেন: আল্লাহর পথে যান-মাল উৎসর্গ কার এমন। আর যে ব্যক্তি সেচ্ছায় আল্লাহর পথে জীবন দিয়ে দেয় তাঁর মর্যাদা এই। (অর্থাৎ তিনি ফাযায়েল বর্ননা করলেন) আর এখন জিহাদ ফরজ হয়ে গেছে।

আর মাসআলা হলো আল্লাহর আনুগত্য যদি মা-বাবার আনুগত্য বাঁধা হয় তখন মা-বাবার অনুগত্য বাদ দিতে হয়। আমি চাই যে, াাপনি সেচ্ছায় অনুমতি দিবেন এবং ছাওয়বের ভাগী হবেন।

মা বললেন: বেটা! তুমি আল্লাহর দেয়া ছেলে। আমি আনন্দ চিত্তে তোমাকে আল্লাহর হাওয়ালা করছি। যদি তুমি জীবিত ফিরে আস তাহরলে আবার দেখা হবে, না হয় তো আমরা খুব শিঘ্রই আখেরাতে মিলিত হব।

মায়ের অনুমতির পর যখন বাবার কাছে বিনম্র হয়ে নিজের সংকল্পের কথা জানালে তিনি তখন বললেন: বাবা আমার পগড়ীটা একটু নিয়ে আস। মাও: নানুতুবী : কেন? বাবা: আমি তো তোমার সাথে শহীদ হতে চাই। হযরত নানুতবী: আমার কারনে না। আপনি শহীদ হবেন তো আল্লাহর জন্যই। চলুন আমার সাথে।

মা-বাবার অনুমতি নিয়ে হযরত নানুতবী রহ. থানাভবন পৌছে গেলেন। (হায়াতে আমীরে শরীয়ত পৃষ্ঠা: ১৯১)

আল্লাহু আকবার! তারাই হলেন আমাদের পুর্বসূরী। এমনই ছিলেন আমাদের পূর্বসূরীগন।

হে আল্লাহ আমাদেরকে তাদের পদংঙ্ক অনুসরন করার তাওফিক দান করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

একটি উদাহরন:

বিষয়টি আরো স্পষ্ট করার জন্য শেষে আমি একটি উদাহরন দিচ্ছি। দুই ব্যক্তি, একজনের নাম রিয়াজ খান। অপরজনের নাম পিয়াজ খান। দুজনেই দোকনদার, রিয়াজ খান আমীরুল মুজাহিদীনের কাছে গিয়ে বলল: সম্মানিত আমীর সাহেব! আমার জান-মাল জিহাদের জন্য প্রস্তুত। আমাকে জিহাদের জন্য কবুল করে নেন। আমীর সাহেব তার অবস্থা বিস্তারিত জানার পর বললেন: তুমি দোকান চালাইতে থাক। এবং স্থানীয় মুজাহিদদেরকে সহযোগীতা করতে থাক। এই বেচার জিহাদে শরীক হওয়ার চিন্তা মাথায় নিয়ে দোকানও চালায় সন্তানদের দেখভালও করে আবার মুজাহিদদেরকে সহযোগীতাও করে।

অপর ব্যক্তি পিয়াজ খান, দোকান চালায় আর ভাবে যে, রিয়াজ খানও দোকানদার। আমীর সাহেব তাকে বলেছেন: তুমি দোকান চালাও, সন্তানদের দেখভাল কর। আর মুজাহিদদেরকে আর্থিক সহায়তা কর এটাই তোমার জিহাদ। তাহলে তো আমিও দোকান চালাই, সন্তানদের দেখভালও করি আমার সন্তান তো রিয়াজ খানের চেয়ে এক ডজন বেশী। কারন আমার স্ত্রী তিন জন। আমি তো খুব জিহাদ করছি, মুজাহিদদেরকে মাসিক সহায়তাও করছি আমি কি জিহাদের ছাওয়াব পাব না?

এখন আপনারা উভয় ব্যক্তির কাজের পার্থক্য দেখান। আশা করি যে, এই উদাহরন দ্বারা ব্যপারটি বুঝতে সহজ হবে যে, রিয়াজ খান তো আমীরের আনুগত্য করছে। কিন্তু পিয়জ খান আত্ম পূজায় লিপ্ত।

সংশয় -১৩

সহীহ বুখারীর হাদীস। রাসূল সা. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে মহিলারা যুদ্ধে অংশ গ্রহনের অনুমতি চাইলে রাসূল সা. বলেন:

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : استأذنت النبي صلى الله عليه و سلم في الجهاد فقال (جهادكن الحج)

- صحيح البخارى: 402/1 باب جهاد النساء. رقم الحديث: 2175 - مسند أحمد : 17/ 315 - سنن بيهقى: 8881 باب حج النساء.

মকবুল হজ্জই তোমাদের জিহাদ।

এই হাদীসে “হজ্জ”কে জিহাদ বলা হয়েছে। অথচ “হজ্জ” ভিন্ন একটি ইবাদত। যুদ্ধের সাথে তার কি সম্পর্ক ? বরং এক হাদীসে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে:
عن عائشة قالت : يارسول الله على النساء جهاد ؟ قال : " نعم ، جهاد لا قتال فيه ، الحج والعمرة "

হজ্জ হলো রক্তপাতহীন যুদ্ধ ।

এখন তো স্পষ্ট হয়ে গেল যে, জিহাদের অর্থ শুধু কিতালই না বরং প্রত্যেক ঐ ইবাদতকেই জিহাদ বলা হবে যেখানে কষ্ট এবং চেষ্টা রয়েছে।

সমাধান -১

হজ্জ ও জিহাদ উভয়টি সতন্ত্র ইবাদত। উভয়টির আহকাম ও ভিন্ন ভিন্ন। অন্য অনেক হাদিসেই দুটিকে পৃথক পৃথক করে আলোচনা করা হয়েছে। সহীহ বুখারীর অন্য হাদীসে দেখুন রাসূল সা. কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। সর্বোত্তম আমল কোনটি? أي العمل أفضل উত্তরে রাসূল সা. বললেন: إيمان بالله ورسوله অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা । এর পর প্রশ্ন করা হলো: ثم ماذا। অর্থাৎ তার পর কোনটি? রাসূল সা. বললেন: جهاد في سبيل الله অর্থাৎ আল্লাহর পথে জিহাদ করা। এর পর প্রশ্ন করা হলো: ثم ماذا। অর্থাৎ তার পর কোনটি? রাসূল সা. বললেন: حج مبرور অর্থাৎ কবুল হজ্জ তার পর সর্বোত্তম আমল।

পরিপূর্ণ হাদীসটি এই:

عن أبي هريرة : سئل النبي صلى الله عليه و سلم أي الأعمال أفضل ؟ قال (إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله) . قيل ثم ما ذا؟ قال : جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور.

- صحيح البخارى: 206/1 باب فضل حج المبرور . رقم الحديث:1519 - صحيح إبن حبان: 365/1 رقم الحديث:152

এমতাবস্থায় দেখুন কোন একটি হাদীস দেখেই ফলাফল বের করার চেষ্টা হলো শরীয়তের মেজাজ (নিয়ম-নীতি) সম্পর্ক অজ্ঞতার দলীল। এজন্য সবগুলো হাদীস সামনে রেখেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সমাধান-২

যদি কখন বিশেষ পরিস্থিতিতে বা রাষ্ট প্রধানের হুকুমের কারনে মহিলাদের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যায় আর তখন কোন মহিল বলে যে, আমি তো হজ্জ করব। জিহাদে কেন যাব? হজ্জই তো আমার জিহাদ। কেননা রাসূল সা. বলেছেন: হজ্জই মহিলাদের জিহাদ। তাহলে কি কোন জ্ঞানী ব্যক্তি তার এই যক্তি মানার জন্য তৈরী হবেন? আর এতেই কি মহিলার থেকে জিহাদদের হুকুম রহিত হয়ে যবে?

সমাধান-৩

হাদীসের মূল উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা হলো। যেহেতু স্বাভাবিক অবস্থায় মহিলাদের উপর জিহাদ ফরজ না এজন্য তাদেরকে সান্তনা দেয়ার জন্য এই কথা বলা হয়েছে যে, পুরুষেরা যেমন যুদ্ধের ময়দানে অনেক পরিশ্রম করে এবং কষ্ট সহ্য করে তেমনি মহিলারা যদি আল্লাহর দেয়া সীমা রেখার প্রতি লক্ষ রেখে হজ্জ করে এবং তাতে কষ্ট সহ্য করে সবগুলো রুকন যথাযথ আদায় করে তাহলে তার এই হজ্জের কারনে জিহাদের ছাওয়াব পাবে।

এজন্যই মহিলাদের জিহাদ শুধু হজ্জ বলা হয় নাই বরং حج مبرور বলা হয়েছে। কেননা মহিলাদের মত নাযুক প্রকৃতির মানুষের জন্য হজ্জের কষ্ট করা এবং পর পুরুষদের উপস্থিতিতে পর্দার প্রতি লক্ষ রেখে এভাবে হজ্জ করা যে, حج مبرور অর্থৎ পরিপূর্ন এবং মাকবুল হজ্জ হয়। বাস্তবে তা যুদ্ধ ক্ষেত্রের কষ্টের চেয়ে কম নয়।

মূলত এর উপর ভিত্তি করেই তাদের হজ্জের ক্ষেত্রে রূপক অর্থে জিহাদ ব্যবহার করা হয়েছে।

হজ্জ ও জিহাদের মধ্য সামঞ্জাস্য ফায়েদার জন্য মুহতারাম উস্তদ জনাব মাও. আসলাম শেখপুরী দা.বা. এর “খাযীনা” নামক কিতাব থেকে কম বেশী করে কিছু ইবারত এখনে উল্লেখ করছি।

হজ্জ এবং জিহাদের সম্পর্ক।

(ক) জিহাদের ময়দানে একটি কেন্দ্রে থাকে যার থেকে মুজাহিদগন সম্পৃক্ত থাকেন। তেমনি হজ্জেও একটি কেন্দ্র থাকে যার সাথে সকল হাজির সাথে স্পপৃক্ত থাকেন।

(খ) যুদ্ধের ময়দানে মুজাহিদগন একজন আমীরের অধীনে থাকেন। তেমনি হজ্জের ক্ষেত্রেও একজন আমীর নির্ধারিত হয়ে থাকেন।

(গ) মুজাহিদদের কখন কয়েক সাপ্তাহ পর্যন্ত গোসলের সুযোগ হয়। যার কারণে শরির ময়লা হয়ে যায়। হাজি সাহেবদেরও কখন প্রায় এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়।

(ঘ) যুদ্ধের জন্য যেমন ঘর-বাড়ি ছাড়তে হয় তেমনি হজ্জের জন্য ঘর-বাড়ি ছাড়তে হয়।

(ঙ) যুদ্ধে সাধারনত মুজাহিদদেরকে পর্যায়ক্রমে ক্যাম্প পরিবর্তন করতে হয়। তেমনি ভাবে হজ্জের ক্ষেত্রেও মক্কা থেকে মিনা, থেকে আরাফা, আরাফা থেকে মুজদালিফা, মুজদালিফা থেকে মিনা এবং মিনা থেকে মক্কায় যেতে হয়।

(চ) যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিশেষ নিয়ম শৃংখলা থাকে। তেমনি হজ্জের ক্ষেত্রেও এর প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়।

(ছ) যুদ্ধ ক্ষেত্রে গুনাহ থেকে বেচে থাকার বিশেষ নির্দেশনা থাকে। তেমনি হজ্জের ক্ষেত্রে ও বিষয়াদি থেকে বিরত থাকার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়।

(জ) জিহাদ শয়তানের এজেন্ট (কাফের) দেরকে হত্যা করা হয়। হজ্জে শয়তানের প্রতিকৃতিতে (কংকর) মায়া হয়।

(ঝ) জিহাদে মানুষের তাজা রক্তের নাযরানা পেশ করা হয়। আর হজ্জে পশুর রক্ত পেশ করা হয়। যা মূলত হযরত ইসমাইল আ. এর মানবীয় রক্তের বদলা।

(ঞ) জিহাদে বিজয়ের পর কেন্দ্রে সংবাদ পাঠানো হয় এবং বিস্তারিত রিপোর্ট করা হয়। হজ্জের ক্ষেত্রে হজ্জের কাজ সম্পন্ন করার পর মূল কেন্দ্রে বাইতুল্লায় হাজিরা দেয়া হয়।

(ট) মুজাহিদরা আল্লাহু আকবার ধ্বনীতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে তোলে। এবং আল্লাহর একত্ববাদ ঘোষনা করতে থাকে। হাজীরাও তালবিয়ার মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষনাদেয় এবং অন্তর জাগ্রত করে।

একল বিষয়ে সামাঞ্জস্য থাকার কারণে হজ্জকে রূপক আর্থে জিহাদ বলা তাও আবার শুধু মহিলাদের ক্ষেত্রে, এর থেকে আবশ্যকীয় ভাবে হজ্জকে জিহাদ মনে করে অযথা জিহাদের অর্থে ব্যপক সৃষ্টি করা কতটুকু যৌক্তিক? বিনা কারণে জিহাদের অর্থে ব্যপকতা আনার জন্য হজ্জকে জিহাদের অর্থে ব্যবহার করা কতটুকু যৌক্তিক ?

এর থেকে কি একথা প্রমানিত হয় যে, হজ্জকে জিহাদের অর্থেই ব্যবহার করতে হবে এবং অকারনে জিহাদের অর্থে অযথা জিহাদের অর্থে ব্যপকতা আনতে হবে?

সমাধান-৪

عن عائشة قالت : يارسول الله على النساء جهاد ؟ قال : " نعم ، جهاد لا قتال فيه ، الحج والعمرة "

হযরত মাও. উবইদুল্লাহ সিন্ধী রহ.এর ভাষ্য মতে "হজ্জ" মূলত জিহাদেরই প্রশিক্ষন, অনুশীলন ও পূর্বপ্রস্তুতি।

তাহলে তো উত্তর স্পষ্ট, ট্রেনিংয়ের মধ্যে যেমন যুদ্ধ হয় না। আবার ট্রেনিংকে যুদ্ধ ও বলতে পারবেন না। হ্যাঁ ট্রেনিং অবশ্যই যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং এর গুরুত্ব যুদ্ধ থেকে কোন অংশে কম নয়। এবং ট্রেনিংকে যুদ্ধের অংশ মনে করা এক হিসেবে বাস্তব সম্মতও।

হযরত মাও. উবাইদুল্লাহ সিন্ধী রহ. এর কথার সারাংশ উল্যেখ করছি যা তিনি তার লেখা তাফসীর "ইলহামুর রহমান" এ লিখেছেন: সামরিক প্রশিক্ষন ও যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য হজ্জের হুকুম দেয়া হয়েছে। এর বর্ণনা সূরা বাকারার ১৯৬ নং আয়াত থেকে ২০৩ নং আয়াতে রয়েছে। এই সবগুলো আয়াতই হজ্জ বিষয়ক আর হাদীস শরীফে বলা হয়েছে:

عن عائشة قالت : يارسول الله على النساء جهاد ؟ قال : " نعم ، جهاد لا قتال فيه ، الحج والعمرة "

অর্থাৎ হজ্জ এমন জিহাদ যাতে শত্রুর মুখোমুখি হতে হয় না।

....
....
....

সংশয় -১৪

এই আপত্তিটি আলোচনা করার আগে একটি ঘটনা উল্যেখ করছি যা, আমার সাথেই ঘটেছে। এক বার আমি মুজাহিদ ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য "সারগুধা" জেলার "মঢরাঞ্জা" এলাকায় যাই। এখন মুজাহিদ সাথীরা বললো : আমাদের "শুকরানী" জামে মসজিদে তাবলীগ জামাতের লোকেরা এসেছে। তারা তো আমাদেরকে অস্থির করে ফেলেছে।

তারা বলে হাদীস শরীফে এসেছে:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد "

- مشكاة المصابيح للتبريزى:30 باب الاعتصام بالكتاب والسنة - الفصل الثانى،

অর্থ: ফেতনা ফাসাদের যুগে যে ব্যক্তি আমার একটি সুন্নত আকড়ে ধরবে সে একশত শহীদের ছাওয়াব পাবে।

আপনার (মুজাহীদরা) কেন অযথাই কাশ্মীর ও আফগানিস্থানের পাহাড়ে গিয়ে এত কষ্ট করছেন? ঘর-বাড়ি থেকে দূরে মা-বাবাকেও কষ্ট দিচ্ছেন যদি শহীদ হবেন আর বেশীর থেকে বেশী এক শহীদের ছাওয়াব পাবেন। এর চেয়ে ভালো ঘরে থেকে দিনের মেহনত করেন এবং দৈনিক কয়েকটি করে "সুন্নত" জিন্দা করেন তাহলে হাজার হাজার নয় লাখো শহীদের ছাওয়াব পাবেন।

অথচ বাস্তবতা হলো এই হাদীসটি সহ এজাতীয় অন্যান্য হাদীস যেগুলো মূলত দিনের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে। কিন্তু ইসলামের দুশমন মুনাফিক ও কিছু অবুঝ দ্বীন-দরদী মুসলমান অন্য মুসলমানদেরকে ধোকা দিয়ে যাচ্ছে। নিজেও ধ্বংশ হচ্ছে

অন্যকেও ধ্বংশ করেছে। এজন্য এই হাদীসটি বিস্তারিত আলোচনা করা জরুরী মনে হচ্ছে।

সমাধান -১

একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা ভালো ভাবে বুঝে নেয়া চাই যে, সুন্নান দুই ধরনের সুন্নাতে আদাত ও সুন্নাতে ইবাদাত। অর্থাৎ রাসূল সা. কিছু কাজ আল্লাহর তা'য়ালার ইবাদত হিসেবে করেছেন। আর কিছু কাজ মানবীয় চাহিদার ভিত্তিতে করেছন। যদিও রাসূল সা. এর গোটা জিবনই ইবাদত।

যেমন দেখুন মাথায় তেল লাগানো, চিরুনি করা, খাবার পর মেসওয়াক করা, ঘুমানোর আগে মেসওয়াক করা, খাবার পূর্বে হাত ধোয়া, মিষ্ট দ্রব্য পছন্দ করা এবং জুতা ব্যবহার কর ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব কাজ রাসূল সা, অভ্যাস ও প্রয়োজনের কারনে করেছন।

কিন্তু অজুর সময় মেসওয়াক ব্যবহার করা, নামযের জন্য আযু করা, যানাবতের গোসল ও শরীয়তের অন্যান্য আমল যেমন নামায, রোজা, হজ্জ ইত্যাদি। এগুলো রাসূল সা. ইবাদাত হিসাবেই করেছন। এই হাদীসে সুন্নাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐসব সুন্নাত যেগুলো রাসূল সা. ইবাদাত হিসেবে করেছেন। যদিও রাসূল সা. এর ঐ সব সুন্নাতও অনুসরনীয় যেগুলো তিনি অভ্যাসের ভিত্তিতে করেছেন। এবং এটাও অনেক সাওয়াবের কাজ।

আপনি ব্যপারটি আরো স্পষ্ট করে এভাবে বলতে পারেন যে, সুন্নাত দুই ধরনের سنت طبعية ও سنت شرعية অনুসরন করা আবশ্যক হলো সুন্নাতে শরয়ীয়্যা এর, সুন্নাতে তাবয়ীয়্যার না।

সমাধান-২

সুন্নাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শরীয়তের কোন হুকুম জিন্দা করা। যেমন অন্য বর্ননায় من أحى سنتى এসেছে। অথবা সুন্নাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শরীয়তের কোন হুকুম মযবুত ভবে আকড়ে ধরা। যেমনটা এই হদীস থেকে বুঝে আসে। আর শরীয়তের আহকাম সমূহের মধ্যে "জিহাদ" হুকুমটির উপর যে অবহেলা করা হয়েছে অন্য কোনটির ক্ষেত্রে তা হয়নি। শত্রুদের কথা বাদই দিলাম, মিত্ররা তো হাত ধোয়ে বসেছে।

শত্রুদের শত্রুতা তো বুঝা যায় কিন্তু মিত্রুদের মারপ্যাচ তো বোঝা দায়। আর জিহাদ এমন একটি হুকুম যা জিন্দা হলে পূরা দ্বীনই জিন্দা হয়ে যাবে। জিহাদ শেষ হয়ে যাওয়া মানে দ্বীন শেষ হয়ে যাওয়া। এজন্য জিহাদের বিষয়ে যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে হয়তো শরীয়তের অন্য কোন হুকুমের ব্যাপারে এতো গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। আর জিহাদ যেহেতু পূরা দ্বীনের ভিত্তি সম্ভবত এ কারনেই হাদীস শরীফে জিহাদকে পরিপূর্ণ দ্বীন বলা হয়েছে।

عن ابن عمر ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم).

- سنن أبي داؤود :490/2 باب في النهى عن العينة . رقم الحديث:3462 - مسند أحمد:114/5 رقم الحديث:5562

অর্থ: যখন তোমরা পার্থিবও ধন-সম্পদের পিছনে পড়ে যাবে, গরুর লেজ ধরে বসে যাবে, এবং ক্ষেত-খামারের পিছে পড়ে জিহাদ ছেড়ে দিবে, তখন আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের উপর এমন লাঞ্চনা আরপ করে দিবেন যা দ্বীনের দিকে ফিরে আসা ব্যতিত তোমাদের থেকে হটাবেন না।

এই হাদীস শরীফে দ্বীন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জিহাদ। সুতরাং জিহাদ করাই প্রশ্নে উল্লেখিত হাদীসের কাছাকাছি অর্থ। (বজলুল মাজহুদ শরহে আবু দাউদ)

সমাধান-৩

এই হাদীস শরীফে যেমন সুন্নাত জিন্দা করা ফজিলত বর্ননা করা হয়েছে যে, একশত শহীদের সাওয়াব মিলবে, এর অর্থ যদি এই হয় ময়দানে গিয়ে আর যুদ্ধ করার প্রয়োজন নাই (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ এমন ধারনা থেকে আমাদের হেফাজত করার তাওফিক দান করুন। তাহলে যেসব হাদীসে কোরআন শরীফের বিশেষ কিছু সূরার ফজিলত বর্ননা করা হয়েছে। যেমন সূরা ফতেহা সাওয়াবের দিক থেকে দুই তৃতীয় অংশ কোরআনের বরাবর, আর সূরা ইয়সিন হলো কোরআন শরীফের দিল। যে সূরা ইয়াসিন পড়বে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে দশবার কোরআন খতমের সাওয়াব দিবেন। এবং চারবার সূরা কাফিরুন ও এক হাদীসে তিনবার সূরা ইখলাস পড়লে পুরা কোরআন শরীফ তেলওয়াত করার সাওয়াবের ওয়াদা করা হয়েছে।

এসব হাদীসের উদ্দেশ্য যাদি এই হয় যে, যেসব মাদ্রাসায় পুরা কোরআন শরীফ মুখস্ত করানো হচ্ছে সেগুলো বন্দ করানো হোক। কি প্রয়োজন আছে পূরা কোরআন শরীফ মুখস্ত করার? কোন বেয়াকূফ ব্যক্তিও কি এমন নির্বোদ্ধিতার কাজ করতে পরে? কখনো না। তাহলে জিহাদের সাথে এমন শত্রুতা-বিদ্বেষ কেন?

সমাধান-৪

এবর আসুন উল্লেখিত হাদীসে শরীফের সঠিক ব্যাক্ষা জেনে নেই। হাদীস শরীফে ফেৎনার যোগে কোন সুন্নাত মযবুত ভাবে আকড়ে ধরা বা জিন্দা করা উপর একশ শহীদের সাওয়াবের ওয়াদা করা হয়েছে। এজন্য এখনে খুব ভালো বাবে বুঝে নিন যে, এক হলো প্রতিধান অর্থাৎ পারিশ্রমিক আরেক হলো মানও পদ-মর্যাদা পারিশ্রমিক এক জিনিশ আর মান-মর্যাদা ভিন্ন জিনিষ। একশত শহীদের পারিশ্রমিক পাইলেই জরুরি নয় যে, সে একজন শহীদের মান-মর্যাদাও পেয়ে যাবে। এজন্য যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ

করে শাহাদাতের অমিয় শুধা পানকারী মুজাহিদের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা যে মর্যাদার ওয়াদা করেছেন, একশ কেন লাখ শহীদের পারিশ্রমিকও তার বরাবর হবে না।

শত শহীদের সওয়াব পাবে সুন্নাত জিন্দায়,

কিন্তু তাহার নেই কো প্রভাব শহীদের মর্যাদায়।

শহীদের মর্যাদা তো হাদীস শরীফে এসেছে, কিয়ামতের দিন যখন শহীদ আসবে তখন যদি তার (আসার) রাস্তায় ইব্রাহিম খলীলুল্লাহর মত নবী-রাসূলও থাকেন তাহলে তাকেও নির্দেশ দেয়া হবে। রাস্তা ছেড়ে দাও শহীদ তার রাস্তা থেকে সবাইকে একদিকে সরিয়ে রাস্তা খালী করা হবে।

শহীদের মর্যদা তো হলো, একজন শহীদ কিয়ামতের দিন পরিবারের সত্তর জন্য জাহান্নামের জন্য সুপারিশ করবে, এবং তার সুপারিস গৃহীত হবে। শহীদের মর্যাদা তো রাসূল সা. দশ দশ বার। শহীদ হওয়ার তামান্না করেছেন। অর্থাৎ নবুওয়াত পাওয়া সত্বেও "শাহাদাতের" মর্যাদার তামান্না করেছেন। আর অল্লাহ তা'য়ালা পুরাও করেছেন। কারন রাসূল সা. এর ওয়াফাত ঐ বিষের প্রভাবেই হয়েছে যা খয়বার যুদ্ধের সময় এক ইহুদী মহিলা (গোস্তের সাথে মিশিয়ে) রাসূল সা. কে দিয়ে ছিলো। আর বিষ প্রয়োগ মৃত্যু বরণ করলে শাহাদাতের মৃত্যুই হয়।

কিন্তু আল্লাহর আশ্রয় কক্ষনো এর উদ্দেশ্য, এই যে, শাহাদাতের মর্যাদা নবুওয়াতের উর্দ্ধে। বরং উদ্দেশ্য হলো নবুয়তের মর্যাদায় অধিষ্টিত হওয়ার তামান্না করেছেন।

শহিদের মর্যাদা এবং পরিশ্রমিকের ব্যপারটি একটি উদাহরণ থেকে বুঝে নিন।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির এক হলো মান ও পদমর্যাদা। থাকে আপনি প্রটোকল বলতে পারেন। আর এক হলো রাষ্ট্রপতির বেতন যেটাকে আপনি পরিশ্রমিক দিয়ে বুঝতে পারেন। এখন রাষ্ট্রপতির বেতন তো এত সামান্য যে, কোন ফ্যক্টরীর জেনারেল ম্যানেজার এবং কোন ব্যাংকের একজন বড় কর্মকর্তার বেতন ও তার কয়েকগুন বেশী

হতে পারে। কিন্তু দেশের সব ইঞ্জিনিয়ার বা বড় বড় ফার্মের জি, এমদের মান একসাথে করলেও রাষ্ট্রপতির মর্যাদার বরাবর হবে না।

সুতারাং শহিদের পরিশ্রমিক আর তার মানের এই পার্থক্য টি ভালোভাবে বুঝে নিন। তাহলে কোন সংশয় থাকবে না।

প্রিয় ভাই ও বন্দুরা! দিনের কাজ করুন এবং দিনের বুঝও হাসিল করুন। এবং কাফেরদের সুক্ষ্ম চালের শিকার হয়ে দিনের আকতি বিকৃতি করবেন না। আল্লাহ আমাদেরকে দিনের সহিহ বুঝ দান করেন। আমীন। ইয়া রব্বাল আলামীন!

সংশয় -১৫

কিছু দ্বীনি মহলে খুব জোড়ে-সোড়ে একথা প্রচার করা হচ্ছে যে, কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর রাস্তায় বের হবে নিজ প্রয়োজনে এক টাকা খরচ করে। সে এর বদলায় সাত লাখের ছাওয়াব পাবে। আর এক নামাজে উনপঞ্চাশ কোটি নামাজের ছাওয়াব পাবে। আর আমরা যেহেতু দিনের দাওয়াত ও তাবলীগের (প্রচার প্রশার) এর কাজে আর দাওয়াতেও তাবলীগের কাজ সবচে বড় কাজ। বাকি সব তো দ্বীনের শাখা প্রশাখা। দ্বীনের দাওয়াতের আমলই আসল এবং পাবে পরিপূর্ন দ্বীন। সুতরাং এই ছাওয়াব শুধু তারাই পাবে যারা দ্বীনের দাওয়াতও তাবলীগের কাজ করে। মূলত আল্লাহর রাস্তা এটাই। এর দ্বারাই দ্বীন জিন্দা হয়।

সমাধান-১

সর্ব প্রথম ঐ হাদীসটি দেখুন যাতে এক রুপি সাত লাখ টাকার প্রতিধান এবং নামাজে ৫০ কোটি নামাজের সাওয়াব পাওয়া যায়। এরপর দেখুন হাদীসগুলির মান কেমন? তৃতীয়ত দেখুন সাওয়াবের প্রথম হক্বদারকে? এখন আমরা এই তিনটি বিষয়কে ক্রমানুসারে বর্ণনা করবো।

নম্বর-১

হযরত আলী রা. হযরত আবু দারদা রা. হযরত আবু হুরায়রা রা. হযরত উসামা রা. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. হযরত ইমরান ইবনে হুছাইন রা. বর্ননা করেন। রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন:

من أرسل نفقة فى سبيل الله وأقام فى بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم ومن غزا بنفسه فى سبيل الله وأنفق فى وجهه كل ذلك فله بكل درهم ألف درهم (ابن ماجه عن الحسن بن على ، وأبى الدرداء ، وأبى هريرة ، وأبى أمامة ، وابن عمر ، وابن عمرو ، وجابر ، وعمران بن حصين).

- جامع الأحاديث لجلال الدين :45532 - سنن إبن ماجة : 198 - باب فضل النفقة في سبيل الله .

যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে নামাজ রোজা ও যাকাতের ছাওয়াব আল্লাহর রাস্তায় টাকা খরচের ছাওয়াবের চেয়ে সাতাশগুন বেশী।

ফলাফল:

এভাবে এক টাকা খরচ করলে যেহেতু সাত লাখেকে সাতাশ দিয়ে পূরন দিলে উনপঞ্চাশ কোটি হয়ে যায়। এই হিসাবে আল্লাহর রাস্তায় নামাজ, রোজা, যাকাতের ছাওয়াব উনপঞ্চাশ কোটি হয়ে যায়।

নম্বার-২ হাদীসের মান

এই হাদীস দুইটি সানদের দিক থেকে একেবারেই "যইফ" এজন্য সমস্যা বর্ননা করা ছাড়া এসব হাদীসের শুধু ব্যখ্যা জায়েজ নাই। (তাবলীগ জামাত ও উনপঞ্চাশ কোটির সওয়াব যুগশ্রেষ্ঠ মুফতী শহীদ রশীদ আহমাদ লুধিয়ানবী রহ.)

নম্বর -৩ হাদীসের উদ্দেশ্য কারা:

যদি চিন্তা করা হয় তাহলে এককথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই হাদীসের সর্ব প্রথম ও সর্ব উত্তম মেছদাক হলো মুজাহীদগন। কেননা নামাজ, রোজা ও জিকিরের উনপঞ্চাশ কুটি সাওয়াব তো তখন যখন তাকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ এর দ্বারা একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, এই সাওয়াব তখন যখন একটি শর্ত পাওয়া যাবে, আর তা হলো " النفقة في سبيل الله। " অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করা। আর এই যুদ্ধের কাজ মুজাহীদরা ছাড়া আর কে করে? আর ফুক্বাহায়ে কেরাম তো একথা সুস্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, স্বাভাবিক ভাবে যখন ফী সাবীলিল্লাহ্ বলা হবে তখন এর দ্বারা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহই হবে।

এজন্য একথা বলা একেবারেই যথার্থ হবে যে, এই হাদীসের সারাসরি উদ্দেশ্য মুজাহিদগন। যদিও পরোক্ষভাবে ঐসব ভাইয়েরাও এই হাদীসের অন্তরভুক্ত হবেন যারা দ্বীনের অন্যান্য শাখা প্রশাখায় কাজ করছেন।
দয়ার সাগর হতে ইহা নয় দূরে

তিনি চাইলে অসংখ্য সওয়াব দিতে পারেন মোরে,

তাহার জন্য লাগবে তবু জীবন বাকী খেলা

সখ-বিলাসের মাঝে ডুবে পাবে কি তা হেলা?

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের এই পুরুস্কার বরং এর চেয়ে আরো বেশী দান করেন। আমীন! ইয়া রব্বাল আলামীন।

এজন্য প্রিয় ভাই ও বন্দুরা আমার আবেদন হলো হাদীস গুলোর ব্যখ্যা করার সময় আল্লাহ ভয়ের ব্যপারটি সামনে রাখুন। নতুবা দুনিয়া ও আখেরাতে ব্যর্থ হয়ে যাবেন। দ্বীনের এটা যেমন করে ফেলবে এবং হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষনে মনমত রদবদল করবে?

বিশেষ দ্রষ্টব্য: বর্তমান প্রচলিত দাওয়াত ও তাবলীগকে পূর্ন দ্বীন এবং দ্বীনের মৌলিক কাজ বলা দ্বীনের অন্যান্য খেদমতকে দাওয়াত ও তাবলীগের শাখা প্রশাখা বলা একেবারেই মূর্খতা বিস্তারিত আলোচনা সামনে আছে সেখানে দেখে নিবেন।

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে দ্বীনের বিকৃতি সাধন কারা থেকে হেফাজত করেন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

সংশয় -১৬

فقال (على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم)

- صحيح البخاري: 413/1 باب دعاء النبي صلى الله عليه و سلم إلى الإسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. رقم الحديث:2942 - سنن أبي داؤود : 515/2 باب فضل نشر العلم. رقم الحديث:3661

খায়াবার যুদ্ধের সময় রাসূল সা. হযরত আলী রা. কে লক্ষ্য করে বলেন: হে আলী! তোমার কারণে একজন ব্যক্তি হেদায়েতের উপর এস যাওয়া একশত লাল উট সদকা থেকে উত্তম।

এজন্য আমাদের ও কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করে শক্তি সামর্থ ব্যায় করার চেয়ে তাদের ইসলাম গ্রহণের চিন্তা করা উচিত।

সমাধান -১

এটা তো ঠিক আছে যে, একজন কাফেরের ইসলাম গ্রহন করা বিষয়ে ফিকির করা উচিত। কিন্তু এর থেকে এটা কি করে প্রমানিত হয়ে যে, যে কাফের নিজে ঈমান আনবে না বরং ইসলামের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে বাধা রাখাবে। এমন কাফেরকেও হত্যা করা উচিত না? অথচ কাফেরদেরকে হত্যা করাই মূলত অন্য কাফেরদের ঈমান আনার মাধ্যম।

সমাধান -২

তাহলে কি রাসূল সা. এর এই পবিত্র বানী শুনার পর ঐ খায়বার যুদ্ধে হযরত আলী রা. কোন কাফেরকে হত্যা করেন নাই। অন্যান্য সাহাবিও কি যুদ্ধ করা ছেড়ে দিয়ে ছিলেন? তাহলে বীর মোরাহহাবের হাশর কে করেছিল?

সমাধান -৩

যদি এই হাদীসের উদ্দেশ্য এটাই হয় যা আমার প্রিয় ভাইও বন্ধুরা করেছেন। তাহলে ঐসব হাদীসের কী উদ্দেশ্য নিবেন? যাতে রাসূল সা. কাফেরদেরকে হত্যা করার উৎসাহ দিয়েছেন এবং এক কাফেরকে হত্যার জন্য সুসংবাদ শুনিয়েছেন।

হয়ত যদি ঈমান আনে কোন কাফের জানে

শত উটের চেয়েও পণ্যের মুসলমানের তরে।

তাই বলে কী কেউ অর্থ কী তার এরূপ ভবতে পারে

দুষ্ট কাফের নিঠন করা তার চেয়ে কম হবে?

এজন্য আমার আন্তরিক আবেদন হল কাফেরদের ঈমানের ফিকির করা যদি জরুরী হয়, এবং তা অবশ্যই জরুরী তবে দম্বিক কফেরদের দম্বিকতা দূর করা এবং মস্তিষ্ক বিকৃত কাফেরদের মস্তিষ্ক ঠিক করার ফিকির করাও জরুরী। যাতে ইসলাম প্রচার প্রশার লাভ করে। এবং আমাদের ঈমান মজবুত হয়ে যায়। ইসলামের বিজয় ও শান-শাওকত দেখে লোক দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে দ্বীন বুঝার এবং পূর্ণ দ্বীনের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!!

সংশয় -১৭

সংশয় ও সমাধান লেখার আগে একটি ঘঠনা উল্লেখ করছি। ১৯৯৮ সনের কথা। আমি কাবুলের পাশে এক এলাকায় মুজাহিদদের খালিদ বিন ওয়ালিদ ক্যাম্প পরিদর্শনে যাই। সেখানকার ট্রেনিং সেন্টারের প্রশিক্ষকগন বললেন : ট্রেনিং সেন্টারে দৈনিক যোহরের নামাজের পর "ফাজায়েলে আমল" তালীম করা হয়। কিন্তু উল্যেখিত একটি হাদীসের কারণে আমরা যথেষ্ট পেরেশানীর শিকার হয়েছি। এক পর্যায়ে পেরেশানীর কারণে ঐ হাদীসের তালীমই নিষিদ্ধ করে দিয়েছি।

কারণ এতে মুজাদিদের জেহেনে সংশয় সৃষ্টি হয়। এবং এই হাদীসের কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা আমাদের জানা নেই। আমি নিজেই আশ্চর্য হলাম, এটা কি করে সম্ভব? কোন হাদীস কি এমন হতে পারে যা মুজহিদদের জন্য কেন দ্বীনের যে কোন শাখায় কর্মরত কোন মুসলমানের জন্য পেরেশানীর কারণ হবে? হাদীস তো দ্বীনই-দ্বীন। এর দ্বারা দ্বীনের উপর আমল করা সহজ হবে। পেশেনীর কারন হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না।

সংক্ষিপ্ত ঘটনা হলো, আমি যোহরের নামাজের পর ঐ হাদীসটিই তালীম করি। এবং তার ব্যাখ্যা আলোচনা করি এতে মুজাহিদদের সাথে সাথে প্রশিক্ষকগনও ﷲ

كبر। প্রথমে আমি ফাযায়েলে আমলের থেকে ঐ হাদীসটি ব্যাখ্যা সহ লিখছি। তার পর আসল প্রশ্নের ব্যাখ্যা বিশ্লেষন করবো। ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সাবাইকে সত্য বলার তাওফিক দান করুন। এবং সত্যের উপর আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন !!!

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَجُلاَنِ مِنْ بَلِىٍّ حَيٍ مِنْ قُضَاعَةَ أَسْلَمَا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتُشْهِدَ أَحَدُهُمَا، وَأُخِّرَ الآخَرُ سَنَةً. قَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰه: فَرأَيتُ الْمُؤَخَّرَ مِنْهُمَا أُدْخِلَ قَبْلَ الشَّهِيدِ، فَتعَجِبْتُ لِذَلِكَ، فَأَصْبَحْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّٰه صلى الله عليه وسلم، أَوْ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّٰه صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰه صلى الله عليه وسلم: أَلَيْسَ قَدْ صَامَ بَعْدَهُ رَمَضَانَ، وَصَلَّى سِتَّةَ آلافِ رَكْعَةٍ، أَوْ كَذَا وَكَذَا رَكْعَةً صَلاَةَ السَّنَةِ.

তরজমা:

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন যে, এক গোত্রের দুই সাহাবী একসাথে মুসলমান হন। তাদের একজন যুদ্ধে শহীদ হয়ে যান। অপর জন এক বছর পর মৃত্যু বরন করেন। হযরত ত্বলহা বিন উবাইদুল্লাহ বলেন: আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, যেই সাহাবী এক বছর পর ইন্তেকাল করে ছিলেন। তিনি ঐ শহীদ সাহাবীর আগে জান্নাতে প্রবেশ করছেন। আমি খুব আশ্চর্য হলাম। (শহীদের মর্যদা তো অনেক উর্ধে তার তো আগে জান্নাতে প্রবেশ করার কথা।) সকালবেলা আমি নিজেই বা অন্য কেউ হুজুর সা. কে জিজ্ঞাসা করল। তখন রাসূল সা. বললেন: যে সাহাবীর ইন্তেকাল এক বছর পর হয়েছে, তার নেক আমল তো আনেক বেশী হয়েছে। এক রমজানের রোজা বেশী হয়েছে। এবং এক বছরে তার ছয় হাজার এত এত রাকাত নামাজ বেশী হয়েছে।

সমাধান

উত্তর দেয়ার আগে ভূমিকা স্বরূপ কিছু জরুরী কথা লিখছি। রাসূল সা. ইরশাদ করেন إنما الأعمال بالنيات ..... الصحيح للبخاري: ২/১ رقم الحديث: ১। এবং অন্য হাদীসে এসেছে,

عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (نية المؤمن خير من عمله

অর্থাৎ অনেক সময় মুমিন কোন নেক কাজের নিয়্যাত করে কিন্তু কোন কারণ বসত ঐ কাজ করতে পারে না। তাহলে নিয়তের কারণে সে অবশ্যই প্রতিদান পাবে। দেখুন ! কোন ব্যক্তি যদি কুরআনে কারীম হেফজ করার নিয়ত করে এবং হিফজ শুরু করে এর জন্য আনেক মেহনতও করে কিন্তু সে মেধা সল্পতার কারণে শেষ করতে পারেনা অথবা মাঝেই তার মৃত্যু হয়ে যায়। তাহলে অবশ্যই তাকে কিয়ামতের দিন হাফেজদের সাথে উঠানো হবে। অমনি ভাবে কোন ব্যক্তি হজ্জের নিয়তে ঘর থেকে রওয়ানা হয়। কিন্তু রাস্তায় তার মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই সে কিয়ামতের দিন হাজ্বীদের কাতারে দাঁড়াবে এবং আল্লাহ চাহেতো তাকে নিজ দয়া ও অনুগ্রহে হজ্জের পূর্ণ সাওয়াবও প্রতিদান দান করবে। দেখুন আল্লাহ তা’য়ালা ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে বলেছেন যে, হিজরতের নিয়্যাতে ঘর থেকে রওয়ানা হয় এবং পথে তার মৃত্যু হয়ে যায়:

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللهِ وَكَانُ ٱللهُ غَفُوراً رَحِيماً (سورة النساء-100)

তরজমা : আর যে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করবে, সে যমীনে বহু আশ্রয়ের জায়গা ও সচ্ছলতা পাবে। আর যে আল্লাহ্‌ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে মুহাজির হয়ে নিজ ঘর থেকে বের হয় তারপর তাকে মৃত্যু পেয়ে বসে, তাহলে তার প্রতিদান আল্লাহর উপর অবধারিত হয়। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

উল্লেখিত হাদীস ও আয়াতের দ্বারা প্রমানিত হলো যে, প্রত্যেক আমলেরই একটি বাহ্যিক রূপ এবং একটি বাস্তবতা রয়েছে। সাওয়াব ও প্রতিদান মূলত ঐ বাস্তবতার উপর ভিত্তি করেই হয়। বাহ্যিক রূপের উপর না। যদি নিয়্যত ঠিক না থাকে। শুধু বাহ্যিক রূপ থাকে তাহলে আখেরাতে কোন ছাওয়াবই পাবে না। যেমন একজন আলেম, আর একজন দানবীর তৃতীয় আর একজন শহীদ। কিয়ামতের দিন জাহান্নামের ইন্ধন হবে। কেননা তাদের নিয়ত আল্লাহর সন্তুষ্টি ছিলো না। বরং লোক দেখানো এবং সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন উদ্দেশ্য ছিলো।

এখানে যদিও এলেম তালিম দানশীলতা শাহাদাতের বাহ্যিক রূপ আছে কিন্তু বাস্তবতা নাই। যার জন্য ফলাফল আসল না। আর পূর্বে আলোচিত সূরাতে যেখানে হাফেজে কুরআন বা হাজ্জী ও মুহাজির তাদের আমল পূর্ণ না করেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। কিন্তু পূর্ণ সাওয়াব ও প্রতিদান তারা পেয়েছে। কেননা সেখানে নিয়ত সঠিক হওয়ার সাথে সাথে তাদের মেহনতও ছিল যার কারণে কাজের বাস্তবতা সেখানে ছিলো। সুতরাং আমল পরিপূর্ণ না হলেও তারা সফল। আর এ দিকে আমল পরিপূর্ণ হওয়া সত্বেও তারা ব্যর্থ। এমনিভাবে শহীদের ব্যপারে রাসূল সা. এর ফরমান

حدثني أبو شريح أن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف حدثه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال (من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه) ولم يذكر أبو الطاهر في حديثه (بصدق)

- صحيح المسلم : 141/2 باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى. رقم الحديث:4893 - صحيح إبن حبان 465/7: رقم الحديث:3192 . - سنن أبي داؤود : 213/1 باب الإستغفار. رقم الحديث:1520 ،

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি সত্য দিলে আল্লাহর কাছে শাহাদাতের মৃর্তু্য কামনা কারে। (এবং তার জন্য চেষ্টা করবে কেননা তা ব্যতিত সততা থাকবে না।) তাহলে আল্লাহ

তা'য়ালা তাকে শহীদের মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দিবেন। যদিও নিজের বিছানায় তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়।

এখন এই হাদীসের আলোকে আমি আরজ করতে চাই যে, নববী যুগের উভয় ব্যক্তিই সাহাবী। এবং উভয়েই শহীদ। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, একজনের শাহাদাতের বাস্তবতার সাথে সাথে বাহ্যিক সুরত অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় জীবন উৎসর্গ করার সৌভাগ্য হয়েছে। আর আন্যজনের শুধু শাহাদাতের বাস্তবতা অর্জন হয়েছে। বাহ্যিক রূপ অর্জন হয় নাই।

অতএব যখন উভয়েই শহীদ। তবে দ্বিতীয় শহীদের এক বছরের নামাজ বেশী আছে। এবং অন্যান্য আমলও বেশী আছে। তাহলে অবশ্যই দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির চেয়ে আগে বেড়ে যাবে। তাহলে তো কোন প্রশ্ন বাকি থাকে না।

কেউ দিব্য শহীদ কেউ অর্থের বিচারে

উভয়েই সফল ভাই রবের দরবারে

একজন নামাজ , রোজায় অগ্রগামী তাই

প্রাধান্যের হেতু হল তার বর্ধিত আমল ভাই।

আমি যে বললাম, তার উভয়ে শহীদ ছিলেন তার কারণ স্পষ্ট। কেননা রাসূল সা. নিজে যখন বার বার শাহাদাতের মৃত্যুর তামান্না করতেন তখন কিভাবে সম্ভব যে, একজন সাহাবী শহাদাতের তামান্না করবেন না। এবং যুদ্ধের ময়দান থেকে তিনি পিছনে থেকে যাবেন। সাহাবায়ে কেরাম তো কাফেরদের সাথে যুদ্ধের জন্য ব্যকুল হয়ে থাকতেন।

একটি সংশয়

হ্যাঁ এখানে কারো এই সংশয় সৃষ্টি হতে পারে যে, রাসূল সা. কেন ব্যাখ্য দিয়ে বললেন না যেমন আপনি বললেন?

সমাধান-

বন্ধুরা! ওখানে এরকম প্রয়োজনই ছিল না। কেননা সাহাবায়ে কেরাম তো এমন সুক্ষ্ম বিষয়গুলো খুব ভালোই বুঝতেন। সকল হাদীস তাদের সামনে ছিলো। তাদের সংশয় শুধু এই ছিলো যে, যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে আগে গেল সে জান্নাতে কেন পরে গেল? রাসূল সা. এর ব্যাখ্যা করে দিলেন যে, (শাহাদাতের সাথে) অন্যান্য আমলের আধিক্য ছিল। যা তার আগে জান্নাতে প্রবেশের কারণ।

বিষেশ দ্রষ্টব্য:

আসলে তাদের এমন প্রশ্ন শুধু এজন্য সৃষ্টি হয়ে যে, আমরা সাহাবায়ে কেরামের জীবনকে আমাদের জীবনের মত মনে করি।

وشتانا بين هؤلاء وبين هؤلاء (তারা কোথায় আর এরা কোথায়) যে, আমাদের মধ্যে যেমন কিছু লোক এমন আছে যারা জিহাদ থেকে দূরে থেকে শুধু নামাজ, রোজা, পালন করে। (আল্লাহর পানাহ) হয়ত তাদের মধ্যেও এমন লোক ছিলো। বিষয়টি কখনোই এমন ছিলো না। বরং যারা জিহাদ থেকে পিছনে থাকত, তাদের বিশেষ কোন কারণ বা শরীয়ত সম্মত ওজর থাকত। নতুবা তারা তো এমন ছিলেন যে, বাবা ছেলের আগে এবং ছেলে বাবার আগে জিহাদে যাওয়ার জন্য পিড়াপিড়ি করত। উভয়ের মধ্যে লটারী হত। বাচ্চাদের মধ্যে জিহাদে অংশ গ্রহনের জন্য মল্লযুদ্ধ হত। এবং মহিলারা পর্যন্ত পবিত্র মদীনায় অবস্থান করাটা মেনে নিতে পারত না।

এখানে যাদের এই সংশয় সৃষ্টি হয়েছে তারা মনে করেছেন যে, খোদা না খাস্তা হয়ত এক বছর পর ইন্তেকালকারী সাহাবী আমাদের মতই নামাজ, রোজা, করেছেন,

জিহাদে অংশ গ্রহন করেন নাই। সুতরাং তার যেসব নামাজ (আমাদের নামাজের মত) জিহাদ ব্যতিত ছিলো, তা হয়ত জিহাদ ওয়ালা আমল ও শাহাদাতের চেয়ে আগে বাড়ার কারন হয়েছে। না না। কখনোই না। বরং তারা উভয়ে নামাজি রোজাদার হওয়ার সাথে সাথে উভয়েই মুজাহিদ এবং উভয়েই আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ কারী ছিলেন। এজন্য এখানে সংশয় সৃষ্টি হওয়ার মত কিছু নাই। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করেন। আমীন!!!!

সংশয় -১৮

বড় বড় মজলীস ও লাখো লোকের সমাবেশে আজ একটি কথা অত্যন্ত নির্লজ্জতা ও দুঃসাহসিকতার সাথে বলা হচ্ছে যে, শাসন ক্ষমতা দিয়ে কিছু হবে না। ওযির-উপদেষ্টা দিয়ে কিছু হবে না। শুধু আমলের উপর মেহনত কর। কেননা হদীস শরীফে আছে

فقد روي أعمالُكم عُمَّالُكم وكما تكونوا يولى عليكم .

- فيض القدير للمناوى: الجزء الخامس.

তোমাদের আমলই তোমাদের শাসক। অর্থাৎ যেমন আমল করবে তোমাদের উপর তেমন শাসক হবে। এবং আমাদের আমল জমীন থেকে আকাশে যেমন যাবে আকাশ হতে তেমন ফলাফল জমীনে আবতরণ করবে।

সুতরাং আমলের ফিকির কর। লড়াই করা, কাফেরদেরকে হত্যা করা ছেড়ে দাও। বসনিয়া , চেসনিয়, ফিলিস্তিন ও কাশ্মিরে আল্লাহর আযাব এসেছে। কেননা তারা নেক আমল ছেড়ে দিয়েছে। যখন আমাদের আমল ঠিক হয়ে যাবে। তখন এমনি এমনি শাসন ক্ষমতাও অর্জিত হয়ে যাবে।

সমাধান -১

আস্তাগফিরুল্লাহ! কত বড় কুফুরী কথা জবান দিয়ে উচ্চারণ করছে। এবং সহজ সরল লোকদেরকে বিষের বড়ির উপর চিনি লাগিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে। ঈমানের মেহনতের আড়ালে কুফুরীকে মজবুত করা হচ্ছে। অন্তরে নেফাকির বীজ বোপন করা হচ্ছে। এই মূলনীতিতো আমরা মানি যে, যেধরনের আমল জমীন হতে আকাশে যাবে, আকাশ হতে সে ধরনের ফায়সালা অবতরন হবে। কিন্তু এর দ্বারা এটা কিভাবে প্রমাণ করা সম্ভব হল যে, জিহাদ ছেড়ে দাও। কাফেরদেরকে হত্যা করা ছেড়ে দাও।

আল্লাহর পথে জিহাদ কি বদআমল (আল্লাহ ক্ষমা করুক) কাফেরদেরকে হত্যা করা কি আল্লাহ তা'য়ালার হুকুম এবং রাসূল সা. এর বরকতময় সুন্নত নয়? অস্ত্র রাখা কি আল্লাহ তা'য়ালার মোহাব্বতের আলামত নয়? মুজাহিদকে কি আল্লাহ তা'য়ালা

ভালোবাসেন না? জিহাদের ময়দানের অল্প কিছুক্ষন অবস্থান সত্তর বছর ঘরের ইবাদাত হতে উত্তম নয় কি? কাফেরকে হত্যার বিনিময়ে কি জান্নাতের সুসংবাদ নেই? একটি তীর নিক্ষেপের বিনিময়ে কি তিন ব্যক্তির জান্নাতের সুসংবাদ নেই?

বুঝা গেল যে, এধরনের শব্দ ও বাক্য (জিহাদ ছাড়ো, নেক আমল কর) উচ্চারণ কারীরা ঐ সমস্ত লোক যারা আল্লাহর পথে জিহাদকে নেক আমলের মধ্যে গন্য করে না। যদি বিষয় টি এমনই হয় তাহলে তাদের নিজ ঈমানের ফিকির করা উচিত।

সমাধান -২

এটাও চিন্তায় রাখা চাই যে, শরীয়তের প্রতিটি আমলের ফলাফল ভিন্ন ভিন্ন। প্রতিটি আমলের একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। যদিও প্রকৃত সফলতা তো আখেরাতের সফলতা এবং আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি। তবে দুনিয়তে প্রত্যেকটি আমলের একটি ফলাফল রয়েছে। যা তার দুনিয়াবি লক্ষ্য। যখন যমীন হতে কোন আমল আকাশে যায় তখন আকাশ হতেও তার ফলাফল যমীনে নেমে আসে। এমনি আল্লাহর পথে জিহাদেরও একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। যখন জিহাদ (অর্থাৎ এআমলটি) যমীন হতে আকাশে যাবে তখন তার ফলাফল তো আকাশ হতে যমীনে নেমে আসবে।

যমীনে জিহাদ হলে আকাশ হতে আল্লাহ তা'য়ালা ফেরেস্তাদেরকে সাহায্যের জন্য পাঠাবেন। যমীনে জিহাদ হলে আকাশ হতে আল্লাহ তা'য়ালার সাহায্য নেমে আসবে। কেননা ওয়াদা রয়েছে যে,

إِنْ تَنصُرُوا ٱللهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (سورة محمد:٧)

যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। এবং তোমাদের পা কে মজবুত করবেন। (সূরা মোহাম্মাদ-৭)

যমীনে জিহাদ না হলে আকাশ হতে মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা ও ইবাদাতখানা সমূহের সংরক্ষন নেমে আসবে না। বরং ধংস নেমে আসেবে।

وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً (سورة الحج: ٤٠)

যমীনে জিহাদ না হলে আকাশ হতে ফাসাদ ও ধংস নেমে আসবে।

وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتْ الأَرْضُ (سورة البقرة: ٢٥١)

যমীনে জিহাদ না হলে মুসলমানদের উপর আকাশ হতে লাঞ্চনা নেমে আসবে

عن ابن عمر ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم).

- سنن أبي داؤود :490/2 باب في النهى عن العينة . رقم الحديث:3462 - مسند أحمد:114/5 رقم الحديث:5562

যমীনে জিহাদ না হলে মুসলমানদের ঈমানী মৃত্যুর বদলে মুনাফেকী মৃত্যু আকাশ হতে নেমে আসবে।

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق.

- الصحيح لمسلم :141/2 باب ذَمِّ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ . رقم الحديث:4894 - المسند للإمام أحمد :29/9 رقم الحديث:8851 ، - سنن أبي داوود:339/1 باب كراهية ترك الغزو . رقم الحديث:2502

সারাংশ ঃ

আপনার এই মূলনীতি জেনেই একথা বলতে হয় যে, যখন যমীন হতে আকাশে জিহাদ (আমলটি) যাবে, তখন আকাশ হতে মর্যাদা, যান-মাল ও ঈমানের হেফাজত, খেলাফত, হুদুদুল্লাহর কায়েম নেমে আসবে। নতুবা লাঞ্ছনা, গোলামী, ফাসাদ ও ধ্বংস নেমে আসবে। কেননা এ বিষয়গুলো জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত।

আল্লাহর কসম করে বলছি, যদি সমগ্র পৃথিবীর মুসলমান জামাতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে বরং তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত এবং আউয়াবিনেরও পাবন্দ হয়ে যায়, যাকাত-সদকা আদায় করে, শুধু রমজান না বরং প্রতি সোম ও বৃহ:বার আইয়্যামে বীয, আশুরা এবং জিলহজ্জের দশ রোজাও রাখে এবং সারা দিন কুরআন তেলাওয়াত ও যিকিরে কাটায়, সারা রাত জায়নামাজে অতিবাহিত করে, হারাম খাওয়া ছেড়ে দেয়, তারপরেও খোদার কসম! খোদার কসম! জান-মাল ইজ্জত ও ঈমানের হেফজত, এবং খেলাফত কায়েম ঐ সময় পর্যন্ত হবে না, যতক্ষন না এই উম্মত জিহাদ শুরু করে। কেননা এবিষয় গুলোর অস্তিত্ব ও স্থায়ীত্ব নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাতের সাথে নয় বরং এগুলোর সম্পর্ক জিহাদের সাথে। নামাজ, রোজা, হজ্জ ভিন্ন ভিন্ন ফরজ, যার فرضية দুরের কথা أهمية এর অস্বীকারও কুফুরী-

শক্তি যদি ব্যয় না কর ওহে মুমিনগন

ফাসাদ থেকে পাবে না মুক্তি তোমরা চিরন্তন।

নামাজ, রোযার সাওয়াব তো ভাই আপন জায়গায় রবে,

কিন্তু যে ভাই দ্বীন প্রতিষ্ঠা জিহাদ দ্বারাই হবে।

এজন্যই যদি নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত এবং যিকির ও তেলাওয়াতের মাধ্যমে খেলাফত প্রতিষ্ঠা হত, আল্লাহর মদদ চলে আসত, ইসলাম ছড়িয়ে পড়ত, কাফেররা দুশমনি হতে বিরত থাকতো তাহলে কমপক্ষে রাসূলুল্লাহ সা. তার নিরস্ত্র নামাজী,

রোজাদার , কুরআন তেলাওয়াত কারী সাহাবা রা. কে ময়দানে নিয়ে কতল করাতেন না। এবং কাফেরদেরকেও কতল করে জাহান্নামেও ফেলতেন না। সাহাবায়ে কেরামও মক্কা মোকার্‌রমার হেরেমের নামাজ এবং মদিনা মুনাওরার মাসজিদে নববীতে রাসূলুল্লাহ সা. এর নামাজের এক্তেদা ছেড়ে কুফুরী রাষ্ট্রে গিয়ে যুদ্ধ করতেন না।

বরং দেখুন মু'তার যুদ্ধের সময় হযরত যায়েদ বিন হারেসা রা. কে বাহিনী প্রধান বানিয়ে রাসূলুল্লাহ সা. রওয়ানা করান এবং বলেন, যদি যায়েদ শহীদ হয়ে যায়। তাহলে জাফর বিন আবু তালিব। যখন সে শহীদ হয়ে যাবে তখন আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা। যখন সে শহীদ হয় যাবে তখন যাকে ইচ্ছে বাহিনী প্রধান বানিয়ে নিবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা এটা চিন্তা করে যে, এখন শাহাদাত তো ইয়াক্বীনি। শেষ নামাজ প্রিয় নবীজির পিছনে পড়ে যাই। ঘোড়া খুব দ্রুত গামী। (অর্থাৎ বাহিনী সকালে রওয়ানা হলেও আমি জুমার পর রওয়ানা হয়ে তাদেরকে ধরে ফেলতে পারবো।) সর্বোত্তম দিন জুমার দিনে মসজিদে হারামের পর সর্বোত্তম মসজিদ মসজিদে নববীতে সর্বশ্রেষ্ঠ ইমামের পিছনে নামাজ পড়বেন। যখন রাসূল সা. এর দৃষ্টি তার উপর পড়লো তখন তিনি তাকে এ ব্যপারে জিজ্ঞাসা করলে হযরত আব্দুল্লাহ আরজ করলেন: মনে চাচ্ছিলো যে, প্রিয় নবীজির পিছনে নামাজ পড়ব, এর পর দ্রুতগতিতে ঘোড়া হাঁকিয়ে সাথিদের সাথে মিলবো। তখন রাসূলুল্লাহ সা. বললেন: যদি তুমি দুনিয়ার সমস্ত জিনিস আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে দাও তারপরও তাদের সকালের একটি সফর এবং তার সাওয়াব হাসিল করতে পারবে না।

এজন্য এধরনের কথা (জিহাদ ছাড়ো...) যবানে উচ্চারণ করে নিজের আখেরাত বরবাদ করবেন না। ঈমানকে নেফাক দ্বারা পরিবর্তন করবেন না। জিহাদের গুরুত্ব কমাবার চেষ্টা করবেন না। কেননা জিহাদের গুরুত্ব অতীতেও কমেনি এবং ভবিষ্যতেও কমবে না। শরীয়তের প্রতিটি আমলকে স্বস্থানে রাখুন। এটাই দ্বীন এর নামই ইসলাম, এর নামই ঈমান এবং এর নামই আদর্শ। নতুবা কবির ভাষয়:-

স্তর বিন্যাস যদি না কর হে

যিন্দিকের খাতায় নাম যাবে তবে।

সংশয় -১৯

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন যে, রাসূল সা. এরশাদ করেছেন:

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (خير الصحابة أربعة ، وخير السرايا أربع مائة ، وخير الجيوش أربعة آلاف ، ولا يغلب اثنا عشر الفا من قلة) .

- سنن الترمذى: 283/1 باب ما جاء في السرايا. رقم الحديث:1544 - سنن أبي داؤود : 351/1 باب فيما

يستحب للجيوش. رقم الحديث: 2611 - الصحيح لأبن خزيمة : 140/4 رقم الحديث: 2538،

অর্থাৎ উত্তম সঙ্গী হলো চার জন, এবং ছোট বাহিনী গুলোর মাঝে উত্তম হলো চারশ জনের বাহিনী। এবং বড় বাহিনী গুলোর মাঝে উত্তম হলো চার হাজার জনের বাহিনী আর বার হাজার জনের বাহিনী সংখ্যা সল্পতার কারণে পরাজিত হবে না।

সমাধান -১

ইসলাম ও কুফুরের মাঝে চলমান যুদ্ধ তো শেষ পর্যন্ত একটি যুদ্ধই। আর যুদ্ধের ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি স্বরণ রাখবে যে, والحرب سجال অর্থাৎ যুদ্ধ হলো কুপের বালতির ন্যায়। কখনো এক দল নেয় তো অন্য সময় অন্য দল। সর্বদাই এক ব্যক্তিই তা ধরে না। এবং এটা ঐ নীতি যা উহুদ যুদ্ধে মুসলমাদেরকে সাময়িক পরাজয়ের পর কাফের সর্দার আবু সুফিয়ান (যিনি পরবর্তিতে মুসলমান হয়েছেন) বলেছিল। يوم بيوم ببدر والحرب سجال যে, আজ আমাদের জয় বদরের পরাজয়ের পরিবর্তে। আর যুদ্ধতো হলো কুপের বালতির মত কখনো্ উপরে কখনো নিচে।

এ ছাড়াও আবু সুফিয়ান আর কিছু বাক্য ও ধ্বনি দিয়েছিল যেগুলোর জবাব রাসূল সা. সাহাবাদের মাধ্যমে দিয়েছেন। কিন্তু এই বাক্যের জবাব না স্বয়ং রাসূল সা. দিয়েছেন। না কারো মাধ্যমে দিয়েছেন। তার কারণ হযরত মাওলানা ইদ্রীস কান্ধলবী রহ. সীরাতে মুস্তফার ৩য় খন্ডে লিখেছেন যে, আবু সুফিয়ানের এই বাক্য الحرب سجال। যেহেতু হক্ব ছিল তাই তার জবাব দেন নাই। এবং আল্লাহ তায়ালার এই এরশাদ : وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ তার এই কথার সমর্থন করে।

এই জন্য কোন যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় হওয়াও এই নীতির ভিত্তিতে দেখা হবে।

ফায়েদাঃ-

الحرب سجال। এই নীতিকে কোন সাধারণ নীতি মনে করবে না। কেননা এই নীতি তো এখন حديث تقريرى দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। এবং তা দলিল হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

ফায়েদাঃ-

অতি সংক্ষেপে বলছি যে, হাদীস বলা হয় রাসূল সা. এর কথা কাজ ও সমর্থনকে। আর যখন সমর্থন (تقرير) এর অর্থ হলো যে, কোন ব্যক্তির কোন কাজকে রাসূল সা. জানা সত্ত্বেও তা থেকে নিষেধ করেন নাই বরং তা বলবৎ রেখেছেন।

সমাধান -২

এই হাদীস দ্বারা তো এই কথা জানা যায় যে, মুসলমান বাহিনী যদি বার হাজারের হয় তবে কখনই তারা সংখ্যা লঘুর কারনে পরাজিত হবে না। কিন্তু এই কথার মতলব কখনই এইটা না যে, তারা অন্য কোন কারনেও পরজিত হবে না। যেমন: যদি রসদ আমদানী বন্ধ করে দিল এবং যুদ্ধের সামান তথা যুদ্ধাস্ত্র অকেজ হয়ে গেল। এবং বিশেষ ভাবে যখন মুসলমানরাই কাফেরদের দালালী করে তো তখন মুসলমানদের পরাজয় কেন হবে না।

সমাধান -৩

কখনো কখনো মুসলমানদের পরাজয়ের মাঝে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ কিছু হেকমত নিহিত থাকে, যা শুধু পরাজয়ের মাঝে পাওয়া যায়। বিজয়ের মাধ্যমে নয়। যেমন:

১. যাতে ভালো-খারপ, কাঁচা-পাকা এবং মুখলেছ ও গায়েরে মুখলেছ পৃথক হয়ে যায়।

২. যাতে পরাজিত হয়ে আল্লাহর দরবারে অক্ষম-অপদস্ত ও অসহায়ত্বের সাথে ফিরে। আর এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে ভবিষ্যতে সম্মান ও বিজয় দান করবেন।

৩. যাতে মুসলমানদের অন্তরে আত্মতৃপ্তি বড়ত্ব ও গর্ব সৃষ্টি না হয়। যে গুলোর কারণে আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতা বন্ধ হয়ে যায়। যেমনটি হুনাইন যুদ্ধে হয়েছিল।

৪. যাতে পরজিত হয়েও মুসলমানরা সত্যের উপর অটল থাকার কারণে তাদের মর্যদা বৃদ্ধি হয়। এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়।

৫. যাতে শহাদাতের তামান্না এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশাবাদীদের শাহাদাতের নেয়মত নছীব হয়।

৬. যাতে এই শাহাদাতের বিনিময়ে মুসলমানদের গুনা এবং ভূল-ত্রুটি মাফ হয়ে যায়। এবং পাক-পবিত্র হয়ে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হয়।

৭. যাতে আল্লাহ তা'য়ালা কাফেরদেরকে নিঃশেষ করেদেন, কেননা যখন আল্লাহর বিশেষ বান্দারা যুদ্ধে শহীদ হন তখন আল্লাহ তা'য়ালার গায়রতে (আত্মমর্যাদায়) যোশ মারে এবং নিজের বিশেষ বান্দা ও বন্দুদের দুশমনদেরকে পরিপূর্ণভাবে মিটিয়ে দেন।

৮. যাতে কাফেররা বেশি বেশি বীরত্ব ও দাম্ভিকাতার সাথে ময়দানে আসে এবং চিরদিনের জন্য নি:শেষ হয়ে যায়।

৯. যাতে এই কথা সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, আল্লাহ তা'য়ালার নীতি হলো যে, তিনি অন্তর সমূহকে ঘুরিয়ে দেন। কখনো বন্ধুদেরকে এবং কখনো দুশমনদেরকে বিজয় দেন।

কিন্তু সর্বশেষ ফলাফল এবং শেষ পরিনামে বিজয়তো আহলে হকেরই থাকবে। আল্লাহ তা'য়ালা সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

প্রেমিকের তারে প্রানোৎসর্গকারী যখনই পরীক্ষা হয়,

হাজার লোকের পরাজয় সে তো অসম্ভব কিছু নয়।

প্রিয়জনকে সফলতা দেন মাওলা প্রেমের পরীক্ষা নিয়ে

কখনও বিজয়, কখনও নুসরাত, কখনও শহাদাত দিয়ে।

সতর্কীকরণঃ

এই জন্য আমার ভাইও দোস্ত বুযুর্গ আপনাদের নিকট আবেদন হলো যে, এই হাদীস এবং এর মত অন্য হাদীসগুলোকে বুঝার চেষ্টা করুন। আর যদি বুঝে না আসে তবে কোন নির্ভরশীল আলেমকে জিজ্ঞাসা করুন

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ (سورة الأنبياء: ٧)

সুতরাং আল্লাহর নিকট শরমেন্দিও লজ্জিত হও এবং না বুঝে মুজাহিদীন ও জিহাদের উপর আপত্তি তুলে অজান্তে কাফেরদের সহযোগিতা করো না। এবং নিজের আখেরাতকে বরবাদ করো না। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে আখেরাতের ফিকির করার তাওফিক দান করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন!!!!

আবেদনঃ-

যদি কখনো কোন দিক থেকে মুসলমানদের পরাজয়ের সংবাদ আসে তবে এর কারণে মুজাহিদীনের আমালে সালেহাতে কিড়া বাহির করার চেষ্টা না করে নিজের মধ্যে চিন্তার দৃষ্টিতে দেখা যে আমাদের কোন বদ আমলের পরিনামে মুজাহিদীনদের পরাজয় হয়নি তো? এবং এ বিষয়েও চিন্তা করা উচিত যে, এমন মুহুর্তে মুজাহিদীনদের যখমীতে লবণ ছিটানো নয়। বরং তাদেরকে হিম্মত দেয়ার প্রয়োজন। এই জন্য এমন মুহুর্তে মুজাহিদীনদেরকে বেশী বেশী করে সর্ব প্রকার জানি-মালি ও যবানি সাহায্য করার সাথে সাথে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট মুজাহিদীনদের বিজয় ও

নুসরাত এবং কাফেরদের পরাজয়ের জন্য নিয়মিত দোয়া করা চাই। এবং ইসলামের সাধারণ ক্ষতিকেও নিজের ক্ষতি মনে করা চাই।

সমাধান -৪

মুজাহিদীনদের পরাজয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত কারীদের আফগানিস্তানে মুজাহিদীনদের ঐতিহাসিক বিজয়ের প্রতি ও দৃষ্টি দেওয়া চাই, যেথায় নিরিহ মুজাহিদগণ আল্লাহর ফজল ও করমে দুনিয়ার সুপার পাওয়ার শক্তিকে পরাজিত করে দিয়েছেন।

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ

সমাধান -৫

এবং অন্যান্য স্থানে চলমান জিহাদের ব্যপারে এই কথা তো বলতে পারো যে, বিজয় বিলম্বিত হচ্ছে। কিন্তু ইহা বলতে পার না যে, মুজাহিদীনরা পরাজিত হচ্ছে। বরং পরাজয় তো কাফেররাই হচ্ছে। যা তারা নিজেরাই স্বীকার করছে।

সংশয় -২০

জিহাদের জন্য ইসলামি রাষ্ট্র ও মারকাজ প্রতিষ্টা করা পূর্ব শর্ত। ইসলামি রাষ্ট্র ছাড়া জিহাদ করা জায়েয নেই। কারন রাসূল সা. যত দিন পর্যন্ত মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্টা করতে পরেননি ততদিন জিহাদের কজ শুরু করেননি।

সমাধান -১

জিহাদ দু'প্রকার ক. ইকদামী (আক্রমন মূলক)

খ. দিফায়ী (প্রতিরক্ষা মুলক)

আক্রমন মূলক জিহাদ

ইসলামের মান-মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফরয জিহাদের কাজ অব্যাহত রাখার জন্য মুসলমানদের শক্তিশালী একটি দল কাফেরদের মুখোমুখি হয়ে লড়াই করা। এধরনের জিহাদ ফরজে কিফায়া। এমন কাজে অংশগ্রহণের জন্য পিতা-মাতার অনুমতি নেয়া এবং আক্রমন করার আগে কাফেরদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেয়া শর্ত। কেউ কেউ উভয় পক্ষের শক্তি সমপরিমাণ হওয়ার কথাও উল্লেখ

করেছেন। একইভাবে উক্ত জিহাদী কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য একটি মারকাজ ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র থাকা যেমন আবশ্যক, তেমনিভাবে এ জিহাদী অপারেশনের ধারা অব্যাহত রাখাও আবশ্যক। যদি একটি মুহুর্তের জন্য এই কাজের ধারা বন্ধ হয়ে যায় তবে গোটা উম্মত গুনাহগার হবে। কিছু লোক এ দায়িত্ব পালন করলে গোটা উম্মত গুনাহ থেকে বাচতে পারবে। যেমন জানাজা নামাজের ক্ষেত্রে একই কথা। কিছু মানুষ আদায় করলে অন্যরা গুনাহ থেকে বেচে যায়।

প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ

কাফেররা যখন কোন মুসলিম দেশে আক্রমণ করে অথবা কোন মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা দখল করে নেয় যেখানে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন কুফুরী শক্তির প্রতিরোধ করা এবং অস্তিত্ব রক্ষা ও প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ ফরজ হয় সর্বপ্রথম প্রতিবেশী মুসলমানদের উপর। তারা যদি সংখ্যায় কম থাকে অথবা প্রতিরক্ষার কাজটি আঞ্জাম দিতে না পারে তখন কাফেরদের প্রতিহত করা সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানদের উপর ফরজ। প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের জন্য কোন শর্ত নেই। আক্রমনকরার আগে কাফেরদের ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেয়া, ইসলামী রাষ্ট্রও সরকার প্রতিষ্ঠা করা, পিতা-মাতার অনুমতি নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। গোলাম-বাদি তার মালিকের অনুমতি ছাড়াই জিহাদে অংশ গ্রহন করতে পারবে।

আর সারাবিশ্বে যে সব রাষ্ট যুদ্ধ হচ্ছে সবই দিফায়ী-প্রতিরক্ষামূলক। ইক্বদামী-অক্রমনাত্মক যুদ্ধ কোন ভুখন্ডে নেই বললেই চলে। তবে অতি সত্তর আল্লাহ তা”য়ালা এমন অবস্থার সৃষ্টি করবেন ফলে ইক্বদামী জিহাদও শুরু হয়ে যাবে।

২. প্রশ্নে আরেকটি অংশ ছিলো রাসূল সা.ইসলামী রাষ্ট্রও মারকাজ প্রতিষ্ঠা করার আগ পর্যন্ত তার উপর জিহাদের বিধান নাযিল হয়নি। এক্ষেত্রে বলবো ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

করা যদি জিহাদের পূর্ব শর্ত হিসাবে উল্লেখ করা হয় তাহলে আপনার কাছে আমার প্রশ্ন রাসূল সা. ইসলামী রাষ্ট্র ও মারকাজ প্রতিষ্ঠা করার পর রোযা, যাকাত, মিরাছসহ যে সব বিধি বিধান নাযিল হয়েছিলো, এগুলো পালন করার জন্য কি ইসলামী রাষ্ট্র ও মারকাজ প্রতিষ্ঠা করা শর্ত ছিল? আপনি বলবেন, না। এসব বিধান পালন করার জন্য ইসলামী শরীয়া প্রতিষ্ঠা পূর্ব শর্ত ছিলোনা। আমরাও বলি শর্ত ছিলো না। আর এটাই বাস্তব সত্য তাহলে শুধু শুধু জিহাদের জন্য এমন শর্ত উল্লেখ করা হয় কেন? আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনের সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন!

দোস্ত আমার জিহাদ যদি

শুদ্ধ না হয় রাষ্ট্রীয় আমীর ছাড়া।

রোজা, যাকাত, মীরাছ বন্টন

করছি কিন্তু সেথায় আমীর কারা?

৩. স্বয়ং যুদ্ধ জিহাদ করা হয় এক মাত্র ইসলামী রাষ্ট্র ও খেলাফত প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এখন আবার যদি জিহাদের জন্য খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাহলে অযৌকক্তিক কথা বার্তার অবতারণা ঘটবে। যাকে মান্তেকের পরিভাষায় দাওর বলে। আর দাওর বাতিল। সুতরাং জিহাদ পরিচালোনার জন্য খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা পূর্ব শর্ত এমন কথা বলা অবাস্তব-অবান্তর।

৪. ইসলামী রাষ্ট্র ও আমীর ছাড়া জিহাদ করা জায়েয। আবু বাসির রা. এর ঐতিহাসিক ঘটনাও আমাদের জন্য নিরব স্বাক্ষী। নবী যুগের এই ঘটনার দিকে দৃষ্টি পাত করলে বিষটি সহজে বুঝে আসবে।

ষষ্ঠ হিজরীতে রাসূল সা. উমরা পালনের ইচ্ছায় মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন। হুদাইবিয়া নামাক জায়গা পর্যন্ত আসার পর কাফেররা মুসমানদের অগ্র যাত্রা থামিয়ে

দেয়। তখন রাসূল সা. এর সাথে মক্কার মুশরিকদের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাহ্যিক ভাবে এমন চুক্তি মেনে নেয়া মুসলমানদের পক্ষে ছিলো কঠিন ব্যপার। চুক্তির অন্যতম একটি শর্ত ছিলো এই- কেউ যদি মক্কা থেকে মুসলমান হয়ে মদিনায় চলে যায়, তাকে ফেরত পাঠাতে হবে। তবে কেউ যদি মদিনা থেকে মুরতাদ হয়ে মক্কায় ফিরে আসে তাকে মদিনায় ফেরত পাঠানো হবে না। চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সময় হযরত আবু বাছির রা. মুসলমান হয়ে মক্কা থেকে মদিনায় চলে আসলেন। তখন কাফেররা তাঁকে ফেরত নিয়ে যেতে চাইলে রাসূল সা. চুক্তি ও অঙ্গিকার রক্ষার্থে মক্কা থেকে আগত দুই ব্যক্তির নিকট তাকে হস্তান্তর করলেন। আবু বাছির রা. নিয়ে তারা মক্কার পথে রওয়ানা হলো। মাঝ পথে আবু বাছির রা. লোক দু'জনকে বললেন, তোমাদের হাতের তলোয়ার গুলো খুবই শানদার-চমৎকার। আমি একটু দেখি তলোয়ার গুলোর ধার কেমন! আবু বাছির রা. এর হেয়ালি কথায় কাফের দু'জন উল্লেসিত হয়ে উঠে এবং এই বলে আবু বাছির রা. এর হাতে তলোয়ার তুলে দেয় যে, এটা দিয়ে আমি অনেক মানুষের কাজ সমাপ্ত করেছি। তলোয়ার পেয়ে আবু বাছির রা. গর্জন দিয়ে উঠলেন। মুহুর্তেই এক জনকে ধরাশায়ী করে ফেললেন। আর অন্যজন কোন রকম পালিয়ে যায়। তারপর আবু বাছির রা. রাসূল সা. এর দরবারে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি চুক্তি অনুযায়ী আমাকে তাদের নিকট হস্তান্তর করেছেন। কিন্তু তাদের সাথে আমার সাথে কোন চুক্তি ছিলো না বলে আমার যা করার প্রয়োজন ছিলো আমি তা করেছি। এর পর তিনি আশংকা করলেন যে, কাফেররা যদি আবার রাসূল সা. এর কাছে আমাকে ফেরত নেয়ার আবেদন করে, তিনি পুনরায় আমাকে হস্তান্তর করে দিবেন। তাই এবার তিনি মদিনা থেকে অনেক দূর সমূদ্রের কিনারে গিয়ে একটি ঘাঁটি স্থাপন করেন। এখন মক্কায় যে কেউ মুসলমান হন তিনি সোজা আবু বাছির রা. এর ঘাঁটিতে এসে যোগদান করেন। যার ফলে এখানে ক্ষুদ্রতম একটি গেরিলা বাহিনী গড়ে ওঠে। তারা সংখায় ছিলেন সত্তর জন। তবে আল্লামা সুহাইলি রহ. তিনশ জনের কথা উল্লেখ করেছেন। (যুরকানী /২)

এদিকে তারা কাফেরদের বানিজ্যিক পথ বন্দ করে দিলেন। যখনি কোন বনিক দল এখানে আসে আকস্মিক ভাবে তাদের উপর আক্রমন করেন। এবং তাদের সাথে লড়াই করেন। এসব গেরিলা হামলার ভয়ে কাফেররা চরম আতংকিত হয়ে পড়ে। বাচার কোন পথ না পেয়ে তারা রাসূল সা. এর কাছে সমজতার প্রস্তাব নিয়ে আসে। আপনি আপনার কাজ করে যান, আমরা আপনার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবো না। তবে আপনি ঐ লোকগুলোকে আপনার কাছে নিয়ে আসেন। এখানে লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে, আবু বাছির রা. ও তার সঙ্গী সাথিরা কোন আমীরের অধিনে যুদ্ধ করেছেন? তাদের যুদ্ধ অভিযান যে শরীয়ত সম্মত ছিলো তার সাবচে বড় প্রমান হলো রাসূল সা. তাদের ব্যপারে সব কিছু জানা সত্বেও চুপ ছিলেন। অর্থাৎ মৌখিক ভাবে তাদের কাজের স্বীকৃতি না দিলেও আন্তরিক ভাবে ঠিকই স্বীকৃতি দিয়েছেন।

“আওসাফ” পত্রিকায় প্রকাশিত আমার উস্তাদ মাওলানা যাহেদ আররাসেদী সাহেবের প্রবন্ধটি এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করছি। আলোচ্য বিষটি বুঝতে আমাদের জন্য যতেষ্ঠ সহায়েক হবে বলে আসা করি।

“কোন যুদ্ধ শরয়ী জিহাদ হওয়ার পূর্ব শর্ত হলো সেখানে যথা-রীতি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং আমীরুল মুমিনীন এর পক্ষ থেকে জিহাদের ঘোষনা করা। যে ভূখন্ডে ইসলামী শাসন বর্তমান নেই। অথবা শাসকরা অমুসলিমদের কাঁতারে শামিল। এবং কুফুরি শক্তির প্রভাবে কাফেরদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে থাকে, সেখানে জিহাদ করা ফরজ। এ ঘোষনাটি করার দায়িত্ব বর্তায় ওলামায়ে কেরামের উপর। এটি ফিক্বাহ শাস্ত্রের একটি সর্বজন স্বীকৃত মূলনীতি। বিষয়টি এভাবে বুঝতে পারি, অনেক শরয়ী বিধান এমন রয়েছে যার কার্জকারিতা নির্ভর করে রাষ্ট্র সরকারের উপর। কিন্তু সেখানে ইসলামী হুকুমত নেই। অথবা মুসলিম শাসক আছে কিন্তু সে এসব বিধান চালু করার দায়িত্ব গ্রহণে গড়িমসি করে, তখন আপনার করণীয় কি? যেমন সালাত কয়েম করা, দুই ঈদ ও জুমার নামাজ কায়েম করা, বিবাহ তালাকের জটিলতা নিরসন করা, যাকাত উসুল ও বন্টন করা সহ অনেক বিধান রয়েছে। এগুলো পালন করার ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরাম যথার্ত ভূমিকা পালন করে থাকেন।

যুগে যুগে ওলামায়ে কেরাম এ ফরজ দায়িত্ব সুন্দর ভাবে আঞ্জাম দিয়ে আসছেন। একই ভাবে যেখানে মুসলিম শাসক নেই। অথবা সেই মুসলিম শাসকটি কাফেরদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে ব্যস্ত তখনকার অবস্থার প্রেক্ষিতে জিহাদের যে তাকাযা আসে সে স্থানে নেতৃত্ব দিয়ে শূণ্যতা পূরণ করা ওলামায়ে কেরামের উপর ফরজ। তাদের ফতোয়া ও ঘোষনার মাধ্যমে যে আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু হবে, সেই সংগ্রামই শরয়ী জিহাদের রুপে রুপান্তরিত হবে।

সংশয় -২১

বুঝলাম জিহাদ করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা পূর্ব শর্ত নয়। কিন্তু একজন আমীর থাকাতো অবশ্যই শর্ত। যতক্ষণ পর্যন্ত নেতৃত্ব দেয়ার মত একজন আমীর না থাকবে সেটা শরয়ী জিহাদ হবে না । বর্তমানে যতগুলো জিহাদী গ্রুপ কাজ করছে, সবার আমীর ভিন্ন ভিন্ন, সবাই তো এক আমীরের অধীনে নেই। সুতরাং তাদের জিহাদ শরয়ী জিহাদ বলে বিবেচিত হবে না ।

সমাধান -১

এমন প্রশ্ন করা অসম্ভব। কুরআন, সুন্নাহ, ফিক্বাহ ও ইসলামী ইতিহাসে এর কোন ভিত্তি নেই। এই ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করা ফিক্বাহ শাস্ত্র ও ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচয় বহণ করে। বরং এ কথার আড়ালে আছে এক গভীর ষড়যন্ত। যা সাধারণ ভাবে বুঝে আসে না।

কাফেরদের মোকাবেলা যদি করতে হয়

তুনিরের মাঝে বন্ধু! তীর থাকতে হয়।

প্রত্যয় নিষ্ঠা সাহস হল জিহাদের মূলধন

অযথাই বলে জিহাদের লাগি এক আমীরের প্রয়োজন!

প্রকৃত কথা হল, ইংরেজদের বিরুদ্ধে যখন বিভিন্ন শ্রেণীর ওলামায়ে কেরাম জিহাদের ঘোষণা করলেন, তখন ইংরেজরা ভাল করে বুঝতে পারল যে সামনে তাদের ব্যর্থতা ও পরাজয় ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তাই তারা বড় ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে শুরু করল। তাদের এজেন্ট মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানির মাধ্যমে লিফলেট লিখে প্রচার করে , তার বক্তব্যের ভাষ্য ছিল এই “হে মুসলমানগণ, তোমাদের উপর জিহাদ ফরজ নয়। কারন তোমাদের সমরশক্তি কম। আর সমরশক্তি ছাড়া যুদ্ধ-জিহাদ করা যায় না। তোমাদের আমীর একজন নয়। এক আমীর ছাড়া জিহাদ করা যায় না।”এসব কথার সূত্রপাত একারনেই হয়েছে যে, এই ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তারা মুসলমানদের জিহাদী শক্তি দূর্বল করার চেষ্টা করেছে।

২. ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে জিহাদ দুই প্রকার।

ক.ইক্বদামী-আক্রমণমূলক।

খ.দিফায়ী-আত্মরক্ষামূলক।

এই দ্বিতীয় প্রকার জিহাদের জন্য কোন শর্ত নেই। বর্তমান সময়ে পৃথিবীর নানা প্রান্তে যেসব যুদ্ধ হচ্ছে সবই দিফায়ী ও আত্মরক্ষামূলক।

৩. বেশি উদাহরণের প্রয়োজন নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর উপর নজর ফিরালে দেখতে পাবেন সমগ্র পৃথিবীর আনাচে-কানাচে কতগুলো ইসলামী আন্দোলন ও জিহাদী কার্যক্রমের সূচনা হয়েছিল। কিন্তু সবার আমীর ছিল ভিন্ন। শামেলীর যুদ্ধ ময়দান থেকে শুরু করে ইমাম শামেলের যুদ্ধ পর্যন্ত সেই সব ইতিহাসে ভরা।

৪. “একজন আমীর থাকা আবশ্যক” এমন শর্ত আরোপ করলে পৃথিবী থেকে জিহাদ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কারণ বর্তমান সময়ে পৃথিবীর কোন ভূখন্ডে ইসলামী শাসন র্ববস্থা

না থাকায় আত্মমর্যাবোধসম্পন্ন মুসলমানগণ পৃথিবীর প্রান্তে-প্রান্তে জিহাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। অথচ কুফুর কর্তৃক দেশ ও সীমান্ত বিভক্তির জটিলতায় আমীর এক হওয়া তো দূরের কথা-পরস্পর সামান্যতম যোগাযোগ রাখাও দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

৫. এ ক্ষেত্রে হযরত আবু বাছির রা. এর জিহাদী কার্যক্রম আমাদের আদর্শ ও পথ প্রদর্শক। মদীনায় রাসূল সা. ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারপরও তিনি সায়্যিদুল মুরসালীন, আমীরুল মুজাহিদীন এর পরমিশন ছাড়া জিহাদী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের ভেতর স্বতন্ত্র একজন আমীর রয়েছেন। তাহলে যেখানে রাসূল সা. উপস্থিত রয়েছেন, তারঁ আদেশ ছাড়া অন্যরা জিহাদ করবে বিষয়টা কতটা বিস্ময়কর! কিন্তু এখানে বাস্তব সত্য এটাই যে, এক আমীরের অধীনে কখনও জিহাদ করা সম্ভব হত না। কারন হযরত আবু বাছির রা. যদি রাসূল সা. এর আদেশক্রমে জিহাদ করতেন তাহলে সেটা হত হুদায়বিয়ার সন্ধির পরিপন্থি। নাউযুবিল্লাহ, রাসূল সা. চুক্তি ভঙ্গ করবেন! এমন তো কল্পনাও করা যায় না। সুতরাং এখানে জিহাদ অব্যাহত রাখার পথ ছিল একটাই। পৃথকভাবে একজন আমীর নির্ধারণ করে জিহাদ করা। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সব সময় জিহাদ করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

হাশরের দিন এই অজুহাত চলবে না বন্ধু কভু

পৃথিবীর বুকে হকের আমীর ছিল যে কেউ প্রভু

কখনও কি বিবেক বলেনি তোমায় চলতে রনাঙ্গনে,

সামর্থ হারিয়ে ছিলে কি তুমি রিক্তহস্ত বণে।

সংশয় -২২

যুদ্ধ-জিহাদ করতে হলে মুসলমানদের শক্তি, সৈন্য সংখ্যা, অস্ত্র-শস্ত্র কাফেরদের তুলনায় বেশী না হলেও অন্তত সমান সমান থাকা আবশ্যক। মুসলমানদের সমরশক্তি ও পর্যাপ্ত পরিমাণ গোলাবারুদ ছাড়াই যদি যুদ্ধ চালিয়ে দেয় সে যুদ্ধ হবে আত্মহত্যার শামিল। আর আত্মহত্যা হারাম। শরীয়ত কখনও এর বৈধতা ও অমুমোদন দেয় না।

সমাধান -১

জিহাদ করার সবচে’ বড় হাতিয়ার হল ইখলাস, সবর, তাওয়াক্কুল ও ঈমানী শক্তি। জিহাদের মূল প্রাণ শক্তি হল ঈমান। আর মুসলমানদের আদেশ দেয়া হয়েছে, প্রত্যেকে যেন তার সাধ্যানুযায়ী উপকরণ সামগ্রী নিয়ে রনাঙ্গণে চলে আসে।

একজন সাচ্চা মুসলমান যখন আল্লাহর উপর ভরসা করে রনাঙ্গণে চলে আসে, নিজেকে আল্লাহর নিকট অর্পণ করে, কাকুতি মিনতি করে দুআ করে, হে আল্লাহ! আমার যতটুকু প্রস্তুতি নেয়া সাধ্যে ছিল প্রস্তুতি নিয়েছি, যা করার দরকার ছিল তা করেছি, শত্রু মোকাবেলায় এসেছি। এখন শত্রুর উপর বিজয় দান করা তোমার কাজ।

তুমি আমাদেরকে বিজয় দান কর । আমীন! আল্লাহ তায়ালা তখন আসমান থেকে ফেরেশতা নাযিল করে তাদের সাহায্য করেন। ইরশাদ হচ্ছে-

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنْ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ (١٢٤)

"স্বরণ কর ঐ সময়ের কথা যখন আপনি মুমিনদেরকে বলেন, রব তোমাদেরকে আসমান থেকে তিন হাজার ফেরেশতা অবতীর্ণ করে সাহায্য করবেন। এটাকি তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবেনা"? আলে ইমরান-১২৪

২. মুমিনদের হৃদয়কে পাহাড়সম মজবুত করে দেন। ইরশাদ হচ্ছে-

فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا

"মুমিনদের হৃদয়কে তোমারা শক্তিশালী কর"। আনফাল-১২

৩. কাফেরদের হৃদয়ে ভয়-ভীতি ঢুকিয়ে দেন। ইরশাদ হচ্ছে-

سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ(سورة الأنفال:١٢)

"আমি কাফেরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করবো"। আনফাল-১২

৪. মুসলমানদের ক্ষুদ্র দলটিকে কাফেরদের দৃষ্টিতে বিশাল বড় করে দেখান। কুরআন তাদের কথা এভাবে তুলে ধরেছে-

فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ

তাদের মধ্যে একটি দল আল্লাহর পথে লড়াই করছিল এবং দ্বিতীয়টি ছিল কাফির। তারা নিজেদেরকে খোলা চোখে তাদের চেয়ে দ্বিগুণ দেখছিল। আলে ইমরান-১৩

৫. মুসলমানদের শান্তনার জন্য কাফেরদের বিশাল বড় সৈন্য দলকে একদম ছোট ও নগন্য করে দেখান। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

إِذْ يُرِيكَهُمُ ٱللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً

(হে নবী!) সেই সময়কে স্বরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নে তাদের (অর্থাৎ শত্রুদের) সংখ্যা কম দেখাচ্ছিলেন। আনফাল -৪৩

'সাচ্চা মুসলমান যখন ঈমানী শক্তিতে জেগে ওঠে তার কাছে ইট-পাথরও তখন গোলা-বারুদের ন্যায় কাজ করে । হযরত দাউদ আ. জালূতকে হত্যা করার জন্য পাথর ছুড়ে মারলেন। যার আঘাতে ছটফট করে তার মৃত্যু হল। জালূত ছিলো কাফের বাদশাহ ও লড়াকু যুদ্ধনেতা। একাই হাজার মানুষের সাথে যুদ্ধ করতে সক্ষম। কিন্তু গোলা-বারুদের ন্যায় একটি পাথর তার জীবনকে বিনাশ করে দিয়েছে।

২. মাটি গোলা বারূদের ন্যায় কাজ করে । বদর ও হুনায়নের যুদ্ধে রাসূল সা. মুষ্টিমেয় বালি কাফেরদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। তাদের চোখ অকেজো হয়ে পড়লো। চোখে ধাঁধা লেগে গেল। বর্তমান যুগের পরিভাষায় বলা যায়- মুষ্টিমেয় বালি তাদের উপর পরমাণুর প্রক্রিয়ায় কাজ করেছিল।

৩. গাছের ডাল পর্যন্ত তলোয়ার হয়ে যায়। বদর যুদ্ধে হযরত উক্কাশা রা. এর সাথে এমনটাই হয়েছে। রাসূল সা. তার হাতে একটি ডাল তুলে দেয়া মাত্রই সেটা তলোয়ার হয়ে যায়।

৪. কোথাও সমুদ্রপথকে মুজাহিদদের অধীন ও আনুগত্যশীল করে দেয়া হয়েছে । হযরত আলা-হাযরামী রা. এর ব্যাপারে আমরা এমন ঐতিহাসিক ঘটনাই দেখতে পাই। মুজাহিদগণ পানির ওপরে সমতল ভূমির ন্যায় অশ্বারোহণ করে সমূদ্র পাড়ি দিয়েছেন।

৫. মুজাহিদদের নিরাপত্তায় বনের হিংস্র প্রাণীরা জঙ্গল ছেড়ে চলে যায়। হযরত সাফীনা রা. আফ্রিকার জঙ্গলের পশুদের এই বলে তাড়িয়ে দিলেন, 'এখানে মুহাম্মাদে আরাবী সা. এর গোলামরা রাত্রিযাপন করবে। তোমরা চলে যাও'।

সুতরাং উপরোল্লিখিত ঘটনাগুলো থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে সবর, ইখলাস ও ঈমানী শক্তিই হচ্ছে মুসলমানদের সবচে' বড় হাতিয়ার। এগুলো দিয়েই তারা সব সময় বিজয়ী হয়ে আসছেন। আল্লাহ তায়ালার গায়েবী নুসরাত শুধু আম্বিয়া আ. ও সাহাবায়ে কেরামের উপর সীমিত নয়। বরং গায়েবী নুসরতের ধারা আজো বিদ্যমান আছে এবং থাকবে। যুগে যুগে আল্লাহ মুজাহিদদেরকে সাহায্য করে আসছেন। বর্তমান যুগেও মুজাহিদদের ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যত সাফল্যের নতুন পথ উন্মোচন করে দিচ্ছে। আরেকটি কথা আমাদের জানা থাকা প্রয়োজন যে, বাহ্যিকভাবে অস্ত্রের শক্তি অর্জন করা এবং আধুনিক সমরাস্ত্র গ্রহণ করা তাওয়াক্কুল পরিপন্থি নয়। বরং এগুলো তাওয়াক্কুলকে আরও মজবুত করে তোলে।

নিকটতম অতীতের দিকে ফিরে তাকান, রাশিয়ার মত পরাশক্তি মুষ্টিময় মুজাহিদদের হাতে তাদের করুণ পরিণতিতে প্রত্যক্ষ পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। একজন মুজাহিদের মুষ্টিমেয় বালি/পাথরের আঘাতে চৌদ্দটি ট্যাংক জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে। নিরস্ত্র মুজাহিদগণ অস্ত্রধারী বাহিনীকে বন্দী করে এনেছেন। বিমান হামলার আগে পাখি এসে মুজাহিদদের সতর্ক করে রাডার ও যোগাযোগ মিডিয়ার দায়িত্ব আদায় করেছে। শুধু দোয়ার বরকতে বহু যুদ্ধ বিমান ও ট্যাংক ধ্বংস হয়েছে। যুদ্ধ চলাকালীন অচেনা মানুষ এসে মুজাহিদদের পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধ করেছে। বন্দী রুশ বাহিনীর লোকেরাও এসব কথা স্বীকার করেছে। এসব ঘটনা আমাদেরকে শুধু এ বার্তাই পৌছায়, একমাত্র চিরঞ্জীব সত্তাই মুজাহিদদের হেফাজত করেছেন। ইনশাআল্লাহ, ভবিষ্যতেও হেফাজত করবেন। তার কারণ আল্লাহ তায়ালা নিজেই ঘোষনা করেন:

ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى

لَـهُمْ (سورة محمد-11)

এটা এই জন্য যে, আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক আর কাফেরদের কোন অভিভাবক নেই। সূরা মুহাম্মাদ-১১

ধনে জনে শক্তি বলে জিহাদ হয় না ভাই.

রানাঙ্গনের বিজয় মূলে খোদার মদদ চাই।

সমাধান -২

মুসলমানদের সমরশক্তি ও সৈন্য সংখ্যা কম হলে যুদ্ধ করা যাবে না বরং যুদ্ধ করলে এটা হবে আত্মহত্যার শামিল। এমন উদ্ভ্রান্ত দার্শনীক কথা বলা মানে ইসলামের ইতিহাসকে কলুষিত করা। কোন যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা সমান কিংবা বেশী ছিল এমন ঘটনা পাওয়া খুবই বিরল। অধিকাংশ যুদ্ধেই কাফেরদের সৈন্য সংখ্যা ছিল বেশী । একথা আমরা ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাই। তাই আসুন! এক নজরে ইতিহাসের পাতায় কিছু ঘটনার পর্যালোচনা করি।

১. হযরত তালূত আ. এর সৈন্য সংখ্যা ছিল তিনশ’ তের (৩১৩) জন ।

পক্ষান্তরে জালূতের লক্ষাধিক সশস্ত্র সৈন্য ছিল।

২. বদর যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা তিনশ’ তের (৩১৩) জন।

কাফের সৈন্য সংখ্যা এক হাজার (১,০০০) জন।

৩. উহুদ যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা সাতশ’ (৭০০) জন।

কাফের সৈন্য সংখ্যা তিন হাজার (৩,০০০) জন।

৪. খন্দক যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা তিন হাজার (৩,০০০) জন।

কাফের সৈন্য সংখ্যা চব্বিশ হাজার (২৪,০০০) জন।

৫. খায়বার যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা ষোলশ’ (১,৬০০) জন।

কাফের সৈন্য সংখ্যা বিশ হাজার (২০,০০০) জন।

৬. মু’তার যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা তিন হাজার (৩,০০০) জন।

কাফের সৈন্য সংখ্যা দুই লক্ষ (২,০০,০০০) জন।

৭. কাদেসিয়্যা যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা ত্রিশ হাজার (৩০,০০০) জন।

কাফের সৈন্য সংখ্যা এক লক্ষ (১,০০,০০০) জন ইরানী সৈন্য।

৮.ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা বত্রিশ হাজার (৩২,০০০) জন।

কাফের সৈন্য সংখ্যা দুই লক্ষ (২,০০,০০০) জন রোমীয় সৈন্য।

৯. স্পেন যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা বার হাজার (১২,০০০) জন।

কাফের সৈন্য সংখ্যা এক লক্ষ (১,০০,০০০) জন।

১০. ইয়ারমুক যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা মাত্র ষাট (৬০) জন।

কাফের সৈন্য সংখ্যা ষাট হাজার (৬০,০০০) জন।

সমাধান -৩

সৈন্য সংখ্যা ও গোলা বারুদ কম থাকা সত্ত্বেও কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পরিভাষা যদি হয় 'আত্মহত্যা' তাহলে কোন কোন সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে কি উক্তি করবেন?

ক. মিসর বিজেতা হযরত আমর ইবনুল আস রা. হযরত ওমর ফারুক রা. এর নিকট মদীনা থেকে তিন হাজার সৈন্য তলব করলেন তখন হযরত ওমর রা. মাত্র তিনজনকে পাঠালেন। হযরত খারেজা ইবনে হুযাইফা রা., হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা., হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রা.। তাদেরকে পাঠিয়ে বললেন, আরে! আমি তিনজন পাঠাইনি বরং তিন হাজার পাঠিয়েছি।

খ. হযরত বারা ইবনে আযেব রা. মুসাইলামাতুল কায্যাবকে হত্যা করতে ধাওয়া করলেন। মুসায়লামা ছিল 'বাগান বাড়ীর নিরাপত্তায় বেষ্টিত। চিকন সুড়ঙ্গ করে তিনি একাই সেখানে ঢুকে পড়লেন। নাউযুবিল্লাহ! এগুলো কি আত্মহত্যা ছিলো? অন্য কোন সাহাবী কি তাদেরকে এমন করতে নিষেধ করেছিলেন? তাহলে আমরা করতে যাবো কেন?

সমাধান -৪

কোন রকম ভাবে আপনার কথা মেনে নিলাম যে,কাফেরদের তুলনায় মুসলমানদের সামরিক শক্তি ও অস্ত্রশস্ত্র বেশী না হলেও সমান সমান থাকা জরুরী। এমনটাই যদি হয় তাহলে পৃথিবীতে জিহাদ বলতে কিছু থাকবে কি? তখন তো মানুষ শুধু এতটুকু বাহনা পেশ করে জিহাদ থেকে বিরত থাকবে 'আমাদের শক্তি নেই, তাই আমরা জিহাদ করিনা।' অথচ আল্লাহ তায়ালা সাধ্যমত জিহাদের শক্তি অর্জন করতে আদেশ করেছেন। অন্যান্য আমলের তুলনায় জিহাদের তাগিদ একটু বেশীই দিয়েছেন। কুরআনে কারীম বলছে:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ....
(سورة الأنفال-60)

(হে মুমিনগন!) তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-ছাউনি প্রস্তুত কর'।

এই যুদ্ধ প্রস্তুতি পর্বটি এমন এক বিষয় যার কোন সীমারেখা নেই। শেষ বলতে কিছু নেই। প্রস্তুতি পর্ব যেহেতু কেউ শেষ করতে পারবেনা এজন্য আদেশ দেয়া হয়েছে, যতটুকু তোমার সাধ্যে কুলায় প্রস্তুতি গ্রহণ কর। শক্তি অর্জন কর। সাধ্যমত প্রস্তুতি গ্রহণ করা ওয়াজিব। কেউ যদি দশটি জাহাজ নির্মাণ করার ক্ষমতা রাখে সে যদি নয়টি বা সাধ্যমত مَا اسْتَطَعْتُمْ নির্মাণ করে অবশ্যই সে গোনাহগার হবে। কারণ সে কাজ করেনি । সে দশটি জাহাজ নির্মাণের ক্ষমতা রাখে নয়টি বানাবে কেন? একইভাবে কেউ যদি অস্ত্র প্রশিক্ষণ নেয়ার পর ভুলে যায় হাদীসের ভাষ্যমতে সে হবে গোনাহগার! রাসূল সা. এরশাদ করেন عن عبد الرحمن بن شماسة أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك قال عقبة لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم لم أعاينه قال الحارث فقلت لابن شماسة وما ذاك ؟ قال إنه قال (من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى)

- صحيح مسلم : 143/2 باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه. رقم الحديث:4912 - مسند أحمد : 17336 الجزء الثامن والعشرون.

'যে ব্যক্তি অস্ত্র চালানো শিখল তারপর এ কাজ ছেড়ে দিল অথবা ভুলে গেল সে আমার উম্মত নয়।'(মুসলিম শরীফ ২য় খন্ড হাদীস নং ৪৯১২।)

যারা আজ পর্যন্ত অস্ত্র প্রশিক্ষণ নেয়নি তাদের জন্য কি এই হাদীস শিক্ষনীয় নয়? তারা আজও অস্ত্র প্রশিক্ষণ নেয়ার প্রয়োজন অনুভব করেনা বরং উল্টো এটাকে ঘৃণা করে, মানুষের মাঝে সন্দেহের সৃষ্টি করে ও বিভ্রান্তিমূলক ব্যাখ্যা করে তাদের ঈমান এর ব্যাপারে আশংকা করা উচিত। আসলে এরা মানুষরূপি শয়তান। এদের ছোবল থেকে পুরো মুসলিম জাতিকে হেফাজত করুন। আমীন! ইয়া রব্বাল আলামীন!

আল্লাহ তায়ালা এমন টালবাহানাকারী মুনাফিকদের বিষয়ে এরশাদ করেন:

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً (سورة التوبة-46)

'যদি যুদ্ধে বের হওয়ার ইচ্ছাই তাদের থাকত, তাহলে অবশ্যই কিছু না কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করত।' সূরা তাওবা-৪৬

সুতরাং কোন রকম টালবাহনা করে যারা এমন মন্ত্র ছড়াচ্ছে তাদের ব্যাপারে চিন্তা করা উচিত । তাদেরও নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা করা উচিত যে, আমরা কি সশস্ত্র জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করছি না কি অবান্তর মন্ত্র ছড়িয়ে জিহাদের শক্তিকে দূর্বল ও নিস্তব্ধ করে কাফেরদের সহযোগিতা করছি?

সমাধান -৫

এগুলো মুনাফিকদের বাহানা মাত্র। পবিত্র কুরআন তাদের কথা এভাবে উল্লেখ করেছে, মুনাফিকরা ছলনা করে জিহাদ থেকে দূরে থাকত। যখন জিহাদের ডাক আসত তারা বেহুশ ও অজ্ঞান হয়ে যেত। কিন্তু তারা নিজেদের কাপুরুষতা এবং আভ্যন্তরীন মুনাফেকী চরিত্রকে গোপন করার নানা রকম ছলনা ও অজুহাত পেশ করত। এই বিষয়ে সামনে বিস্তারিত আলোচনা করব। এখানে মাত্র একটি ছলনার কথা উল্লেখ করছি। উহুদ যুদ্ধে রাসূল সা. মদিনা শরীফ থেকে বের হয়ে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত করে সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হলেন। মাঝপথে মুনাফিকরা শুধু একথা বলে যুদ্ধে যাওয়া পরিহার করল:-

لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاتَّبَعْنَاكُمْ (سورة آل عمران-167)

'আমরা যদি দেখতাম (যুদ্ধের মত) যুদ্ধ হবে, তাবে অবশ্যহা তোমাদের পেছনে চলতাম।'(আল ইমরান-১৬৭)

আয়াতের একটি সংক্ষিপ্ত তাফসীর এই -

মুনাফিকরা মনে করত উহুদ যুদ্ধ প্রকৃত অর্থে কোন যুদ্ধই নয় বরং এটা আত্মহত্যার শামিল। কারণ এক তো আমরা সংখ্যায় কম (মুসলিম সৈন্য ৭০০ আর কাফের সৈন্য ৩০০০)। দ্বিতীয়ত আমাদের যুদ্ধাস্ত্র ও পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই। এগুলো ছাড়া আবার যুদ্ধ হয় নাকি? আমরা যদি এটাকে যুদ্ধ মনে করতাম অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতাম।

আমাদের আকাবিরঃ

পরিশেষে আমাদের আকাবিরদের ছোট্ট একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। আকাবিরদের চিন্তা-চেতনা ও মেজাজ যেন আমাদের মাঝে ফিরে আসে এবং তাঁদের পদাংক অনুসরণ করে চলার সৌভাগ্য নসীব হয়। ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য যখন হযরত মাওলানা হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রহ. এবং অন্যান্য আকাবিরগণ একত্র হলেন এবং তাদের নিয়ে জরুরী পরামর্শ শুরু করলেন। এসময় হযরত থানবী রহ. এর সাথে কথাবার্তা চলাকালে হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহ. জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত! আপনি শত্রুদেশে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরজ তো দূরের কথা জায়েয পর্যন্ত বলেন না । এর কারণটা কি? হযরত থানবী রহ. বললেন, আমাদের তো যুদ্ধাস্ত্র নেই। যুদ্ধের সরঞ্জাম ছাড়া কিভাবে জিহাদ করব? হযরত কাসেম নানুতুবী রহ. বললেন, বদর যুদ্ধে যা ছিল তাও কি নেই? এরপর থানবী রহ. নিরব হয়ে গেলেন। কিন্তু মাওলানা শহীদ যামেন রহ. বলেন থানবী রহ. এভাবে উত্তর দিয়েছিলেন- "মাওলানা কথা বুঝে আসছে আর বলতে হবে না।" (নকশে হায়াত হযরত মাদানী ২য় খন্ড)

উলামায়ে কেরাম ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য হযরত মাওলানা হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রহ. এর নিকট শপথ নিলেন। ফলে শামেলী যুদ্ধ ও সিপাহী বিপ্লবের সূচনা হয় । সর্বস্তরের উলামায়ে কেরাম ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখলেন। শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী রহ. অলি-গলিতে ঘুরে প্রতিটি মানুষকে জিহাদের আহবান করে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধির কাজে

ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ইংরেজরা তখন বুঝতে পারল সামনে তাদের জন্য নিশ্চিত পরাজয় অপেক্ষা করছে। তাই পানি ঘোলা করে মাছ ধরার নেশায় গোলাম আহমাদ কাদিয়ানির মত এক নরপিচাশকে ষড়যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে । সে নিজেকে এক সময় নবী বলে দাবী করে। এই ষড়যন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য ছিল মুসলিম উম্মাহর হৃদয় থেকে জিহাদী চেতনা দূর করা। উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সে কিছু লিফলেট ছেপে প্রচার করে। এবং মুসলমানদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করে। লিফলেটের মূল এভাবে সাজানো হয়েছে- হে মুসলমানগণ তোমাদের উপর জিহাদ ফরজ নয়। কারণ তোমাদের সামরিক শক্তি কম। সামরিক শক্তি না থাকলে যুদ্ধ করা যায়না। তোমাদের একজন আমীর নেই। এক আমীরের নেতৃত্ব ছাড়াও জিহাদ করা যায় না। হে আল্লাহ আমাদেরকে পূর্ণ ঈমান দান কর। মুনাফেকী চক্র থেকে দূরে রাখ। শয়তানের প্রতারণা থেকে হেফাজত কর। আমীন! ইয়া রব্বাল আলামীন!

সংশয় -২৩

যুদ্ধ-জিহাদের আগে কাফেরদেরকে ঈমান গ্রহণ করার দাওয়াত পেশ করা শর্ত। বর্তমান মুজাহিদরা কাফেরদেরকে ঈমানী দাওয়াত ছাড়াই হত্যা করছে। এটা জায়েয নেই। সুতরাং এ সমস্ত কাফেররা যে জাহান্নামে যাবে এর দায়ভার কিন্তু মুজাহিদদেরকেই নিতে হবে। জিহাদের নামে শরীয়ত বিরোধী কাজ করে আল্লাহর নুসরতের আশা করা যায় না।

সমাধান -১

ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে জিহাদ দুই প্রকার।

ক. আক্রমণমূলক

খ.আত্মরক্ষামূলক।

জিহাদ করার আগে কাফেরদের প্রতি ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেয়ার শব্দটি আক্রমণমূলক-ইক্বদামী জিহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বর্তমান বিশ্বের কোথাও কোন যুদ্ধ আক্রমণমূলক নয়। বরং যা হচ্ছে সবই দিফায়ী-আত্মরক্ষামূলক।

সমাধান -২

আক্রমণমূলক বা ইক্বদামী জিহাদের ক্ষেত্রে কাফেরদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার বিষয়টি তখনই প্রযোজ্য হবে যদি ইসলাম সম্পর্কে কাফেরদের কোন জ্ঞান না থাকে। কিন্তু বর্তমান যুগে ইসলাম এত ব্যাপক হয়েছে কাফেররাও ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি ভাল জ্ঞান রাখে । কোন কোন বিষয়ে তো কাফেররা মুসলমানদের তুলনায় অনেক বেশী জ্ঞান রাখে।

শক্তিতেই বৃদ্ধি পায় দাওয়াত পূর্ণমানে

তাথাপি ইহাও শর্ত নয় প্রতিরোধ অভিযানে

সত্য দ্বীনের কোনই জ্ঞান কি মেলেনি কভু তাদের

সর্বমূলে কারণ যাহা অজস্র ফসাদের

সমাধান -৩

যুদ্ধের আগে কাফেরদের ঈমানী দাওয়াত দিতে হয়। তবে বিষয়টি এত ব্যাপক নয় যে, প্রতিটি কাফেরকে পৃথক পৃথক ভাবে দাওয়াত দিতে হবে। বরং শুধু কাফের প্রধান ও রাষ্ট্রনায়কদের দাওয়াত দেয়াই যথেষ্ট রোম ও পারস্যের যুদ্ধ গুলোতে সাহাবায়ে কেরাম এই নীতিই গ্রহণ করেছিলেন। রাসূল সা. পারস্য ও রোমীয় যুদ্ধের আগে শুধু রাজা-বাদশাহদের দাওয়াত দিয়েছেন। কোন প্রজাকে নয়। সামনের রেওয়ায়েত থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হবে বলে আশা করি।

ক. রাসূল সা. খসরু পারভেজের নামে নিম্নোক্ত পত্র প্রেরণ করেন।

بعث عبد الله بن حذافة السهمي منصرفه من الحديبية إلى كسرى وبعث معه كتابا مختوما فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أدعوك بداعية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أسلم تسلم فإن أبيت فعليك إثم المجوس".

- عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير. باب عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير - الجزء الثاني.

السيرة النبوية لإبن كثير: الجزء الثالث. - زاد المعاد : 601/3 . ذكر هَدْيه صَلَّىٰ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى مكاتباته إلى الملوك وغيرهم.

“পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে । আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে পারস্য সম্রাট খসরুর উদ্দেশ্যে (পত্র প্রেরিত হচ্ছে) তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক যে হেদায়েতের অনুসারী। আল্লাহ ও তার রাসূলে বিশ্বাসী এবং এই স্বাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা’বুদ নেই। তিনি এক অদ্বিতীয়। তার কোন অংশীদার নেই। মুহাম্মাদ সা. তার বান্দা ও রাসূল। আমি তোমাকে আল্লাহর দিকে আহবান জানাচ্ছি। আমি সমগ্র মানব মন্ডলির উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি। যাতে প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তিকে সতর্ক করতে পারি এবং নিশ্চিত করতে পারি কাফেলদের পরিণতি। ইসলাম গ্রহণ কর শান্তি পাবে । অন্যথায় অগ্নিউপাসক প্রজাবর্গের সকল পাপ তোমার কাধে চাপবে। (শামায়েলে তিরমিযী)

খ. হযরত সুলাইমান আ. যখন রানী বিলকীসকে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন আল্লাহ তা’য়ালা কুরআনুল কারীমে তার দাওয়াত নামা এভাবে তুলে ধরেন।

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ ٱللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ* أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (سورة النمل- 30-31)

“ তা এসেছে সুলাইমানের পক্ষ থেকে। তা শুরু করা হয়েছে আল্লাহর নামে, যিনি রাহমান ও রাহীম, (তাতে সে লিখেছে) আমাদের উপর অহমিকা দেখিও না। বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে চলে এসো। (সূরা নামল ৩১)

সমাধান -৪

উপরোল্লিখিত দুটি রেওয়ায়েত থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, দাওয়াতের কাজ হবে খুব সংক্ষেপে এবং সাহসীকতার সাথে। নম্র ও সমাঝোতার কোন আভাস থাকবে না। স্বশস্ত্র শক্তির দাপট নিয়ে মুজাহিদের মত বুক টান করে দাওয়াত দিবে। ইসলাম কবুল কর, না হয় যুদ্ধ ও মৃত্যুর অপেক্ষা কর। এক্ষেত্রে রাসূল সা. এর আমল এবং সাহাবায়ে কেরামের আমলকে শরীয়তের দলীল নামে নিজের যুক্তি ও তর্ককে দলীল বানানোর চেষ্টা করা যে কতটা ভয়ংকর সে কথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না । কারো বিবেক বুদ্ধি: যদি হারিয়ে যায় সেই একমাত্র শরীয়ত বিরোধী কথা বলতে পারে ।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

পরিশেষে এই বিষয়ে ফেকাহ শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য কিতাব মুখতাসারুল কুদূরীর বিখ্যাত শরাহ শরহুল জাওহারাতুন নায়্যিরাহ এর উদ্ধৃতি দিয়ে কথা শেষ করছি।

إنَّمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَاتِلَ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ أَمَّا فِي زَمَانِنَا فَلَا حَاجَةَ إلَى الدَّعْوَةِ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ قَدْ فَاضَ وَاشْتَهَرَ فَمَا مِنْ زَمَانٍ أَوْ مَكَان إلَّا وَقَدْ بَلَغَهُ بَعْثَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللہ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُعَاؤُهُ إلَى الْإِسْلَامِ فَيَكُونُ الْإِمَامُ مُخَيَّرًا بَيْنَ الْبَعْثِ إلَيْهِمْ وَتَرْكِهِ وَلَهُ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ جَهْرًا وَخُفْيَةً.

“ ইসলামের প্রথম যুগে দাওয়াত দেয়া ব্যতীত যুদ্ধ করা জায়েয ছিল না। কিন্তু বর্তমান যুগে কাফেরদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই । কারণ বর্তমানে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে ইসলামের দাওয়াত পৌছেনি। সুতরাং কাফেরদেরকে দাওয়াত দেয়ার বিষয়টি আমীরের মর্জির উপর নির্ভরশীল। তিনি ইচ্ছা করলে দাওয়াত দিতে পরেন আবার নাও দিতে পারেন। কাফেরদের মুখোমুখি হয়ে যুদ্ধ করলেও পারেন আর না হয় গোপনে-গোপনে হত্যা করলেও পারেন।

মোটকথা দলীলের আলোকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, কাফের হত্যা করার আগে ইসলামের দাওয়াত দেয়া জরুরী নয়।

সংশয় -২৪

জিহাদ করা কোন সহজ কাজ নয়। জিহাদের জন্য যেমন মজবুত ঈমান থাকা জরুরী তেমন ঈমান যেহেতু আমাদের নেই, তাই আমাদের উচিত প্রথমে ঈমানের মেহনত করা। যখন ঈমান মজবুত হবে তার পর জিহাদ করব । কারণ রাসূল সা. মক্কী

জীবনের তেরটি বছর সাহাবায়ে কেরামের উপর শুধু ঈমানের মেহনত করেছেন। তারপর জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

সমাধান -১

প্রথমে আমাদের মাথায় একটি জিনিস রাখতে হবে রাসূল সা. কোন সাহাবীর উপর পূর্ণ তের বছর ঈমানী মেহনত করেন নি। বরং নবূয়তের প্রথম দিন কেউ ঈমান গ্রহণ করেন নি। রাসূল সা. সর্বপ্রথম ঈমানের দাওয়াত দিয়েছেন পরম স্ত্রী হযরত খাদিজা রা. কে। শুনিয়েছেন ওহী সংক্রান্ত নানা ঘটনাবলী। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। কিন্তু রাসূলের নবূওয়াতের তের বছর পূর্ণ হবার আগেই বিদায় নিয়ে গেলেন সে মহীয়সী নারী। আর যারা সর্ব প্রথম মুসলমান হয়েছেন তাদের নাম এই; পুরুষদের মাঝে হযরত আবূ বাকর রা., শিশু কিশোরদের মাঝে হযরত আলী রা., গোলামদের মাঝে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রা. তাদের কেউতো নবূওয়াতের প্রথম দিন ইসলাম গ্রহণ করেন নি। তাহলে তাদের উপর তের বছর পূর্ণ হল কিভাবে? সুতরাং এমন কথা বলা যে ভিত্তিহীন সেকথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। জানি না কে বা কারা কখন থেকে এসব কথার রেওয়াজ ও প্রচলন ঘটিয়েছে!

সমাধান -২

রাসূল সা. তের বছর সাহাবায়ে কেরামের উপর ঈমানের মেহনত করেছেন তারপর জিহাদের আদেশ দিয়েছেন এমন কথা বলা মানে রাসূল সা. ও সাহাবায়ে কেরামের উপর অপবাদ দেয়ার শামিল। এর দ্বারা ঈমান চলে যাওয়ার আশংকা আছে। কারণ উক্ত কথার সারমর্ম হল তের বছর ঈমানী মেহনত করার পর ঈমান পরিপূর্ণ হয়। তাহলে নির্যাতিত নিপীড়িত মজলূম সাহাবায়ে কেরাম রা. যাদের অনেকে শহীদ হয়ে গেছেন তাদের ঈমানের ব্যাপারে কি বলবেন? নাউযুবিল্লাহ তাদের ঈমান পরিপূর্ণ হতে কি তের বছর সময়ের প্রয়োজন ছিলো? অথচ উম্মতের ইজমা ও আক্বীদা-বিশ্বাস এই- যে ব্যক্তি ঈমান অবস্থায় রাসূল সা. কে দেখেছে, প্রথম দর্শনেই

তার ঈমান পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। দ্বীধাহীন ভাবে তারা আল্লাহর পথে জান মাল কোরবান করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছেন। লক্ষ্য করুন হযরত যুন্নায়রা রা. এর চক্ষুদ্বয় তুলে ফেরা হয়েছে। হযরত লোবায়না রা. এর শরীর থেকে চামড়া ছিলে ফেলা হয়েছে। নরপিচাশ আবু জাহেল হযরত সুমাইয়া রা. এর লজ্জাস্থানে বর্শার আঘাত করে শহীদ করেছে। তারপর দু'পায়ে রশি দিয়ে উটের সাথে বেধে টেনে হিচড়ে কষ্ট দিয়েছে। এমনকি এক পর্যায়ে গিয়ে তার শরীর দ্বিখন্ডিত হয়ে গেছে। তবুও তার ঈমানে একবিন্দু পরিমাণ ত্রুটি ও ঘাটতি আসে নাই। দু'চারটি নারীর করুণকাহিনী থেকে অনুমান করুন; ভয়ালো নির্যাতনের সামনে তাদের ঈমান কতটা মজবুত ছিলো। দ্বীনের জন্য কতইনা কষ্ট করেছেন। একই ভাবে পুরুষ সাহাবীদের ঘটনায় ইতিহাস ভরে আছে। হযরত বেলাল রা. ও হযরত খাব্বাব রা. এর ঘটনা জগৎ জুড়ে বিখ্যাত। এদের করুণ কাহিনী কে না জানে! নাউযুবিল্লাহ আপনার বক্তব্য অনুযায়ী তাদের ঈমান পূর্ণ হতে কি তের বছর সময় লেগেছিল?

সমাধান -৩

জিহাদের জন্য পরিপূর্ণ ঈমান থাকা যদি জরুরী হয়ে থাকে এর পিছনে কারণ একটাই হতে পারে যে যুদ্ধ-জিহাদ চলাকালীন সময় অনেক বিপদ ও দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। এসব পরিস্থিতি সহ্য করে নেয়ার জন্য প্রয়োজন হয় পরিপূর্ণ ঈমানের। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মক্কী জীবনের মুসলমানদের দুঃখ-কষ্ট ছিল সীমাহীন অসহনীয়। পক্ষান্তরে জিহাদের চরিত্র হচ্ছে শত্রুকে প্রতিহত করা, দমন করা । এখানে নিজে যেমন কষ্ট পায় । তেমন অন্যকেও কষ্ট দেয়। নিজে যেমন আহত হয় অন্যকেও আহত করে । নিজে যেমন নিহত হয় অন্যকেও মৃত্যুর কোলে ভাসিয়ে দেয়। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে যুদ্ধের চরিত্র এভাবে অঙ্কণ করেছেন:

إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (سورة النساء-104)

তোমাদের যদি কষ্ট হয়ে থাকে, তবে তাদেরও তো তোমাদেরই মত কষ্ট হয়েছে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে এমন জিনিসের আশা কর, যার আশা তারা করে না। আল্লাহ জ্ঞানেরও মালিক এবং হিকমতেরও মালিক। (সূরা নিসা-১০৪)

মক্কী জীবনে শত্রুকে প্রতিহত করার কোন অনুমতি ছিলনা। এসময় মুসলমানদের শুধু সবর ও ধৈর্যের আদেশ দেয়া হত। তারপর ক্রমান্বয়ে মুসলমানদের উপর জুলুম অত্যাচার বাড়তে লাগল। তখন তাদেরকে আদেশ করা হল হিজরত করার। এজন্য বলা যায় সাহাবায়ে কেরামের উপর শুধু ঈমানী মেহনত হয়নি । মেহনত হয়েছে সবর ও ধৈর্য্যের। আর কাফের মুশরিকদের উপর মেহনত হয়েছে ঈমানের । তারা যেন ঈমানদার হয়ে যায়। ইসলামের সীমারেখায় চলে আসে। সে জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা ও তদবীর করা হয়েছে। কিন্তু আজ স্বল্প জ্ঞানী লোকেরা দ্বীনের এ মূল কথা গুলো অন্য ক্ষেত্রে প্রবাহিত করে দ্বীনের চরিত্রকে নষ্ট করে ফেলেছে। আল্লাহ সবাইকে মাফ করুন।

সমাধান -৪

আপনার কথা মেনে নিলাম মক্কী জীবনে তের বছর সাহাবায়ে কেরামের উপর ঈমানের মেহনত করা হয়েছে। তারপর জিহাদের বিধান নাযিল করা হয়েছে। তাহলে যেসব সাহাবায়ে কেরাম মদীনায় মুসলমান হয়েছেন। তাদের উপর তের বছর ঈমানী মেহনত হল না কেন? নাউযুবিল্লাহ ঈমানী মেহনত না করে তাদের ঈমান মজবুত না

করে যুদ্ধের ময়দানে দাঁড় করিয়ে দেয়া হল কেন? বর্তমানে মুজাহিদদের ব্যাপারে অপবাদ দেয়া হয় তারা শিশুদের উপর ঈমানী মেহনত ছাড়াই রনাঙ্গনে নিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের জীবন ধ্বংস করছে। প্রিয় ভাইয়েরা আমার! আপনারা একটু চিন্তা করুন যারা মদীনা শরীফে মুসলমান হয়েছেন । ঈমানী মেহনত ছাড়াই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শহীদ হয়েছেন। নাউযুবিল্লাহ আপনার বক্তব্য অনুযায়ী তাদের ঈমান অপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধের ময়দানে চলে যাবার অপরাধ ও দায়ভার কার কাধে চাপবে? অথচ রাসূল সা. তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ জানাচ্ছেন এরই পরিপ্রেক্ষিতে শুধু একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। এক ব্যক্তি রাসূল সা. এর দরবারে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আগে মুসলমান হব নাকি জিহাদ করব? রাসূল সা. বললেন আগে মুসলমান হও তারপর জিহাদ কর। ঐ ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লালাহ পড়ে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়লেন এবং যুদ্ধরত অবস্থায় শহীদ হয়ে গেলেন। স্বয়ং রাসূল সা. তাকে কবরে রেখে খুব দ্রুত উঠে আসলেন। সাহাবায়ে কেরাম একটু শংকিত হলেন। তার কবরে আযাব হচ্ছে নাকি! রাসূল সা. বললেন, না বিষয়টি এমন নয়। হুর-পরীরা তার কাছে এসে পড়েছে। এজন্য আমি কবর থেকে দ্রুত এসে পড়েছি। তারপর তিনি বললেন: عمل قليلا وأجر كثير। "সে তো আমল করেছে কম কিন্তু প্রাপ্তি মিলেছে অনেক বেশী। এবার চিন্তা করুন, এই সাহাবী তো ঈমানের উপর কোন মেহনত করেননি। কোন নামাজ পড়ার সুযোগ ও পাননি। যুদ্ধ-জিহাদের ময়দানে গিয়ে শাহাদাত বরণ করেছেন। তবুও রাসূল সা. তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন কেন? কিসের ভিত্তিতে?

সমাধান -৫

বর্তমান জামানায় যদি কেউ ঈমান কমজোর ও দূর্বল হওয়ার কারনে জিহাদ না করার অপারগতা প্রকাশ করে এটা হবে জঘন্যতম অপরাধ। এবং আল্লাহর উপর অপবাদ দেয়ার শামিল। নাঊযুবিল্লাহ সে এমন কটুকথা বলে বুঝাতে চায় তিনি আমাদের উপর এমন বিধান চাপিয়ে দিয়েছেন। যা পালন করতে আমরা সক্ষম নই,

বরং অক্ষম। কারণ যেখানে রাসূল সা. এর সোহবাত–সাহচর্য এবং তাঁর পিছনে নামাজ পড়া সত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরামের ঈমান মজবুত করতে তের বছর সময় লেগেছে। আমরা তো ঈমানই মজবুত করতে পারছিনা । আবার জিহাদ দিয়ে কি করব? আল্লাহ বান্দার উপর জিহাদের বিধান ফরজ করে জুলুম করেছেন। নাউযুবিল্লাহ! এই হিসেবে তিনি এমন বিধান দিয়েছেন যা পালন করার যোগ্যতা ও শক্তি উম্মতের মাঝে নেই । নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিক!

সামধান -৬

পরিশেষে বলব, ঈমান পরিপূর্ণ হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট সীমারেখা বাতলে দেয়া উচিত যে, এই পর্যন্ত পৌছলে ঈমান পরিপূর্ণ হবে তারপর থেকে জিহাদের কাজ করা যাবে। অন্যথায় কিয়ামত পর্যন্ত আগত উম্মত তো অসম্পূর্ণ ঈমান নিয়ে মৃত্যু বরণ করবে।

সমাধান -৭

বাস্তব কথা হল, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এমন একটি আমল কোন অপরিপূর্ণ ঈমানদারও যদি একাজ করে তার ঈমান পরিপূর্ণ হয়ে যায়। ঈমানী শক্তি বাড়তে থাকে। কারণ সে জিহাদের ময়দানে আল্লাহর গায়েবী সাহায্য ও নুসরাত প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পায়। শুহাদাদের রক্তের সুবাস তার ঈমানকে করে সুরভিত- তরতাজা। দেখার শওক থাকলে রনাঙ্গনে এসে পড়ুন। পবিত্র কুরআনও একথার ঘোষনা করে। জিহাদের ময়দানে সাহাবায়ে কোরামের ঈমানও বৃদ্ধি পেতে থাকে:

الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
(سورة آل عمران-173)

“যাদেরকে লোকে বলেছিল, (মক্কার কাফের) লোকেরা তোমাদের (সাথে যুদ্ধ করার) জন্য (পূনরায়) একত্র হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় করো। তখন এটা (এই সংবাদ) তাদের ঈমানের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয় এবং তার বলে উঠে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ঠ এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক।”(সূরা আলে ইমরান-১৭৩)

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَاناً وَتَسْلِيماً (سورة الأحزاب-22)

মুমিনগণ যখন (শত্রুদের) সম্মিলিত বহিনীকে দেখেছিল, তখন তারা বলেছিল, এটাই সেই বিষয় যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ ও তার রাসূল আমাদেরকে দিয়েছিলো। আল্লাহ ও তার রাসূল সত্যই বলেছিলেন। আর এ ঘটনা তাদের ঈমান ও আনুগত্যের চেতনাকে আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছিল।”(সূরা আহযাব-২২)

পূর্ণ ঈমানের অপেক্ষা আর করবে কতকাল

এবার চল রণে দেখবে ঈমান কি বিশাল।

যার অনেষণে হয়রাণ এই পূর্ণ জাহান

সে ফুল সাধন নিমিষেই করবে জিহাদের ময়দান।

সংশয় -২৫

আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিছু কিছু মুজাহিদের আমল শরীয়তের পরিপন্থি। তারা টাখনুর নিচে সেলোয়ার পরে। দাড়ি ছাটে, দাড়ি মুন্ডায়, ছবি তোলে, মাঝে মধ্যে নামায পড়েনা। এমনকি তাদের ঘরোয়া পরিবেশ ইসলামের আদর্শ পরিপন্থি। সুতরাং এ আন্দোলনকে জিহাদ বলে স্বীকৃতি দেয়া যায় না। যারা গোনাহে লিপ্ত তারা আবার

কিসের জিহাদ করবে? প্রকৃতপক্ষে তারা যদি মুজাহিদ হত অবশ্যই তারা নিজেদেরকে সংশোধন করে নিতো। তারপর জিহাদ করতো।

সমাধান- ১

জিহাদ করা এক ফরজ আর নামাজ পড়া আরেক ফরজ। একই ভাবে রোযা রাখা এক ফরজ আর নামাজ পড়া আরেক ফরজ। উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন ইবাদত। এখন প্রশ্ন হল, কোন ব্যক্তি রোযা রাখল কিন্তু নামায আদায় করল না, তাই বলে কি তার রোযা আদায় হবে না? অবশ্যই হবে। হ্যা, এতটুকু বলা যায় নামাজ না আদায় করার কারনে সে গোনাহগার হবে। রোযাও আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু আদায়টা অসম্পূর্ণ হবে। অনুরূপভাবে সারা পৃথিবীর মুসলমানরা যদি নামাজের মত ফরজ বিধান লংঘন করে তখনও জিহাদ ফরজই থাকবে। এর ফরজিয়্যাত বাতিল হবেনা। সর্বোচ্চ নামাজ না আদায় করার কারণে গোনাহগার হবে। কিন্তু জিহাদের আমল নষ্ট হবে না।

আরো একটু স্পষ্ট করে বলি, রাষ্ট্র-সরকার যদি জালিম, ফাসিক হয় তবুও জিহাদী কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া ফরজ। কোন অবস্থায়ই জিহাদের ফরজিয়্যাত বাতিল হয় না। হাদীস শরীফে আমরা একথাই উপলব্ধি করতে পারি

عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ...... والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل ،

- سنن أبي داؤود: 342/1 باب في الغزو مع أئمة الجور. رقم الحديث:2532 - سنن البيهقى الكبرى : 292/9 باب في الغزو مع أئمة الجور. رقم الحديث: 18480

“ আমার সময় থেকে নিয়ে দাজ্জাল হত্যা পর্যন্ত জিহাদ চলমান থাকবে। কোন জালিম এবং ন্যায় বিচারক বাদশাহ পর্যন্ত জিহাদ বিলুপ্ত করতে পারবে না।

সমাধান -২

নামাজের হেকমত ও দর্শন কুরআনুল কারীম এভাবে বিশ্লেষণ করেছে:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (سورة العنكبوت-45)

"নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে।"

এই আয়াতের ব্যাখ্যা যদি কেউ এভাবে করার চেষ্টা করে, যারা অশ্লীল ও বেহায়া কাজে লিপ্ত রয়েছে, যাদের ঘরে টিভি আছে, ছবি আছে অথবা যেসব মহিলারা পর্দা করেনা; তারা নামাজ পড়ে লাভ কি? তাদের তো নামাজ কবুল হয় না। কারণ, নামাজ বলা হয় যা মানুষকে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। এভাবে রোযার উপকারিতাও প্রজ্ঞাময় কুরআন যেভাবে বলেছে-

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ "(তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা হয়েছে) যেন তোমরা মুত্তাক্বী হতে পার"। (সূরা বাকারা-১৮৩)

এখানে কি এভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? যারা দাড়ি মুন্ডায়, দাড়ি ছোট করে রাখে, টাখনুর নীচে সেলোয়ার পরে, অন্যান্য গোনাহের কাজ করে তাদের রোযা রেখে ফায়দা কি? এদের জন্য রোযা রাখার প্রয়োজন নেই। কারণ, প্রকৃত অর্থে রোযা বলা হয়, যা মানুষকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। সুতরাং রোযা রাখার পরেও যদি গোনাহের কাজ করে; এরকম রোযা রাখার কোন প্রয়োজন নেই। এমন কথা কেউ বলেনা । আর যদি বলেও তা ভুল হিসেবে প্রমাণিত। এখানে যেমন গোনাহগার ব্যক্তি গোনাহগার হওয়া সত্ত্বেও নামাজ, রোযা ও অন্যান্য ইবাদত আদায় করলে আদায় হয়ে যায়। তেমনিভাবে কোন মুজাহিদ যদি নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও গোনাহ থাকা সত্ত্বেও জিহাদ করে তার জিহাদ আদায় হয়ে যায়।

শের

সমাধান -৩

আমরা প্রত্যক্ষ করি, একজন ব্যক্তি দ্বীন শেখার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে সফর করে। কিন্তু কোন কোন সময়ে সে নামাজের ব্যাপারে অলসতা করে , নামাজ আদায় করেনা। আবার কারো ঘটনা আরো একটু জটিল। একদিকে যেমন দ্বীন শেখা ও দ্বীনের তাবলীগ করা, ইসলাম শেখা ও ইসলাম প্রচার-প্রসারের সুমহান লক্ষ্য নিয়ে সফর করে। অপরদিকে আবার নেশার কাজও চালু রাখে। এ ধরনের লোকের ব্যাপারে যদি অভিযোগ ওঠে এবং তার দায়িত্ব রত জিম্মাদারকে বলা হয়, এ ব্যক্তিকে সতর্ক করুন। এসব কাজ ছাড়তে বলুন। আর না হয় জামাত থেকে বহিষ্কার করে দেন। তখন জিম্মাদারের পক্ষ থেকে উত্তর আসে, আরে ভাই তাকে জামাতে থাকতে দাও। তাকে যদি বের করে দাও সে তো আরো খারাপ হয়ে যাবে। তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। মেহনতের বরকতে একদিন ভালো হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এমনই কোন ঘটনা যদি মুজাহিদদের ব্যাপারে আসে তখন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যায়। জিহাদরত মুজাহিদের মাঝে এমন কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি নজরে আসে, ঐ ব্যক্তির নিন্দা ও দোষারোপ করেই ক্ষান্ত হয় না; বরং জিহাদের পবিত্র বিধানকে কলুষিত করতে কুণ্ঠাবোধ করেনা। সুতরাং তাদের এই কপটতা ও দু'মুখী আচরণকে জিহাদের প্রতি হিংসা ও শত্রুতা ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না। কারণ তাদের অন্তরে যদি জিহাদ আর মুজাহিদদের প্রতি ইশক ও মুহাব্বত থাকত তাহলে অবশ্যই এ কথা বলতো, আরে ভাই! তাদেরকে কাজ করতে দাও। ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ!

সমাধান -৪

মুজাহিদরা শরীয়ত পরিপন্থি কাজ করে এমন কথা বাস্তব সম্মত নয়। বরং এটা মিথ্যা অপবাদ। আসল কথা হল নির্দিষ্ট কিছু মানুষ কোনদল বা সংগঠনের এজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মুজাহিদ ও জিহাদের নাম ব্যবহার করে। এতে করে মুজাহিদদের ভাবমূর্তি ও চরিত্র কলুষিত করার পিছনে থাকে এক গভীর ষড়যন্ত্র। সুতরাং এমন ছদ্মবেশী মানুষ দেখে জিহাদের সমালোচনা করা আদৌ ঠিক হবে না। কোন চোর নামাজি ও মুসল্লির রূপ নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করে জুতা চুরি করলে এখানে আপনাকে বুঝতে হবে মসজিদে কোন নামাজি চুরি করতে আসেনি। বরং যে চোর সেই নামাজির রূপ নিয়ে চুরি করে পালিয়েছে। এজন্য একজন চোরকে কেন্দ্র করে অন্যান্য দ্বীনদার মুসল্লিদের সমালোচনা করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

কেনিয়ার নাইরোবি শহরে আমি একবার জিহাদি সফরে ছিলাম। শুনলাম পাকিস্তানি একটি জামাত এখানে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে এসেছে। এমনকি তারা এক সালের জন্য বের হয়েছে। বর্তমানে তারা মারকাজে অবস্থান করছে। সংবাদ পেয়ে আমি তাদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে আসি। পরস্পর কুশল বিনিময় ও পরিচিত হবার পর যখন মূল কথায় আসি দারুণভাবে তারা আমাকে হতাশ ও নিরুৎসাহীত করতে থাকে। একজন দেশী ভাই হিসেবে তারা আমার সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করতে পারতো। কিন্তু তা না করে করেছে উল্টো। নানা রকম আপত্তি, অভিযোগ ও সমালোচনার মাধ্যমেই তারা আমার মেহমানদারী করেছিলো। এই জামাতে একজন ডাক্তার ছিলেন। তিনি পাঞ্জাবের ওযীরাবাদ শহরের অধিবাসী। তার একমাত্র সন্তান মুজাহিদ হয়ে গেছে। এটাই ছিলো তার সবচে' বড় মাথা ব্যাথার কারণ। তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বললেন, মাওলানা! যেখানে মুজাহিদরা ছবি তোলে, ভিডিও করে, দাঁড়ি মুন্ডায়, রাস্তার ধারে অলি-গলিতে ছবি-ফেষ্টুন পুস্পুত্তলিকা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শ্লোগান দেয়। আমেরিকার কাছে কাশ্মীর স্বাধীনতার দাবী জানায়। এর নামই কি জিহাদ? এগুলো কি সুন্নত পরিপন্থি নয়? এরা আবার কিসের জিহাদ করতে চায়? ডাক্তার সাহেবের কথায় আমি বুঝতে পারলাম কোন্ ধরনের লোক দেখে তিনি জিহাদের বিষয়ে ভুল-ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। তারপর আমি

বললাম, এখন কারো জিহাদ যদি শরয়ী জিহাদ না হয় তাহলে আপনাদের দাওয়াতে তাবলীগও শরয়ী দাওয়াত বলে গণ্য হবে না। কারণ, এখানেও কিছু কিছু মানুষ মাথায় সবুজ পাগড়ি পরে সুন্নতের দাবি করে। অথচ তারা সুস্পষ্ট কুফুরী এবং বিদয়াতি মতবাদের প্রচার করে ঘুরে বেড়ায়। তাহলে কুফুর বিদয়াত প্রচার করার নামও কি তাবলীগ? ডাক্তার সাহেব সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, না। আমরা এসব কাজ করিনা। যারা এসব কাজ করে আমরা তাদের চেয়ে ভিন্ন এক জাতি। এদেরকে কেন্দ্র করে আমাদের উপর প্রশ্ন করা ঠিক হবে না। এবার আমিও তাকে বললাম, ডাক্তার সাহেব! আপনি যেসব আপত্তি ও অভিযোগের কথা বলেছেন, আমরাও এগুলো করিনা। যারা করে তারা আমাদের চেয়ে ভিন্ন এক শ্রেণীর মানুষ। সুতরাং তাদেরকে কেন্দ্র করে আমাদের ব্যাপারে কোন সমালোচনা করাও ঠিক হবে না। কিছু বিদয়াতি লোকের কাজ দেখে যেমন আহলে হকের দাওয়াত ও তাবলীগ নিয়ে প্রশ্ন করা যায় না, হাতেগোনা দু'চারজন মানুষের কর্মকান্ড দেখে জিহাদের পবিত্র বিধানকে প্রশ্নবিদ্ধ করবেন না।

সমাধান -৫

কোন ব্যক্তি যদি গুনাহ করা অবস্থায় জিহাদের কাজ করে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে যায়, তার সব গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। এমন প্রতিশ্রুতি বাণী হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে। শুধু গুনাহ মাফ হবে তাই নয়। বরং তাকে আরো শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান করা হয়েছে। সে সত্তরজন আপন জনকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে। যাদের জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গিয়েছিলো। সে তাদের জন্য সুপারিশ করবে। আল্লাহ তা'য়ালা তার সুপারিশ মঞ্জুর করবেন।

নববী যুগের একটি ঘটনা আপনাদের সামনে পেশ করছি। এতে আপনারা বুঝতে পরবেন। কোন গুনাহগার ব্যক্তি যদি জিহাদে অংশ গ্রহণ করে আমরা তাদের সাথে কেমন আচরণ করছি আর স্বয়ং রাসূল সা. কেমন আচরণ করেছেন!

عن ابن عائذ يقول خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم في جنازة رجل فلما وضع قال عمر بن الخطاب : لا تصل عليه يا رسول الله فإنه رجل فاجر فالتفت رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى الناس فقال : هل رآه أحد منكم على عمل الإسلام فقال رجل نعم يا رسول الله حرس ليلة في سبيل الله فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم و حثى التراب عليه و قال أصحابك يظنون أنك من أهل النار و أنا أشهد أنك من أهل الجنة و قال يا عمر إنك لا تسأل عن أعمال الناس و لكن تسأل عن الفطرة .

- شعب الإيمان للبيهقى : 4297 السابع و العشرون من شعب الإيمان و هو باب في المرابطة في سبيل الله عز و جل.

مشكاة المصابيح : 336 كتاب الجهاد الفصل الثالث .

"ইবনে আয়েয রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. এক ব্যক্তির জানাযা পড়ার জন্য তাশরিফ নিয়ে গেলেন। মায়্যিতকে যখন সামনে আনা হলো উমার রা. বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তির জানাযার নামাজ পড়বেন না। কারণ সে গুনাহগার। একথা শুনে রাসূল সা. সাহাবায়ে কেরামের দিকে তাকিয়ে বললেন। তোমাদের কেউ কি এ ব্যক্তিকে কোন নেক আমল করতে দেখেছ? এক ব্যক্তি বলল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জিহাদের ময়দানে সে একটি রাত পাহারা দিয়েছিল। তারপর রাসূল সা. তার জানাযা পড়লেন এবং বরকতময় হাতে তার কবরে মাটি দিয়ে বললেন, তোমার সাথীরা তো মন্তব্য করে তুমি জাহান্নামী। আর আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি নিশ্চিত জান্নাতী। এরপর রাসূল সা. হযরত ওমর রা. কে বললেন, হে উমার! তোমাকে মানুষের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না। বরং জিজ্ঞাসা করা হবে তোমার আমল সম্পর্কে।" (মেশকাত কিতাবুল জিহাদ)

মুহতারাম দোস্ত-বুযুর্গ ! এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো, আমাদের এলাকায় যদি এমন ব্যক্তির জানাযা আসে আমরা কি করবো? কোন ব্যক্তি জিহাদে গিয়ে কিছুদিন যুদ্ধ করলো। (আল্লাহ না করুক) সে আবার কোন গুনাহে লিপ্ত হলো। অথবা কোন

গুনাহগার ব্যক্তি খাঁটি মনে তাওবা করে জিহাদে অংশগ্রহন করত: শহীদ হয়ে গেলো। এদের ব্যাপারে আমরা যে চরম বিব্রতকর মন্তব্য করি, আমাদের ছোট মুখ থেকে যে বিষ-বাষ্প ও অগ্নিমালা ছুঁড়ে থাকি। এ থেকে আমাদের ফিরে আসতে হবে। এক্ষেত্রে রাসূল সা. যে নীতি গ্রহন করেছেন আমরাও তাই করবো। রাসূল সা. এর বরকতময় আমলই আমাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও দলীল। সুতরাং যারা স্বল্পজ্ঞানী নামকা ওয়াস্তে ধার্মিক ও ইসলামের লেবাসধারী তাদের কথায় বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না। আল্লাহ তা'য়ালা সবাইকে দীন বুঝার তাওফীক দান করুন! আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন!

ব্যক্তিগত অভিমত

আমি ব্যক্তিগত ভাবে বলবো, জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়ে যায়, (বর্তমান যুগে জিহাদ ফরযে আইন) কোন মুজাহিদ যদি জিহাদরত অবস্থায় নামায না পড়ে, সে ওই আবেদের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান যে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করে; কিন্তু জিহাদ করে না। প্রথম কারণ, তারা উভয়ে কবীরা গুনাহে লিপ্ত। মুজাহিদ নামায না পড়ার কারণে কবীরা গুনাহে লিপ্ত আর বাইতুল্লাহর আবেদ জিহাদ না করার কারণে। কবীরা গুনাহের দিক থেকে উভয়ে সমান। কিন্তু উভয়ের গুনাহের মাঝে রয়েছে আসমান-যমীনের ব্যবধান। মুজাহিদ নামায না পড়ার কারণে যে ক্ষতি হবে সেটা তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর আবেদ জিহাদ পরিত্যাগের কারণে যে ক্ষতি হবে সেটা তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং সে ব্যক্তিগত ভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত গোটা মুসলিম জাতীও ক্ষতিগ্রস্ত।

দ্বিতীয় কারণ, মুজাহিদ যদি জিহাদের ময়দানে শহীদ হয়ে যায় তার সমূহ গুনাহ মাফ হয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি হাদীস শরীফে পাওয়া যায়। ইরশাদ হচ্ছে-

عن عتبة بن عبد السلمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان السيف محاء للخطايا

- مسند أحمد: 454/13 رقم الحديث:17588 ، - صحيح لإبن حبان: 519/10 رقم الحديث:4663 ، - الجهاد لإبن المبارك: 62

"তলোয়ার গুনাহ সমূহকে মুছে দেয়"।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « الْقَتْلُ فِى سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَىْءٍ إِلاَّ الدَّيْنَ »
-صحيح مسلم. باب مَنْ قُتِلَ فِى سَبِيلِ اللهِ كُفِّرَتْ خَطَايَاهُ إِلاَّ الدَّيْنَ.

আল্লাহর পথে জিহাদ করা ঋন ছাড়া সব গুনাহ মাফ করে দেয়।

কিন্তু আবেদের জন্য এই ফরজে আইন (জিহাদ) পরিত্যাগ করার ক্ষতিপূরণ কিভাবে হবে? এর জন্য তো কোন প্রতিশ্রুতি নেই। বরং তার ব্যাপারে মুনাফিকী মৃত্যুর আশংকা আছে। জিহাদ পরিত্যাগের কারণে কিয়ামতের দিন শরীরে দাগ ও আলাদা চিহ্ন থাকার ভয় আছে। তবে আল্লাহ তা'য়ালা যদি করো উপর বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ করেন সেটা ভিন্ন কথা।

সতর্কবাণী:

পূর্ব উল্লেখিত আলোচনার দ্বারা আমার এটা উদ্দেশ্য নয় যে, মুজাহিদদের ভিতরে কাঠামো বিন্যাস নেই। কেননা মুজাহিদরাও মানুষ ফেরেস্তা নয় তাদের দ্বারা ভূল হতেই পারে। বরং অধিকাংশ সময় ভূল করে ফেলে কিন্তু এ ভূলের কারণে জিহাদ পরিত্যাগ করার কোন অবকাশ নেই। আর জিহাদের উপরে আপত্তি ও তোলা যাবে না। হ্যাঁ মুজাহিদীনদেরকে সংশধনের জন্য উত্তম পন্থায় চেষ্টা করার অবকাশ রয়েছে।

লক্ষ্যণীয়:

একথা চুড়ান্ত যে, আল্লাহ তা'য়ালার সাহয্য ও মদদ সে সময় আসে যখন মুজাহিদীন আল্লাহ তা'য়ালাকে সন্তুষ্ট রাখে এবং নিজেদের কজের সফলতার চিন্তা করবে। এ জন্যই সাহাবায়ে কেরামের বিজয় শুধু মেসওয়াকের সুন্নাত ছুটে যাওয়ার কারণে বিলম্ব হয় তাহলে আমরা কোন বাগানের বুলবুলি। এ জন্য মুজাহিদীনদেরকে বিষেশ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। নিজের জীবনকে দ্বীনের অনুসারী করবে। এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখবে। বরং সাধারণ লোকদের চেয়ে নিজেদের আমলকে বেশি সুন্নাত মোতাবেক করার চেষ্টা করবে। ফরজ ওয়াজিব ছাড়াও সুন্নাত এবং মোস্তাহাবের প্রতি যত্নবান হবে। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে পরিপূর্ণ দ্বীন বুঝার তাওফিক দান করুন। আমীন!

ইশকের নামাজ

কেউ বলল জিহাদের জন্য নামায এবং দাঁড়ি শর্ত অথচ নামায সতন্ত্র ফরজ জিহাদ সতন্ত্র ফরজ দাঁড়ি সতন্ত্র ওয়াজিব। দাঁড়িও জরুরী নামায ও জরুরী জিহাদও জরুরী। আল্লাহর কসম মুজাহিদ যে নামায আদায় করে কারো সে নামায নসীব হয় না।

"ইশকের নামায আদায় হয় তলোয়ারের ছায়ায়" গুলির বৃষ্টি বর্ষন হচ্ছে আর মুজাহিদ বলছে الحمد لله رب العالمين। এই মুহুর্তে আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা করায় যে প্রশান্তি অনুভব হয়, জিহাদের বাহিরে থেকে কোথাও তা অনুভব হয় না। اهدنا الصراط المستقيم। হে আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথে চালান। যে রাস্তায় নবীগন চলেছে, সিদ্দীকীনরা চলেছে এবং শুহাদারা চলেছে। মৃত্যুর সামনে দন্ডায়েমান হয়ে নামযে যে স্বাধ অনুভব হয় তা আর কোথাও হয় না। যাতে আন্তরে এক্বীন হয়ে যায় যে কোন সময় গুলি লাগতে পারে এবং নামাজ পড়তে পড়তে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে পৌছে যেতে পারে। যদি মুজাহিদীনরা বে-নামাযী হয় তাহলে অসামান থেকে ফেরেস্তা সাহায্য করতে আসবে না। রাসিয়ান জেনারেলরা কসম খেয়ে বলেছিল যে

আমরা স্বচোক্ষে ফেরেস্তাদের অবতরণ দেখেছি। ফ্রান্সের একজন সাংবাদিক আফগানিস্তানের জিহাদের রির্পোটিংয়ের জন্য আসে। কিছু দিন অবস্থান করে মুসলমান হয়ে যায়। এবং সে বলে আমি তাদের প্রতিপালককে ময়দানে লড়তে দেখেছি। যদি এরা ফাসেক হত, তাহলে এত বড় সফলতা কিভাবে অর্যন করত। জিহাদ তো অন্তরকে সংষোধন করে দেয়। এ কারণে রনাঙ্গনে সয়তান আসতে পারে না। কেননা ওরা ফেরেস্তা দেখে সেখান থেকে টিকে থাকতে পরে না। হাদীসে এসেছেঃ মুজাহিদ যে দোয়াই করুক। নবীদের ন্যায় কবুল করা হয় । কেননা মুজাহিদের কোন আমলে অত্মপূজা হয় না।

আত্মঘাতি হামলা

বর্তমান যামানায় কাফেরদের হৃদয় কাঁপিয়ে দেয়ার সবচে বড় অস্ত্র আত্মঘাতি হামলা। কিন্তু এ ধরণের হামলার বৈধতা নিয়ে নানা মহল থেকে প্রশ্ন আসছে।

(১) নিজের মৃত্যু নিশ্চিত জানা থাকা সত্ত্বেও শত্রুর ক্ষতি সাধনের লক্ষ্যে নিজেকে এভাবে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়া কি আত্ম হত্যার শামিল নয়? (২) আত্মঘাতি হামলা এমন সাধারণ জায়গায় করা হয় যেখানে কাফেরদের বয়োবৃদ্ধ পুরুষ, মহিলা, শিশু-কিশোরও নিহত হয়। শরীয়ত তাদেরকে হত্যা করতে অনুমতি দেয় না।

(৩) এ ধরনের আত্মঘাতি হামলার কারণে কোন কোন সময় মুসলমানদের প্রাণ হানীর ঘটনাও ঘটে। মুসলমানকে হত্যা করাতো কোন অবস্থায় বৈধ নয়। কেননা জিহাদতো মুসলমানদের জান-মালের হেফাজতের জন্য ফরজ করা হয়েছে।

বর্তমান যামানায় যেহেতু এ ধরনের নানা প্রশ্ন আমাদের সামনে আসে তাই উল্লিখিত সংশয়গুলোকে সামনে রেখে সঠিক সমাধান দেয়ার চেষ্টা করবো। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে হক কথা বলা এবং লেখার তাওফীক দান করুন! আমীন!!

সংশয় -

আত্মঘাতি হামলা মানে আত্মহত্যা। আর শরীয়ত কখনো আত্মহত্যার বৈধতা দেয়

না। সুতরাং আত্মঘাতি হামলাও বৈধ হতে পারে না। আল্লাহ তা'য়ালা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। "

وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (سورة البقرة-195)

" এবং নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না।

সমাধান -

আত্মঘাতি হামলার ব্যাপারে আপনি যে প্রশ্ন করেছেন, যথাসম্ভব এর পেছনে দু'টি কারণ রয়েছে।

এক. নিজের মৃত্যুর কথা নিশ্চিত জানা থাকা সত্ত্বেও এধরনের হামলা!

দুই. সর্ব অবস্থায় মুজাহিদদের যুদ্ধনীতি এমন হওয়া উচিত যেখানে মুজাহিদদের ক্ষয়-ক্ষতি না হয়। হলেও কম হয় এবং কাফেরদের ক্ষয়-ক্ষতি বেশি হয়। কিন্তু আত্মহত্যার ক্ষেত্রে তো প্রথমে মুজাহিদদের ক্ষতি হয় তারপর অন্যদের। যাই হোক, নিজের মৃত্যুর কথা নিশ্চিত ভাবে জানা থাকা সত্ত্বেও হামলা করাকে আপনারা নাম দিয়েছেন আত্মহত্যা। আর আমরা বলি আত্মঘাতি হামলা। এধরনের হামলা যে জায়েয ইতিহাসের বহু ঘটনাই তার দলীল ও প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করা যাবে।

কিন্তু আলোচনা দীর্ঘ না করে নবী যুগের একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। আশা করি বিষয়টি বুঝার জন্য এমন একটি ঘটনাই যথেষ্ট হবে। ইনশা-আল্লাহ!

রাসূল সা. হযরত হারেস ইবনে ওমায়ের রা. কে দাওয়াতী পত্র দিয়ে পাঠালেন শোরাহবীল ইবনে আমর গাস্সানীর নিকট। কিন্তু এই কমবখ্ত জালিম হযরত হারেস রা. কে মূতা নামক স্থানে শহীদ করে দেয়। এই হত্যার প্রতিশোধ নিতে রাসূল সা. অষ্টম হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে তিন হাজারের একটি সশস্ত্রবাহিনী হযরত যায়েদ

ইবনে হারেসার নেতৃত্বে প্রেরণ করেন। যাওয়ার সময় বলে দিলেন, যদি যায়েদ রা. শহীদ হয়ে যায় তোমরা জা'ফর ইবনে আবি তালেবকে আমীর বানাবে। তিনিও যদি শহীদ হয়ে যান তাহলে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে আমীর বানাবে। তারপর তিনিও যদি শহীদ হয়ে যান তাহলে তোমরা পছন্দমত একজনকে আমীর বানিয়ে নিবে। এখন বড় বড় তিনজন আমীর শহীদ হয়েছেন বিধায় এই যুদ্ধটিকে "গাযওয়া জাইশুল উমারা"ও বলা হয়।

এই বাহিনী যখন মদীনা শরীফ থেকে বের হয় তাদের অগাধ বিশ্বাস ছিলো যে, এই যুদ্ধে আমাদের তিনজনেরই শাহাদাত নিশ্চিত। সুতরাং মৃত্যুর খবর নিশ্চিত ভাবে জানা সত্ত্বেও হামলা করা যদি আত্মহত্যার শামিল হতো। সাহাবায়ে কেরাম রা. কস্মিনকালেও একাজ করতেন না।

আমি প্রমাণ স্বরূপ পেশ করছি যে, কোন ধরনের হামলা হলেই যে কারো মৃত্যু হতে হবে এটাও নিশ্চত নয়। বরং বোমা, গ্রেনেড বিস্ফোরিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি। শরীর ভেদ করে বুলেট বেরিয়ে গেছে তবুও মৃত্যু হয়নি। এগুলো অসম্ভব কোন ঘটনা নয়। নিকট আফগান যুদ্ধে এধরনের বহু ঘটনা বর্তমান। কিন্তু রাসূল সা. কারো ব্যাপারে শাহাদাতের সংবাদ দিবেন আর সে শহীদ হবে না এটা অসম্ভব। তাহলে শরীরের সাথে বোমা বেঁধে আত্মঘাতি হামলায় নিজের মৃত্যুর ব্যাপারে যতোটা নিশ্চিত, সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের মৃত্যুর ব্যাপারে তার চেয়ে আরো বেশি নিশ্চিত হয়ে যুদ্ধে গিয়েছিলেন। আরে! শত্রুর পরাজয় ও মৃত্যুর কথা তাদের যতোটা বিশ্বাস না ছিলো; তার চেয়ে আরো বেশি নিশ্চিত ছিলো নিজের মৃত্যুর কথা। অতএব মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও আক্রমণ করার নাম যদি হয় আত্মহত্যা? তাহলে সাহাবায়ে কেরাম রা. কখনো একাজ করতেন না।

সর্বাবস্থায় মুজাহিদদের যুদ্ধনীতি এমন হওয়া উচিত, যাতে করে মুজাহিদদের কোন ক্ষতি না হয় এবং কাফেরদের ক্ষতি বেশি হয়। তাহলে ভাই! আপনাকে বলবো, অবস্থা যদি এতোই কঠিন হয়, যেখানে নিজের ক্ষয়-ক্ষতি ছাড়া শত্রুর ক্ষতি করা এবং

শত্রুর উপর আঘাত করা মোটেই সম্ভব নয়। আফগান যুদ্ধে আমরা এমনটাই দেখেছি। শত্রুরা ক্যাম্প ও ঘাঁটি তৈরী করে অনেক দূর পর্যন্ত মাইন পুঁতে রেখেছে। রাতের অন্ধকারে মুজাহিদগণ এসব মাইন উত্তোলন করে ক্যাম্প দখলের রাস্তা পরিষ্কার করেছেন। কিন্তু সেনা ক্যাম্পের নিকটতম যেসব মাইনগুলো উত্তোলন করতে সক্ষম হয়নি সেখানে পথ একটাই। হামলা করার সময় আল্লাহর নাম নিয়ে একজন মাইনের উপর দিয়ে যাবে। এভাবে সে নিজের জীবন কুরবান করে অন্য মুজাহিদ ভাইদের সংগ্রামের পথ পরিষ্কার করে দিবে। শরীয়ত এধরনের হামলা অনুমোদন দিয়ে থাকে। ইসলামের ইতিহাসে আমরা অনেক ঘটনাই এমন দেখতে পাই। যেমন: নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার মুসায়লামাতুল কায্যাব যখন বাগান বাড়ির দূর্গম কেল্লার নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় বেষ্টিত। কেল্লার প্রধান ফটক বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আছে উপর্যপূরী রক্ষী বাহিনী। এ কঠিন অবস্থায় অন্দর মহলে ঢোকার কোন পথ নেই। তবে একটাই পথ আছে, কিছু লোক যদি নিচের জীবন কুরবান করতে পারে তবেই ভিতরে ঢোকা সম্ভব হবে। এ জন্য হযরত ইবনে মালেক রা. সাথী-সঙ্গীদের বললেন, তোমরা আমাকে কাঠের ওপর বসিয়ে কোন রকম ভাবে দেয়াল ও প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছাও। আর বাকীটা আমার উপর ছেড়ে দাও। তারপর পরিকল্পনা মতো বারা ইবনে মালেক রা. কে ভিতরে প্রবেশ করানো মাত্রই তিনি ক্ষীপ্রগতীতে আক্রমণ করলেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি শত সৈনিককে ধরাশায়ী করে মূল ফটকের দিকে এগিয়ে যান। পরিশেষে তিনি ফটক খুলে দেন। আর অমনি করে মুসলিম বাহিনী ভিতরে প্রবেশ করেন এবং মুসায়লামার শিরোশ্ছেদ করেন। এখানে মুসলমানদের বিজয়ের পেছনে মূল রহস্য একটাই। এই আয়াতের ব্যাখ্যার অসারতা সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণ্য। হযরত আবু ইমরান রা. বলেন, কনস্টান্টিনোপল যুদ্ধের সময় এক মুহাজির সাহাবী রা. যখন একাকী শত্রুর কাতারে ঢুকে তুমুল যুদ্ধ শুরু করলেন। কেই বলল হায় সে কী করছে? সেতো নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এ কথার সূত্র ধরে হযরত আবু আইয়্যুব আনসারী রা. বললেন, এই আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা আমাদের ভালো করেই জানা আছে। কারণ, এ আয়াত আমাদের ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে।আল্লাহ তা'য়ালা যখন ইসলাম ধর্মকে অপরাপর ধর্মের উপর বিজয় দান করলেন। তখন কয়েকজন আনসার সাহাবী রা.

পরস্পরে আলোচনা করলেন। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরতে রাসূল সা. এর সোহবতে থাকা এবং তাঁর যথেষ্ট খেদমত করার তৌফিক দান করেছেন। আমরা অনেক যুদ্ধ জিহাদ করেছি। ইসলাম জয়ী হয়েছে আর কুফর নিস্তনাবুদ হয়ে গেছে। এখন সর্বত্র ইসলাম বিরাজ করছে। দীর্ঘদিন আমরা যুদ্ধ-জিহাদে ব্যস্ত থাকায় নিজের ঘর-বাড়ি ছেলে-সন্তান, চাষাবাদ ,ব্যাবসা-বানিয্য ইত্যদির প্রতি মনোনিবেশ করতে পারিনি। এবার একুট সময় হয়েছে এদিকে দৃষ্টি দেয়ার। তখন এই আয়াতি নাযিল হয়। "وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" জিহাদ ছেড়ে নিজের ছেলে-সন্তান আর চাষাবাদের কাজ-কর্ম ব্যস্ত হয়ে নিজেকে ধংসের মুখে ঠিলে দিয়ো না। হযরত আবু ইমরান বলেন মুহাযিরীনদের মধ্যে এক ব্যক্তি কনস্টান্টিনোপল যুদ্ধে শত্রুর কাতারে ঢুকে পড়লেন। এবং ভয়াবহ আক্রমন শুরু করলেন যার কারণে কেউ কেউ বলতে শুরু করল সে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ফেলে দিয়েছে।

সুতরাং হযরত আবু অইয়ূব আনসারী রা. বর্ণনাও আয়াতের শানে নুযূল আনুযায়ী আয়াতের মর্মবাণী তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা জিহাদের ময়দানে যায় না। যারা জিহাদের জন্য নিজের জান-মাল ব্যয় করে না। তারাই যেনো নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু আজ আমদের জন্য অত্যন্ত দু:খের বিষয় হলো, কিছু জ্ঞানহীন ও কমজ্ঞানী লোকেরা, জিহাদের ময়দানে গিয়ে জীবন কুরবান করাকে মনে করে জীবন ধ্বংস করা। প্রিয় পাঠক! এখন এই আয়াতের ব্যখ্যা কি করবেন? সেটা আপনার কাছে আমানত। আপনি কি জ্ঞানহীন ও কমজ্ঞানী লোকের মত মনগড়া ব্যাখ্যা করবেন নাকি সাহাবায়ে কেরাম রা. এর মত ব্যাখ্যা করবেন।

আরেকটি রেওয়াতে আছে কনষ্টিপোল যুদ্ধে এক ব্যক্তি হযরত বারা ইবনে আযেব রা. কে জিজ্ঞাসা করলো আমি যদি একাকী শত্রুর কাতারে ঢুকে তুমুল যুদ্ধ করি এবং এ অবস্থায় আমি নিহত হই আয়াতের মর্ম অনুযায়ী আমি কি আত্মহত্যকারী হবো? হযরত বারা ইবনে আযেব রা. বললেন, "না" বরং আল্লাহ তা'য়ালা নবী সা. কে নির্দেশ দিয়েছেন।

فَقَـاتِلْ فِـي سَبِـيـلِ ٱللهِ لا تُـكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ (سورة الـنساء-84)

হে নবী ! আল্লাহর পথে লড়াই করতে থাকুন। আপনিতো শুধু আপনার জীবনের ব্যাপারেই আদেশ প্রাপ্ত। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করা থেকে বিরত থাকে তাদের ব্যাপারে উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে। মুফাস্সিরগন এই আয়াত সম্পর্কিত অনেক বর্ণনা একত্র করেছেন। বিস্তারিত জানাতে তাফসীর গ্রন্থ অধ্যায়ন করা যেতে পারে।

মূল কথা:

নিজের জীবনের প্রতি মায়া না করে শত্রুর কাতারে ঢুকে পড়া শত্রুর উপর অতর্কিত হামলা করা এবং নিজের জীবনকে উড়িয়ে দিয়ে শত্রুর উপর অতর্কিত হামলা করা এবং নিজের জীবনকে উড়িয়ে দিয়ে শত্রুদের মৃত্যু ও ধ্বংসের ব্যাবস্থা করা। এটা চরম দুর্ভাগ্য নয়; বরং পরম সৌভাগ্য।

কিন্তু প্রকৃত অর্থে হতভাগা দূর্ভাগ্য হালাকী বরবাদী তাদের জন্য যারা ভীতু-কাপুরুষ। জিহাদ থেকে দূরে থাকে। কার্পন্যতা প্রকাশ করে। এবং জিহাদের বিরুদ্ধে কথা বলে। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের আকলে সালীম দান করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!!

একটি ফতুয়া

আত্মঘাতি হামলার বিষয়ে সাপ্তাহিক “যরবে মুমিন” ৫ ও ১১ ই রবিউল আওয়াল ১৪২১ হিজরী, ও ৯ও১৫ই জুন ২০০০সালে একটি ফতোয়া সম্প্রচার করে। “শ্রীনগর নওজওয়ান মুজাহিদ আফাক আহমদ শহীদ রহ. কর্তৃক এক ভয়ংকর আত্মঘাতি বোমা হামলায় ইন্ডিয়া শ্রীনগর সেনা বাহিনীর হেড কোয়াটারে ছোট খাট কেয়ামত ঘটে যায়।

এরপর থেকেই নানা মহল থেকে প্রশ্ন আসে, এধরনের হামলার শরয়ী বিধান কি? আফগান ও কাশ্মীর জিহাদের ২০ বছরের ইতিহাসে এধরণের হামলা ছিলো প্রথম। ইতিপূর্বে আর কখনো আত্মঘাতি হামলা হয়নি তাই এধরনের হামলার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন আসাটা স্বাভাবিক। উক্ত বিষয়ে "যরবে মুমিন" তার প্রিয় পাঠকের সঠিক অবগতির জন্য দেশের নির্ভরযোগ্য ও গবেষনা মূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া বিন্নুরী টাউন, দারুল ইফতা ফতোয়া তলব করে যে, নওজাওয়ান নিজের গাড়িতে বোমাও বিষ্ফরক ভর্তি করে অথবা নিজের শরীরের সাথে বোমা বেঁধে ভারতীয় সেনাবহিনী কিংবা অন্য কোন যালিম-কাফিরদের উপর হামলা করে নিজের জীবন শেষ করে দেয়া জায়েয হবে কি না?

কেউ কেউ এরকমের হামলাকে আত্মহত্যা নামে অভিহিত করায় অনেকের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। এধরনের হামলা করা যদি জায়েয হয়ে থাকে সেটাকে জিহাদ বলা যাবে কি না?

উচ্চতর গবেষনা মূলক প্রতিষ্ঠান, জামিয়াতুল ইসলামিয়া আল্লামা বিন্নুরী টাউন এর দারুল ইফতা ওয়াল ইরশাদ এর স্বনাম ধন্য মুফতী সাহেবগনের সম্বিলিত ভাবে ঐতিহাসিক ফতোয়া লিখিত আকারে প্রকাশ করে বলেন, এধরনের আত্মঘাতি হামলা শুধু জায়েযই নয়; বরং এটা হচ্ছে জিহদ ও শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা। ফতোয়ার এধরনের হামলাকে অত্যন্ত প্রসংশাকারী মুজাহিদদের শহাদাতকে শ্রেষ্ঠ শাহাদাতের মর্যদা দেয়া হয়েছে।

উপরোল্লিখিত ফতোয়া থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে আসে যে, আল্লাহর পথে জীবন বাযী করা এবং জীবন কুরবানী করার এর চেয়ে উত্তম কোন সুরাত ও নমুনা হতে পারে না। যারা এটাকে আত্মহত্যা মানে করেন তাদের জ্ঞানহীন ও সল্পজ্ঞানেরই পরিচয়। শুধু তাই নয় বরং আত্মহত্যার ব্যাখ্যা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কেও তারা অনবিজ্ঞ। কারণ, আত্মহত্যাকারী দুনিয়ার বালামুসিবত ও জ্বালা যন্ত্রনায় আবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়, তারপর আল্লাহর হুকুম পরিপন্থি নিজের জীবন ধ্বংশ করে। কিন্তু

আত্মঘাতি হামলার বিষয়টি তার বিপরিত। আত্মঘাতি হামলাকারী মুজাহিদদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বিধান জিহাদের আমলের মাঝে কুফরী শক্তিকে নিস্তানাবুধ করা। কাফেরদের মাঝে ভয়ও আতংক সৃষ্টি করা। মুসলমানদের বীর বাহাদরী প্রকাশ করা। আবিস্মরনীয় শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করে আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়া।

দারুল ইফতা ওয়াল ইরশাদ এর পক্ষ থেকে আত্যঘাতি হামলার বিষয়ে বিভিন্ন দলীলের আলোকে এই পরামর্শ দেয়া হয়েছে। বর্তমান যুগে মুসলিম মিল্লাতের অস্তিত্ব মিটিয়ে দেয়ার জন্য যখন প্রাচ্য ও প্রশ্চাত্যের কাফেররা এবং তাদের মিত্ররা জোট গঠন করেছে, বিশ্ব মানচিত্র থেকে ইসলমের নাম মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। আর এক্ষেত্রে কাফের প্রধানরা নিজেদেরকে নিরাপত্তার বেষ্টনীতে নিরাপদ মনে করে ক্রমশ মুসলমানদের উপর যুলুম নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে। অপর দিকে মুজাহিদদের নিকট পর্যাপ্ত পরিমান যুদ্ধ সরঞ্জাম না থাকায় কাফেরদের বরবরতা ও পাশবিকতা বেড়েই চলছে। তাই এমন পরিস্থিতিতে ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষার জন্য এধরনের হামলার কোন বিকল্প নেই। প্রয়োজনে এধরনের হামলাকে আরো উন্নত ও আধুনিকায়ন করা উচিত, যাতে করে বর্তমান যুগের আধুনি প্রযোক্তিও টেকনালোজীর ধব্জাধারী কাফেররা ও এধরনের হামলার মুকাবিলা করার সাহস না পায়।

ফতোয়া আনুযায়ী এরকম আকুত ভয় হামলার পেছনে ইমানী শক্তি, দীন রক্ষার প্রেরনা, ইসলামের মর্যাদা অক্ষুন্য রাখার আত্মাভিমান, জিহাদের যজবা আর শাহাদাতের গভীর প্রেরনার কথা উল্লেখ করা হয়। যালেম কাফেরদের আতংকিত করে তোলার বে-নজীর দৃষ্টান্ত ও বীর বাহাদুরী প্রকাশের চুড়ান্ত সীমা এই হামলার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। কুরআন,হাদীস,সাহবায়ে কেরামের বণী,খইরুল কুরুন-সর্বকালের শ্রেষ্ট মুজাহিদগণের অবস্থা এবং ফিক্বাহ শাত্রের কিতাব থেকে দলীল ও প্রমানের ভিত্তিতে আফাক শহীদ রহ. এর আত্ম্যঘাতি হামলাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি, ইসলামের হেফাজত এবং বীরত্ব ও বাহাদুরীর সর্বশেষ্ঠ মর্যাদা হিসাবে স্বকৃতী প্রধান করা হয়।

এই ফতোয়াটি জামেয়া বিন্নুরী টাউন এর ফতোয়া বিভাগের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী দা.বা. জামেয়ার শাইখুল হাদীস ও ফতোয়া বিভাগের পরিচালক মুফতী নিযম উদ্দীন শামযায়ী এবং মুফতী আব্দুল মজিদ দ্বীনপুরী প্রমখ উলামায়ে কেরামের দস্তখত ও সীলসহ ফতোয়াটি প্রকাশ করা হয়।

একটি স্বপ্ন

এক যুবক স্বপ্নযোগে রাসূল সা. এর যিয়ারত নসীব করেন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, রাসূল সা. তাকে নিজের কাঁধে তোলে রেখেছেন। এ স্বপ্ন দেখার পর যুবকের অবস্থা অন্যরকম। স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানাতে এক বুযুর্গের নিকট ছুটে গেলেন। ওই বুযুর্গ বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা আপনার মাধ্যমে বড় ধরনের কোন কাজ নিবেন। এজন্য এখন সঠিক পথে চলে আসুন। তারপর তিনি রাসূল সা. এর সাচ্চা আশেক ও দেওয়ানা হয়ে জিহাদের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়লেন। সেই যুবক হলেন কমান্ডার শহীদ বেলাল রহ.। যার নাম পৃথিবী জুড়ে বিক্ষাত। ১৪২১ হিজরীর ২৮ শে রমযান, সোমবার দিনে, দুইটা পঞ্চাশ মিনিটের সময় একটি প্রাইভেটকারে আড়াই মন গোলা বারুদ ভর্তি করে "কালিমায়ে তাইয়্যিবা" পড়া অবস্থায় শ্রীনগরে অবস্থান রত বাহিনীর হেড কোয়াটারে এক ভয়ংকর আত্মঘাতি হামলা করেন। এ হামলায় কয়েক ডজন ভারতীয় ফৌজ নিহত হয় এবং কয়েকটি ভবন মাটির সাথে মিশে যায়। (সুত্রঃ যরবে মুমিন। ৫ ও ১২ হিজরী রবিউল আওয়ালে, ১৫২১ হিজরী।)

সংশয় - ২৬

আত্মঘাতী ও ফিদায়ী হামলায় বৃদ্ধ, নারী ও শিশু ও নিহত হয়। অথচ হাদীস শরীফে তাদের হত্যা করতে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

সমাধান -

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নবীজী সা. যুদ্ধের মধ্যে বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের কে হত্যা করতে নিধেষ করেছেন। কিন্তু এ হুকুম তখনই যখন বৃদ্ধ, নারী ও শিশুরা যুদ্ধে শরীক না হবে। পক্ষান্তরে এরা যদি যুদ্ধে শরীক হয় অথবা কাফের সৈন্যদের সাহায্য করে চাই পরামর্শ দিয়ে অথবা আর্থিক সহায়তা করুক কিংবা যুদ্ধে বের হতে উদ্বুদ্ধ করুক বা গুপ্তচরাবৃত্তি করুক। মোটকথা যে কোন পন্থায় তারা যদি কাফেরদের সাহায্যকারী সাব্যস্ত হয় তাহলে তাদের কে হত্যা করা জায়েয। বরং সওয়াব ও প্রতিদান লাভের কারণ।

হোক বা শিশু কিংবা পাগল, দূর্বল বা নারী

নিশ্চয় সে শত্রু যে শত্রুর সাহায্যকারী।

ইমাম আবূ জাফর আহমদ বিন মুহাম্মাদ ত্বহাবী স্বীয় প্রসিদ্ধ কিতাব (শরহু মা'আনির আসার) এর মধ্যে নিম্নোক্ত শিরোনামে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। باب الشيخ الكبير هل يقتل في دار الحرب أم لا - জিহাদের মধ্যে বৃদ্ধদেরকে হত্যা করা যাবে কিনা? এই শিরোনামে নিম্নোক্ত হাদীসও সিদ্ধান্ত উল্লেখ করেছেন।

হাদীস শরীফ :

নবীজী সা. হুনাইনের যুদ্ধের থেকে অবসর হয়ে সৈন্যবাহিনীকে আবূ আমেরের হাতে সোপর্দ করে আওতাসের দিকে রওয়ানা করেন। সেখানে হযরত রবী ইবনে রফী রা. দুরাইন ইবনে সম্মাকে পেয়ে তার উটের লাগাম ধরে ফেল্লেন। প্রথমে ধারণা করেছিলেন কোন মহিলা হবে পরে দেখেন এতো বৃদ্ধ পুরুষ। দুরাইদ হযরত রবী রা. কে বললেন তোমার মনের বাসনা কি? হযরত রবী রা. বললেন আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই। তিনি তলোয়ার চালালেন কিন্তু তার কিছুই হলনা। তখন দুরাইদ বলল-

: بِئْسَمَا سَلَّحَتْك أُمُّك ، خُذْ سَيْفِي هَذَا مِنْ مُؤَخِّرِ رَحْلِي ، ثُمَّ اضْرِبْ وَارْفَعْ عَنْ الْعِظَامِ ، وَارْفَعْ عَنْ الدِّمَاغِ فَإِنِّي كَذَلِكَ كُنْت أَقْتُلُ الرِّجَالَ

তোমার মা তোমাকে ভাল করে শিখায়নি। আমার পিছন থেকে তলোয়ার নাও। কেননা এভাবেই আমি মানুষকে হত্যা করতাম। আল্লামা ত্বহাবী একটু অগ্রসর হয়ে বলেন-

فَلَمَّا قُتِلَ دُرَيْدٌ ، وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ فَانٍ ، لَا يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ ، فَلَمْ يَعِبْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، دَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الشَّيْخَ الْفَانِي يُقْتَلُ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَأَنَّ حُكْمَهُ فِي ذَلِكَ حُكْمُ الشُّبَّانِ لَا حُكْمُ النِّسْوَانِ .

যখন দুরাইদের মত বৃদ্ধ (যে নিজের প্রতি আক্রমন প্রতিহত করতে পারে না) কে হত্যা করা হল আর নবীজী এতে কোন দোষারোপ করলেন না তখন ইহাই প্রমাণিত হলো যে, বয়োবৃদ্ধ লোককেও দারুল হারবে হত্যা করা বৈধ। তাদের হুকুম যুবকদের হুকুমের ন্যায়। মহিলাদের মত নয়। পক্ষান্তরে যে হাদীসে বৃদ্ধকে হত্যা করতে নিষেধাজ্ঞা এসেছে যেমন হযরত বুরাইদা রা. এর বর্ণনা নবীজী এরশাদ করেন. لا تقتلوا شيخًا كبيرًا তোমরা বৃদ্ধকে হত্যা করবে না। এই হাদীসের উত্তর দিতে গিয়ে ইমাম ত্বহাবী রহ. বলেন-

فالنهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل الشيوخ في دار الحرب ثابت في الشيوخ الذين لا معونة لهم على شئ من أمر الحرب من قتال ولا رأي وحديث دريد على الشيوخ الذين لهم معونة في الحرب كماكان لدريد

দারুল হরবের বৃদ্ধকে হত্যা না করার বিষয়টি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেসব বৃদ্ধ যুদ্ধে কোন সহায়তা করেনা। না সরাসরি আক্রমনে আর না পরামর্শ দিয়ে। দুরাইদের হাদীস সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেসব ক্ষেত্রে যুদ্ধে বৃদ্ধদের হাত থাকে। যে বৃদ্ধ যুদ্ধে সহায়তা করে অথচ স্বশরীরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়না তাকে হত্যা করা বৈধ। একারণে যে, যুদ্ধে পরামর্শ ও মতামত দিয়ে সহায়তা করা অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধে অংশ গ্রহনের চেয়ে মারাত্মক হয়ে থাকে। ইমাম ত্বহাবী রহ. বলেন :

فلا بأس بقتلهم وإن لم يكونوا يقاتلون لان تلك المعونة التي تكون منهم أشد من كثير من القتال ولعل القتال لا يلتئم لمن يقاتل إلا بها فإذا كان ذلك كذلك قتلوا

অর্থ: সুতরাং সহায়তাকারী বৃদ্ধদেরকে হত্যা করতে কোন বাধা নেই। কেননা তাদের এসব সহয়তা অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধ করার চেয়েও ক্ষতিকর। অনেক ক্ষেত্রে যোদ্ধারা তাদের সহায়তা ছাড়া (বুদ্ধি/পরামর্শ) যুদ্ধই করতে পারে না। তাই তাদের এহেন কর্মকাণ্ডে তারা হত্যাযোগ্য বলে বিবেচিত।

যেসব নারী যুদ্ধে সহায়তা করে তাদের হত্যা করা যে জায়েয সে ব্যাপারে ইমাম ত্বহাবী রহ. বলেন–

وفي قتلهم دريد بن الصمة للعلة التي ذكرنا دليل على أنه لا بأس بقتل المرأة إذا كانت أيضا ذات تدبير في الحرب كالشيخ الكبير ذي الرأي في أمور الحرب

দুরাইদ ইবনে ছম্মাকে যুদ্ধে সহায়তা করার অপরাধে হত্যা করা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, যে নারী যুদ্ধে সহায়তা করবে তাকেও হত্যা করা বৈধ। তেমনিভাবে সহায়তাকারী বৃদ্ধ ও নারীর মত সহায়তাকারী না বালেগ বাচ্চাকেও হত্যা করা বৈধ। ফুক্বাহায়ে কেরাম একথা ফিক্বহের কিতাবে স্পষ্ট বলেছেন। এ বিষয়ে ছোট-বড় যে কোন কিতাব দেখা যেতে পারে।

ফায়েদা ঃ দুরাইদ ইবনে ছম্মাকে যখন হত্যা করা হয় তখন তার বয়স ছিল একশত ষাট বছর। (রমযুল হাক্বায়িক)

বিঃ দ্রঃ কারো হয়ত এ কথা মনে হতে পারে যে, বর্তমানে যেসব শহরে জিহাদী কর্মকাণ্ড চলছে যেমন- ফিলিস্তিনে আমেরিকার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে তো বৃদ্ধ, নারী ও শিশু সকলেই আক্রান্ত হচ্ছে। এ বিষয়ে আমি এ কথা আরজ করব যে, এ সময়ের তাহক্বীকের অনুযায়ী ইসলাম এমন লোক খুব কম খুজে পাওয়া যাবে চাই সে নারী হোক অথবা বৃদ্ধ হোক যে তার সাধ্যানুযায়ী ইসলামও মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহায়তা করছে না। মূলত উপরোক্ত ধারণা ভুল বোঝার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। নতুবা কাফেরদের প্রত্যেকটি সদস্য যুবক, বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ ছেলে-মেয়ে সকলেই আপন সাধ্যানুযায়ী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহায়তা করে আসছে। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকেও এই চিন্তা দান করুন। যাতে তারা সকলেই ময়দানের দিকে মনোযোগী হয় তাহলেই ইনশাআল্লাহ কাফেরদের পরাস্ত হওয়া শুধু সময়ের ব্যাপার।
১৪২২ হিজরীর ১৯ রজব রাতে ইমরতে ইসলামী আফগানিস্তানের উপর আমেরিকা কতৃক আক্রমনের পর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশ এর এক বার্তায় একথা স্পষ্ট করে বলেছিল যে, আমেরিকার প্রত্যেকটি নাগরীক যোদ্ধা/যুদ্ধবাজ/সৈনিক। (দেখুন রোজ নামায়ে আওসাফ, ২০ রজব ১৮২২ হি: ১৮ই অক্টবর ২০০১ সোমবার।
কুফ্ফারগণ যখন নিজেরাই একথার বাস্তবতা স্বীকার করছে যে, কাফেরদের প্রত্যেকটি নাগরীক যোদ্ধা/সৈনিক তখন তাদের জনসাধারণকে হত্যা করতে আর কি সন্দেহ থাকতে পারে।[১]

---

[১] (কারণ তারাতো প্রত্যেকেই সৈনিক মারাই তো কর্তব্য --অনুবাদক

সংশয় -২৭

আত্মঘাতী হামলা বা ফেদায়ী হামলা যখন কোন ষাধারণ লোলয়ে হয়ে থাকে তখন তো মুসলমানও মারা যায়। অথচ মুসলমানকে হত্যা করা ইসলামী শরীয়তে বড় কঠিন ও মারাত্মক অপরাধ।

জবাব ঃ মুসলমানকে হত্যা করা মারাত্মক গুণাহ এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে তা তখনই যখন মুসলমানকেই হত্যা করা উদ্দেশ্য হবে। কিন্তু এখানের অবস্থা ভিন্ন।

আমাদের আলোচনা এই বিষয়ে যে, আমরা শুধু কাফেরকে হত্যা করাই ইচ্ছা করি। তবে এ জন্য সাধারণ লোলয় চার্গেট করা কয়েক কারণ হতে পারে। উদাহরণত সেখানে কাফেরদের ব্যবসায়ীক কেন্দ্র হতে পারে যার মাধ্যমে তারা অর্থনৈতিক সামর্থ অর্জন করছে। অথবা উক্তস্থান জিহাদের জন্য বড়ই অনুকুলের অথবা সেখানে এমন কোন প্রভাবশালী কাফেরের উপস্থিতি যাকে হত্যা করলে অন্যদের মানসিকতা ভেঙ্গে যায় কিংবা লোকালয়ে আক্রমন করে জনসাধারণকে হুকুমতের বিরুদ্ধে ময়দানে আনা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। মোটকথা এ রকম নানান হিকমত ও উদ্দেশ্যে লোকালয়কেই আক্রমনের উত্তম যায়গা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়।

সারকথা ঃ যেখানে কাফেরদের হত্যা করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে মুসলমানকে নয়। কিন্তু মুসলমানকে হত্যা করা ব্যতীত উক্ত কাফেরকে হত্যা করাও সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে ফুক্বহায়ে কেরাম এর দিক নির্দেশনা হল মুসলমান মরা যাবে এর পরোয়া করবে না বরং আল্লাহর নামে কাজ করে যাবে।

মাসয়ালা ঃ যদি কোন দূর্গের উপর আক্রমন করা হয় অথচ তার মধ্যে কোন মুসলিম ব্যবসায়ী অথবা বন্দি রয়েছে এমতাবস্থায় দূর্গের উপর হামলা করলে মুসলিম বন্দী বা ব্যবসায়ী ও আক্রমনের শিকার হবে কিন্তু মুসলমানের হত্যার প্রতি লক্ষ্য করে পুরো

দূর্গের লোকদের ছেড়ে দেয়া তূলনামূলক অনেক ক্ষতিকর। সেহেতু বড় লাভের আশায় ছোট ক্ষতি বরদাশত করতে হবে। (হিদায়া)

মাসয়ালা ঃ কাফেরদের উপর আক্রমন করলে তারা যদি মুসলমানের সন্তানদের কে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে এই উদ্দেশ্যে যে তাদের সন্তানদের কারণে আমাদের উপর আক্রমন করবে না অথচ নিজেদের সন্তানদের হত্যা করা ব্যতীত কাফেরদের কে পারস্ত করতে করাও সম্ভব নয় সে ক্ষেত্রে মুসলমানদের সন্তানদেরকে হত্যা করতে পিছপা হওয়া যাবে না। (মুখতাছারুল কুদুরী)

মাসয়ালাা ঃ এ সকল পরিস্থিতিতে যেখানে মুসলমান হামলার শিকার হয়ে নিহত হয় সেখানে কোন দিয়ত বা জরিমানা ও ওয়জিব হবে না। কেননা দিয়ত ও অর্থদণ্ড আর জিহাদ ফরজ বিধান। আর ফরজ বিধান আদায় করলে দিয়ত ওয়াজিব হয় না।

আত্মঘাতী হামলা বিষয়ক

সংশয়-২৮

* মুজাহিদীনদের জন্যে আত্মঘাতী হামলা কিভাবে বৈধ হতে পারে অথচ আত্মহত্যা শরীয়তে হরাম?

সমাধান -

এই প্রশ্নের জবাব যদিও আমি রাওয়াল পিণ্ডির আঢয়ালা জেলে ৩০২ নং হত্যা মামলা বন্দী থাকাবস্থায় কিছুটা সংক্ষিপ্ত তার সাথে দিয়েছিলাম। কিন্তু সে বই আর প্রকাশ হয়নি মুক্তির এক বছর পর দ্বিতীয়বার বরং ছয়বার আটর হওয়য়ার পর একমাস নজরবন্দী রেখে আমাকে সারগোদা জেলে পাঠিয়ে দেয়া হল। তো আজ আবার দিলে নতুন আগ্রহ সৃষ্টি হল যে, এ বিষয়ে একটু বিস্তারিত লিখব। খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে আরছি যে, আত্মঘাতী হমলার বিষয়ে আপত্তি উত্থাপনকারীরা নিম্নোক্ত আপত্তি তুলে ধরে যার পর্যালোচনা ও উত্তর সহ লিখছি:

১. এটা আত্মহত্যা। এর জবাব হল এটা আত্মহত্যা নয় বরং এটা কুফুর হত্যা। কেননা যারা এই হামলা সম্পাদন করে তারা জানে যে, এটা নিজের প্রাণ বিসর্জন নয় বরং কুফুরের প্রাণ নাশ করার জন্য করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য একটাই থাকে যে, যে টার্গেট ও লক্ষ্য পর্যন্ত শত্রুরা ও পৌছতে পারে না এই চুড়ান্ত অপারেশন দ্বারা পৌছা যায়। ভিন্ন আঙ্গিকে এটা বলতে পার যে, এটা শরীয়তে নিষিদ্ধ নয় যাকে হরাম করা হয়েছে, যার উপরে কঠিন থেকে কঠিনতর ধমকি এসেছে। বরং এটা হল আত্মবিসর্জন অর্থাৎ মানুষের কাছে সবথেকে প্রিয় বস্তু নিজের প্রাণকে আল্লাহ তায়লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দ্বীনের জন্য উৎসর্গ করে দেয়া। এ আমল নিন্দনীয় নয় বরং প্রশংসনীয়।
   প্রাণ যদি যায় প্রাণ হরণে

শত্রুতা নয় প্রেম যে বাড়ে

নয়তো ইহা আত্মঘাতী কাফের নিধন হয় যাহাতে

ধ্বংস তো নয় ভাগ্য ইহা জ্ঞাণীজনই যায় তাহাতে।

২. জিহাদের জন্য যেমন যিনা, মদপান কখনই হালাল হয়না যদিও এর দ্বারা জিহাদের অতুলনীয় উপকার হোক না কেন তেমনি আত্মঘাতী হামলাও কোন অবস্থায় জায়েয নয় যদিও এর দ্বারা প্রভূত উপকার লাভ হোক না কেন।

সমাধান -১

এই ধরণের আপত্তি তারাই উত্থাপন করে যারা আত্মহত্যা ও আত্মঘাতী হামলা বা ফেদায়ী হামলার মাঝে পার্থক্য করতে পারে না। কেননা আত্মহত্যা ও আত্মঘাতী হামলার মাঝে এতটা পার্থক্য যতটা পার্থক্য মৃত ব্যক্তির দুর্গন্ধময় শরীর ও শহীদের মোবারক ও পবিত্র দেহের মাঝে। আত্মহত্যাকারী নিজের জীবনের প্রতি সংকীর্ণ মানসিকতা, আল্লাহ হায়লার প্রতি অসন্তুষ্টি এবং আল্লাহ হায়লার রহমতের থেকে নিরাশ হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে কুফুরীর প্রাণনাশ ও ফেদায়ী হামলা করে প্রাণোৎসর্গাকারী ব্যক্তি শাহাদাতের পাগল হয়, আল্লাহ তায়ালার দীদারের প্রতি আগ্রহী হয়, আর আল্লাহ হায়লার রহমতের প্রত্যাশী হয়। ২. দ্বিতীয়ত ঃ যিনা, মদপান ও হত্যার মাঝে অনেক বড় পার্থক্য বিদ্যমান। আর তা হল যিনা না মুসলমান মেয়ের সাথে বৈধ না কাফেঅর মহিলার সাথে। তেমনি মদ না মুসলমানের জন্য বৈধ আর না কাফেরের জন্য। পাক্ষান্তরে মুসলমানকে হত্যা করা অবৈধ ঠিকই কিন্তু কাফেরকে হত্যা করা শুধু জায়েযই নয় বরং অনেক বড় ইবাদত। সুতরাং এতদুভয়ের মাঝে এত বড় পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও হত্যাকে মদ-যিনার সাথে তুলনা করা যার পর নাই নির্বুদ্ধিতাও মূর্খতা। আল্লাহ তায়লা এই পার্থক্য বুঝার তৌফিক দান করুন। আমীন..............

৩. আত্মঘাতী ও ফোদায়ী হামলায় অনেক নিরপরাধ ব্যক্তি ও মারা যায়। জবাব ১. কাফের ইহুদী হোক বা খৃষ্টান হোক কিংবা হিন্দু হোক সকলেই সমষ্টিগত ভাবে অপরাধী, কেউই নিরপরাধ নয়। বরং এখনতো তাদের মহিলাদেরকেও তাদের অপারাধের অংশীদার রূপে দেখতে পাই। সেহেতু কেউ সরাসরি অপরাধী আর কেউ অপরাধীর সাহায্যকারী নিরপরাধ কেউই নেই। ২. দ্বিতীয়ত এ ধরণের কাজে শুধু মূল লক্ষ্যই ধর্তব্য হয়। আনুসাঙ্গিক বিষয়ে ধর্তব্য নয়। আর ফেদায়ী হামলায় টার্গেট হয় রাঘব বোয়ালকে খতম করা অথবা ওদের বানিজ্যিক স্টেশনকে ধ্বংশ করা। যদি এতে অন্যান্য কিছু এর অনুগামী হয়ে যায়। সেগুলিও এক সাথে ধ্বংশ হয়। তবে এতে ক্ষতি কিসের? ১০ ই রমজানুল মোবারক ১৪২৪ হিজরী মোতাবেক ৬ই নভেম্বর ২০০৩ ইং, সিকিউরিটি ওয়ার্ল্ড, ডিসট্রিক্ট জেল সারগোদা।

আত্মঘাতী হামলা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কুরআনে কারীম থেকে ইস্তিদলাল:

সুবিন্যস্ত বইয়ের চাহিদা তো কুরআনে কারীমের দলীলকে প্রথমে আনা। কিন্তু এই দলীল সর্বশেষে আমার হাতে পৌছার কারণে আলোচনার শেষেই তা উল্লেখ করলাম। যা হয়েছিল। পহেলা রমজান ১৪২৫ হিজরী শুক্রবার পাথরমণ্ডি জেলা গুজরনেওয়ালাতে তাফসীরুল কুরআন মাহফিলে জিহাদের বিষয়ে সবক প্রদানের জন্য আসলে ছাত্ররা আমাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করল। আমি আমার ইলমী যোগ্যতা অনুযায়ী তার ইত্তর দেয়ার চেষ্টা করলাম। ফিরে আসার পথে আমাদের গ্রাম ৮৭ দক্ষিণ জেলা সারগোদার মসজিদে গেলাম। সেখানে শাইখুত তাফসীর মাওলানা মুনীর আহমাদ সাহেব দা.বা. আরেকটি বাৎসরিক তাফসীরুল কুরআন অনুষ্ঠানে দরস দিচ্ছিলেন। হযরতের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আমার দরসের প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কে তাকে অবহিত করলাম। হযরত বিশেষ ভাবে আত্মঘাতী হামলা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে আমি কি দলিল দিয়েছি তা জানতে চাইলেন। আমি সংক্ষিপ্ত আকারে দু'একটি দলীল বললাম। তখন

হযরত বললেন আমি তো আত্মঘাতী হামলা বৈধ হওয়ার জন্য কুরআনে কারীমের এই আয়াত দলীল দিয়ে থাকি-

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ (سورة الأنفال-60)

(হে মুসলমানগন!) তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-ছাউনি প্রস্তুত কর, যা দ্বারা তোমরা আল্লাহর শত্রু ও নিজেদের (বর্তমান) শত্রুদের সন্ত্রস্ত করে রাখবে। সূরা আনফাল-৬০

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সে সকল হাতিয়ার প্রস্তুত করতে বলেছেন যাকে শত্রুরা ভয় করে এবং তাদের অন্তরে এতে ভীতির সঞ্চার হবে। বাস্তবতা হল এই যুগে আত্মঘাতী হামলাকে কাফেররা যেরূপ ভয় করে সম্ভবত আর কোন কিছুকে এতটা ভয় করে না। সুতরাং আত্মঘাতী হামলা শত্রুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করা কুআনের আয়াত দ্বারা প্রমানিত।

লক্ষ্যণীয়ঃ ত্বলাবাও উলামাদের বলব আত্মঘাতী হামলার বৈধতা কুরআন থেকে দালালাতুননস্ হিসেবে প্রমাণিত।

সংশয় -২৯

নবীজী সা. এর পবিত্র সত্তার উপর এই অভিযোগ আরোপ করা হয় যে, তিনি কখনও কোন কাফেরকে হত্যা করেন নি। শুধু কাফেরদের কে দাওয়াত দিয়ে মুসলমান বানিয়েছেন যাতে সকল কাফের জান্নাতে যেতে পারে।

সমাধান-

ইসলামী শরীয়তে কতেক এমন বিষয় রয়েছে যা নবীজী কখনও করেন নি কিন্তু তাতে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং সাহাবীদেরকে তা করার আদেশ দিয়েছেন যেমন আযান, ইক্বামাত। এগুলিও নবীজীর সুন্নাত। যদিও নবীজী নিজে কখনও তা করেন নি। অন্যকথায় শরীয়তের কিছু আমল ফে'লী বা কাজের দ্বারা প্রমাণিত আর কিছু ক্বওলী বা কথার দ্বারা প্রমাণিত। উভয়ের দ্বারা প্রমাণিত। উভয়টির বিস্তারিত আলোচনা নিচে লক্ষ্য করুন।

কাফেরদের হত্যা করার প্রতি উৎসাহ প্রদান ও সুসংবাদ দান

নবীজী কাফেরদের হত্যা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং এতে জান্নাতের সুসংবাদ ও দিয়েছেন হযরত আবু হুরায়রা রা. নবীজী সা. থেকে বর্ণনা করেছেন,

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام واضربوا الهام تورثوا الجنان.

– جامع الترمذى :7/2 باب ما جاء في فضل إطعام الطعام . رقم الحديث:1848 – كنز العمال: 25251 – مشكاة : 332 كتاب الجهاد – الفصل الثانى. أخرجه

البخارى ومسلم عن أبى كريب عن أبى أسامة ، – مسلم :باب من فضائل أبي موسى وأبى عامر 303/2 ، – صحيح البخارى باب غزوة أوطاس 219/2 ،

সালামের প্রসার ঘটাও খাবার খাওয়াও, কাফেরের মাথার খুলি উড়িয়ে দাও, তাহলে জান্নাতের উত্তরাধিকারী হবে।

ধৈর্য-ক্ষমা যথাস্থানে ছিল নবীজীর শান

তাই বলে কি যুদ্ধে যেতে করেন নি আহ্বান?

তার জীবনে কাফের হত্যা নয় কি প্রমাণিত

রণাঙ্গনে করেন নি কি সেনা সুসজ্জিত?

কাফের হত্যার উপর নবীজীর আনন্দ প্রকাশ

বদরের যুদ্ধে আবু জাহলের হত্যার পর নবীজী উচ্চস্বরে তাকবীর ধ্বনী দেন এবং শুকরিয়ার সিজদা আদায় করেন। কোন কোন বর্ণনায় নবীজী শুকরিয়া স্বরূপ দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় করেন। নবীজীর প্রতি বেয়াদবীপূর্ণ আচরণকারী ইসমা নামক ইহুদী নারীকে হযরত উমাইর ইবনে আদী রা. হত্যা করলে নবীজী এরশাদ করেন:

"إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب فانظروا إلى عمير بن عدي" الصارم المسلول على شاتم الرسول لإبن تيمية رح 94/3

যদি কেউ এমন ব্যক্তিকে দেখতে চাও যে, আল্লাহ ও তার রাসূলকে সাহায্য করেছে তবে উমাইর ইবনে আদীকে দেখ।

একবার হযরত উমাইর বিন আদী রা. অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন নবীজী এরশাদ করলেন:

انطلقوا بنا إلى البصير الذي في بني واقف نعوده الإصابة في تمييز الصحابة 722/3

তোমরা আমাকে বনী ওয়াকেফের চক্ষুস্মান ব্যক্তির নিকট নিয়ে চল তাকে দেখে আসি। দেখুন নবীজী তাকে সুস্থ, চক্ষুস্মান বললেন অথচ উক্ত সাহাবী অন্ধ ছিলেন। কেননা তিনি অন্তর দিয়ে সত্যকে দেখেছিলেন অথচ এটা বলতে হবে যে, তিনি চক্ষস্মান ব্যক্তির ন্যায় কাজ সম্পাদন করেছেন।

কাফের হত্যার বিনিময়ে পুরুস্কার

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রা. যখন নবীজীর শত্রু খালেদ বিন সুফিয়ান কে হত্যা করে অভিশপ্তটির মাথাটি দরবারে উপস্থিত করলেন তখন নবীজী সা. পুরুস্কার স্বরূপ তাকে একটি লাঠি প্রদান করে বলেন: تخصر به في الجنة فإن المتخصرين في الجنة قليل – البداية والنهاية এই লাঠি নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর। কেননা লাঠি নিয়ে জান্নাতে প্রবেশকারীর সংখ্যা খুবই কম। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রা. আমৃত্যু উক্ত লাঠিটি সংরক্ষণ করেন এবং মৃত্যুর সময় ওসিয়ত করেন যে, উহা যেন তার কাফনের ভিতরে দিয়ে দেয়া হয়। পরবর্তীতে তাই করা হয়েছিল।

নবীজী সা. আপন হাত মোবারক দ্বারা কাফেরকে হত্যা করেছেন।

উবাই বিন খলফ একটি ঘোড়া লালন পালন করে, খাবার খাইয়ে খুব মোটাতাজা করে এবং বলে এতে আরোহন করে আমি মুহাম্মাদ সা. কে হত্যা করব। যখন নবীজীর নকট এ সংবাদ পৌছল তখন নবীজী বললেন ইনশাআল্লাহ আমিই তাকে হত্যা করব। উহুদ যুদ্ধে সে যখন নবীজীর দিকে অগ্রসর হতে লাগলো তখন সাহাবায়ে কেরাম অনুমতি প্রার্থনা করলেন যে, তাকে খতম করে দিবে। নবীজী বললেন ওকে কাছে আসতে দাও। যখন কাছে আসল নবীজী হযরত হারিস বিন সামিয়্যা রা. থেকে একটি বর্শা নিয়ে ওর গর্দানের উপর মারলেন। এতে তার মৃদু আচড় লগল এবং সে চিল্লাতে চিল্লাতে ফিরে এসে বলল- খোদার কসম মুহাম্মাদ সা. আমাকে মেরে ফেলেছে। লোকেরা তার আত্মমর্যাদা স্মরণ করে দিয়ে বলল- এই সাধারণ আঘাতে

ষাড়ের মত চিল্লাচ্ছো। সে বলল এটা মুহাম্মাদের আঘাত। সে তো মক্কায়ই বলেছিল - আমি তাকে হত্যা করবো। খোদার কছম ! যদি সে আমার প্রতি থু থুও নিক্ষেপ করত তাতেও আমি মারা যেতাম। যদি এই আঘাতের ব্যথা সমস্ত মক্কাবাসীকে ভাগ করে দেয় হত তবে তাদের ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট হত। সে এই অবস্থায় সারিফ নামক স্থানে মারা যায় এবং নবীজীর মোবারক হাতে মরে জাহান্নামে চলে গেল। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া)

এ জন্য হে গেদু!!!! আল্লাহকে ভয় করো। নবীজীর মত মহাবীর পুরুষ এর উপর অভিযোগ কর না। বরং নিজের আত্মার ভীরুতাও কাপুরুষতার চিকিৎসা কর। বিবেক দিয়ে কাজ কর। দ্বীন বুঝার চেষ্টা কর। আল্লাহ তায়ালা আমাদের কে দ্বীন বুঝার তৌফিক দান করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

সংশয় -৩০

কাফেরদেরকে হত্যা করা তো দুরের কথা নবীজী সা. কখনও কাফেরকে বদ দোয়াও করেন নি। বরং তায়েফের দাওয়াতী সফরে যখন কাফেরা নবীজীকে পাথর মেরে শরীর মোবারক থেকে রক্ত প্রবাহিত করল তখন হযরত জিবরীল আ: উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন- আল্লাহ তায়ালা কওমের সাথে কৃত আপনার দাওয়াত ও তাদের জবাব শুনেছেন। বেং এক ফেরেশতা পাঠিয়েছেন যিনি পাহাড়ে নিযুক্ত থাকেন। আপনি যা ইচ্ছা তাকে আদেশ করুন। উক্ত ফেরেস্তা উপস্থিত হয়ে সালাম পেশ করে বললেন- যা আদেশ করবেন তা সম্পাদন করব। যদি আদেশ হয় তবে উভয় পাহাড়কে একত্র করে ফেলব। যাতে মাঝের সবাই পিষ্ঠ হয়ে যাবে। অথবা আপনি যা বলেন। নবীজী কোমল স্বত্তা উত্তর দিলেন- আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে এই দু'আ করি যে, তারা যদি ঈমান নাও আনে তবে তাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে এমন লোক জন্মগ্রহণ করবে যারা আল্লাহ তায়ালার ইবাদাত করবে।

সমাধান -

এ ধরনের কথাবার্তা বলা মূলত দ্বীনে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা, নবীজী সীরাত থেকে দুরত্ব ও অনির্ভরতা এবং কাফেরদের মুহাব্বতের কারনেই হয়ে থাকে। একথা অনস্বীকার্য যে, নবীজী অসংখ্য স্থানে কাফেরদের কষ্ট সহ্য করেও তাদের বিরুদ্ধে বদ দো'আ করেন নি। কিন্তু এক কথাও সঠিক যে, নবীজী অনেক স্থানে বদ দো'আ করেছেন। কোথাও কাফেরদের নাম নিয়ে আবার কখনও নাম ছাড়া। ১. নবীজী সা. এর বড় মেয়ে হযরত রুকাইয়া রা. আবু লাহাবের ছেলে উতবা ও ছোট মেয়ে উম্মে কুলছুম রা. আবু লাহাবের ছেলে উতাইবা এর বিবাহে আবদ্ধ ছিলেন। যখন সূরা

লাহাব অবতীর্ণ হল তখন আবু লাহাব কসম খেয়ে বলল- যতক্ষন না তোমরা মুহাম্মাদের মেয়েদের কে না ছাড়বে ততক্ষ আমি তোমাদের সাথে কথা বলব না। তখন তারা উভয়কে তালাক দিয়ে দিল। কিন্তু হযরত উম্মে কুলছুম রা. এর স্বামী উতাইবা তালাকের সাথে সাথে নবীজীর শানে কদর্যপূর্ণ কথাবার্তা বলল। তখন নবীজী উতাইবার উপর বদ দু'আ করলেন "হে আল্লাহ ! আপনার কুকুরের মধ্য থেকে একটি কুকুর ওর উপর ন্যাস্ত করে দাও" পরবর্তিতে এই খবীস এ বদ দু'আয়াই ধ্বংস হয়েছে। (বিস্তারিত দেখুন- উসদুল গাবাহ)

২. চতুর্থ হিজরীর শাওয়াল মাসে খন্দকের যুদ্ধে ব্যস্ততার কারণে যখন নবীজীর আসরের নামাজ কাজা হয়ে গেল। তখন হযরত আলী রা. বলেন নবীজী কাফেরদের উপর বদ দু'আ করলেন-

عن علي رضي الله عنه قال : لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس) [3885 ، 4259 ، 6033]

- صحيح البخارى: 410/1 باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة . رقم الحديث:2931 - سنن إبن ماجة. 51 باب المحافظة على صلاة العصر.

হে আল্লাহ ! কাফেরদের কবরও ঘরকে আগুন দ্বারা ভরে দাও। ওরা আমাদেরকে আসরের নামাজ থেকে বিরত রেখেছে।

৩. চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে হযরত মুনযির ইবনে আমর কে সত্তর সাহাবী সহ রআল, যাকওয়ান এর দিকে দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য প্রেরণ করেন। কাফেররা ঐ সত্তরজন সাহাবীকে যারা আসহাবে সুফফা ও কুরআনের হাফেজও ছিলেন- শহীদ করে দিল। শুধু এক সাহাবী উমার ইবনে আমীর বেচে গিয়েছিলেন। নবীজী উক্ত কাফেরদের উপর যার পর নাই অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত হলেন এবং ধারাবাহিক ভাবে এক মাস ফজরের নামাজে ওদের উপর কুনুতে নাযেলা পড়ে বদ দুআ করলেন।

৪. নবম হিজরীর পহেলা সফর নবীজী হযরত আব্দুল্লাহ বিন আওয়াসা রা. কে কতিপয় সাহাবীসহ বনু হারিসার প্রতি প্রেরণ করলেন। কিন্তু বনু হারিসা ইসলাম কবুল করল না নবীজী তাদের উপর বদ দু'আ করলেন- তাদের বুদ্ধি যেন অকার্যকর হয়ে যায়। আজও পর্যন্ত। অনেক ঘটনা রয়েছে যা সীরাতের কিতাব সমূহে বিদ্যমান বরং সাহাবীদের থেকে বর্ণনা আছে যে, তারা কাফেরদের উপর বদ দু'আ করেছেন, এমনকি যে সকল মুসলমান তাদেরক কষ্ট দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করেছেন আর আল্লাহ তায়ালা তা কবুলও করেছেন।

ধৈর্য দয়ার প্রতীক নবী নেই কোন সংশয়
নিজের কষ্টে ওঠেনি কভু বদ দোয়ার হস্তদ্বয়,
তথাপি তিনি বাহাদুর ছিলেন কাফেরের মোকাবেলায়
প্রত্যয়ে কভু ভাটা পড়েনি বিপদে বা বিভিষিকায়,
অভিশাপও কভু দিয়েছেন তাই ফিৎনাবাজদের তরে
কেদেছেন যবে প্রভুর দরবারে বিজয় যাচনা করে।

যেমন হযরত উসমান রা. এর বদ দু'আ মুহাম্মাদ ইবনে আবু বাকর এর ক্ষেত্রে এবং সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা এর বদ দু'আ সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে যে কুফায় গভর্ণর থাকাকালে তার উপর অভিযোগ উত্থাপন করেছিল। এগুলি দীর্ঘ আলোচনার চাহিদা রাখে, সংক্ষেপনের উদ্দেশ্যে তা উল্লেখ করলাম না। আল্লাহ তায়ালা আমাদের কে সঠিক বুঝ ও পরিপূর্ণ দ্বীন বুঝার তৌফিক দান করুন। আমীন।

সংশয় -৩১

অনেক লোক আছেন যারা দ্বীনের অন্যান্য কাজের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু কাপুরষতা, ভগ্ন মনোবল হিম্মতের অভাব ও মৃত্যুর ভয়ে জিহাদে যায় না। তারা এই ফিৎনা ফিৎনা সৃষ্টি কারী কথা বলে থাকে যে, বাই এখন সাহাবাদের মত জিহাদ হয় না তাই আমরা জিহাদ করি না।

সমাধান -

এই স্বল্পবুদ্ধি ও বিকৃত দেমাগের অধিকারী ব্যক্তিদেরকে কে জিজ্ঞাসা করবে যে, আমাদের অন্যান্য সকল আমলের অবস্থা কি সাহাবাদের মত? আমাদের নামাজ, আমাদের রোজা, আমাদের হজ্ব, আমাদের যাকাত, আমাদের সদ্‌কা ও অন্যান্য সকল আমল কি সাহাবায়ে কেরামের আমলের ন্যায়? এর অর্থ কি এই যে, আমরার যাবতীয় সব আমল এজন্য ছেড়ে দেব যে, এগুলি সাহাবাদের আমলের মত নয়? আমাদের বিবাহ কি সাহাবাদের বিবাহের ন্যায় হয়ে থাকে? তবে কি ইন্ডিয়ার প্রধানমন্ত্রী বাপপেয়ীর মত চিরকুমার হয়ে জীবন কাটিয়ে দেব? আমাদরে জানাযা কি সাহাবয়ে কেরামের জানাযার মত হয়? তবে কি মুর্দারদের কে জানাযা ব্যাতিত দাফন করে দেব? আমাদের খাওয়া-দাওয়া সাহাবাদের খাওয়া দাওয়ার মত নয়। সুতরাং পেটকে নিয়ন্ত্রন কর, (এই কথা কেউ বলবে?) আমাদের পোষাক পরিচ্ছেদ সাহাবাদের মত নয় এর অর্থ এই নয় যে, এগুলি পরিত্যাগ কর। মোট কথা জীবনে কোন আমল কাছে যা সাহাবায়ে কেরামের আমলের ন্যায়? তাহলে তো সকল আমলে ছেড়ে দিয়ে হাতের পরে হাত রেখে বসে থাকতে হবে। (বসাটাও সাহাবাদের মত নয় সেহেতু বসে থাকাও যাবে না এখন কি করবেন আপনি বলুন-প্রিয় পাঠক) (অনুবাদক)

দাওয়াত তাবলীগের কাজও ছেড়ে দিন। কেননা আমাদের এই দাওয়াত ও তাবলীগ সাহাবাদের দাওয়াত ও তাবলীগের মত নয়। প্রকৃতপক্ষে তাদের দাওয়াত ছিল কাফের প্রতি ঈমান আনার জন্য। আর আমরা দাওয়াত দিই মুসলমানকে আমল ঠিক করার জন্য। উপরন্তু সে পর্যায়ের ইখলাসও অনুপস্থিত। তালীম ও তাদরীসকেও বন্ধ করে দাও। দ্বীন শেখার বিষয়টিকেও অস্বীকার কর। কেননা আমাদের মাদ্রাসা সমূহ সুফফার মাদ্রাসার মত নয়। মসজিদ সমূহ কে ভেঙ্গে ফেল। কেননা ইহাকে সাহাবায়ে কেরামের মত ইখলাসের সাথে নির্মাণ করা হয়নি। বরং ঈমানকেই অস্বীকার কর। কেননা আমাদের ঈমানে যতই শক্তি সঞ্চারিত হোক না কখনই সাহাবাদের ঈমানের মত হতে পারবে না। নাউযুবিল্লাহ। একটি মাত্র বাক্য দ্বীনের ভিত্তিকে ধ্বংশ করে ছেড়েছে। এ কথা বোধগম্য নয় যে, দ্বীনের কাজ করা জরুরী অথচ তা সাহাবাদের আমলের মত নয় । আর জিহাদ এর বিপরীত।

আছে কি সেই পূর্বসূরীদের জিক্‌র ও তেলাওয়াত

আছে কি সেই সাহাবাদের আত্মনিমগ্ন সালাত

তবু কেন এই বাহানা যা শুধু জিহাদের পথে

অথচ ত্যাগের সাথে কোন মিল নেই পূবসূরীদের সাথে।

প্রকৃত কারণ সুস্পষ্ট। অন্তরে নেফাক্ব রয়েছে। জিহাদ করে না এজন্য যে, মৃত্যুকে ভয় করে। এ জন্য আমার বন্ধুগণের প্রতি আমার মাশওয়ারা হল দয়া করে আপনি একটু ময়দানে শরীক হোন, যদিও মন না চায় । ইনশাআল্লাহ ঈমান ও তৈরী হবে, আমল ও সহীহ তবে, এবং আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাতের আগ্রহে মৃত্যুর মুহাব্বতও সৃষ্টি হবে। এক-আধ ফোটা রক্ত বের হওয়ার দ্বারা মস্তিষ্কও সঠিক ও পরিষ্কার হবে।

বিঃ দ্রঃ

শরীয়তের বিধানাবলী সমূহ দুই ভাগে বিভক্ত। পরিমান ও ধরণ। পরিমান অর্থাৎ নামাজ কয়বার ফরজ, প্রত্যেক নামাজ কয় রাকাত বিশিষ্ট, নামাজের ফরজ কয়টি, ওয়াজিব কয়টি, সুন্নত কয়টি, মুস্তাহাব কয়টি। ওজুর ফরজ, সুন্নাত, মুস্তাহাব ইত্যাদি। এমনিভাবে রোজা, হজ্ব, যাকাত এর পরিমাণ চিন্তা করুন। দ্বিতীয় বিষয় হল

ধরণ বা প্রকৃতি । অর্থাৎ ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাত কতটুকু। সকল আমলে যার সর্বোচ্চ স্তর। হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে-

حديث جبريل:......: أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنَّكَ إِنْ لا تَكُنْ تَرَاهُ ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ ،
- صحيح البخارى: 12/1 باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه و سلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة . رقم الحديث:50 - صحيح مسلم: 27/1باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى - مسند أحمد : 317/1 رقم الحديث: 367

আল্লাহ তায়ালার ইবাদাত এভাবে কর যে, তুমি তাকে দেখতেছ। আর এ স্তরে পৌছতে না পারলে (কমপক্ষে) এতটুকু ধ্যাণ কর যে, তিনি আমাকে দেখছেন। এই গুণগত মান অতি দ্রুত হাসিল হয় না। এর জন্য পরিপূর্ণ ওলী এর সাহচর্য ও সুদীর্ঘ মোজাহাদা- অর্থাৎ নামাজের সময় অন্তরে আল্লাহর স্বরণ নিয়ে নামাজ পড়া শর্ত। এই স্তর নবীজীর সাহচর্যে সাহাবারা যেমন পেয়েছিলেন পরবর্তীরা তা কোথায় পাবে। এজন্য নবীজী সা. এর এরশাদ - আমার সাহাবীরা যদি এক মুঠো যব দান করে আর পরবর্তীরা উহুদ পাহাড় সমান সোনা দান করে তবু তাদের সমান হতে পারবে না। এটা কি? এটা এখলাস ও গুণ। সাহাবায়ে কেরামের থেকে আসা আমলের মধ্যে আমরা পরিমানের মুকাল্লাফ। অর্থাৎ রাকাআত এর সংখ্যায় কমবেশী করা যাবে না। কিন্তু গুণগত মানে উন্নিত হওয়ার মুকাল্লাফ নাই। আর সে স্তর অর্জন সম্ভবও নয়। অন্যান্য সকল ইবাদাতের ন্যায় জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এর অবস্থাও অভিন্ন। আমরা এ বিষয়ে আদিষ্ট যে, জিহাদের শর্তাবলীর প্রতি লক্ষ্য রেখে কাফেরদের খুলি উড়িয়ে দিব। কোন মুসলমানের উপর হাত উঠাবো না। কিন্তু এক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম যেমন ইখলাসের সাথে কাজ করেছেন সে স্তরের ইখলাস অর্জন সম্ভবই নয় । যখন সম্ভবই নয় তখন তার আদিষ্টও নই। সুতরাং এ বিষয়ে আপত্তি তোলা অনর্থক ও বেহুদা কাজ। এটাই হল নবীজীর এরশাদের রহস্য- হে আমার সাহাবাগণ! তোমরা যদি দ্বীনের একশ ভাগের দশভাগ কাজ ছেড়ে দাও আর পরবর্তীতে আগতরা যদি

নব্বই শতাংশ ছেড়ে দিয়ে দশভাগের উপর আমল করে তবে তারা সফল হবে।কেননা তোমরা আমাকে (প্রতক্ষ্যভাবে) দেখে ঈমান এনেছ। আর তারা আমাকে না দেখে ঈমান এনেছে। (ইহয়াউ উলুমিদ্দিন)

সংশয় -৩২

.... কাফেরদের কে খারাপ বলা যাবে না, তাদের কে পশুর নামে ডাকা যাবে না। যেমন কুকুর, শুকর ইত্যাদি বলা যাবে না। কেননা কাফের হলেও তারা মানুষতো। মানষকে তার স্বত্তার প্রতি লক্ষ্য করে অপদস্ত করা ঠিক নয়। তাদের কে কাফের বলাও যাবে না এবং গলি ও দেয়া যাবে না। কেননা কুরআনে কারীমে এরশাদ হয়েছে:

وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ (سورة الأنعام-108)

অর্থ: (হে মুসলিমগন!) তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে (ভ্রান্ত মাবুদদেরকে) ডাকে, তোমরা তাদেরকে গালমন্দ করো না। কেননা পরিনামে তার অজ্ঞাতবশত সীমালংঘন করে আল্লাহকেও গালমন্দ করবে। বরং তার সাথে নরম ভাষায় এবং উত্তম চরিত্রের সাথে কথা-বার্তা বলা উচিত। যেমন আল্লাহ তায়ালা যখন হযরত মূসা আ. কে ফেরআউনের কাছে পাঠালেন তখন আদেশ করলেন:

فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً (سورة طه-44)

অর্থাৎ তোমরা তার সাথে নরম ভাষায় কথা বলবে - (সূরা ত্বহা-৪৪) অথচ মুজাহীনে কেরাম এ সকল বিষয়ের বিপরীত আমল করেন। (এটা কেন?)

সমাধান -১

আসুন আমরা সর্বপ্রথম কুরআনে কারীমের (হিকমতপূর্ণ) শব্দের প্রতি একটু চিন্তা করি যে, কুরআন কাফেরও মুশরিকদের কে কোন শব্দে স্বরণ করেছে তাতে বিষয়টি বুঝতে সহজ হয়।

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ (سورة البقرة-18)

এরা বধির, বোবা, অন্ধ। (সূরা বাক্বারা-১৮)

তাহলে কি এ সকল কাফেদের বাকশক্তি, কান ও চক্ষু সচল ছিল না? না, না। সচল অবশ্যই ছিল। কিন্তু এর উদ্দেশ্য হল তাদের চোখ, কান ও জিহ্বা তো ঠিকাই ছিল কিন্তু তারা এগুলিকে শুধু এই ধ্বংশশীল দুনিয়ার জীবন-যাপনের জন্য ব্যবহার করতে। আখেরাতের কাজে ব্যবহার করত না। সেহেতু তারা বধির, অন্ধও বোবার সমতুল্য। তাদের এই চোখ,কান ও জিহ্বা দ্বারা কি ফায়েদা আছে ? ২.

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ (سورة الأعراف-176)

তার উদাহরণ হল কুকুরের মত।(সূরা-আরাফ- ৭৬)

বালআম ইবনে বাউরা ইসরাঈলী আবেদ ছিল। সে এক মহিলার চক্রে গোমরাহ হয়ে যায়। হযরত মূসা আ. এর প্রতিপক্ষ হিসেবে অবতীর্ণ হলে আল্লাহ তার সম্পর্কে বলেন "তার অবস্থা কুকুরের ন্যায়-সব সময়"

৩.

إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ ...(سورة النمل-80)

আপনি মৃত ও বধিরদেরকে আহ্বান শোনাতে পারবেন না। (সূরা-নামল- ৮০) এই আয়াতে কারীমায় কাফেরদেরকে মৃত বলা হয়েছে। অথচ তারা জীবিত। উদ্দেশ্য হল মৃত ব্যক্তি যেমন শুনে কোন ফায়েদা হাছিল করতে পারে না তাদের অবস্থা অনুরূপ।

৪.

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً (سورة الجمعة-5)

যাদের উপর তাওরাতের ভার অর্পণ করা হয়েছিল, অত:পর তারা সে ভার বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত হল গাধা, যে বহু কিতাব বয়ে রেখেছে।। (সূরা জুমু'আ-৫)

৫.

كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ (سورة المدثر-50)

ঐ সকল মুশরিক (সত্যের সিংহের আওয়াজে ভয় পেয়ে) পালায়নরত গাধার ন্যায়।
৬.উপরন্তু আল্লাহ তায়ালা কুরআনে কারীমে কাফেরও মুশরিকদের ব্যাপারে একটি মূলনীতি বলে দিয়েছেন ......

.أُوْلَـئِكَ كَـالأَنْـعَـامِ بَـلْ هُمْ أَضَلُّ (سورة الأعراف-179)

অর্থাৎ ঐ সকল কাফের জানোয়ার ও চতুষ্পদ প্রাণীর ন্যায়। বরং উহার থেকেও নিকৃষ্ট। (অথচ পশুদের মধ্যে কুকুর, শুকর, শিয়ালও রয়েছে।) এখন একটু চিন্তা করুন, কুরআনে কারীম কাফেরদের ব্যাপারে কি রূপ শব্দ ও উপধি ব্যবহার করেছেন সুতরাং কোন নির্বোধ কাফেকে গাধা বলা, চতুর কাফেরকে শিয়াল বলা অথবা চরিত্রহীন কাফেরকে শুকর বলা কোন ধরণের কাফেরদের লাঞ্ছনা। মানুষের সম্মান তো তখনই থাকে যখন সে মানুষ থাকে, নতুবা সে পশুর থেকেও নিকৃষ্ট হয়ে যায়। মানুষ মানুষ হয় ঈমানের বদৌলতে। যদি ঈমান না থাকে তবে মানুষের থেকে পশু শতগুণ উত্তম।

পরিস্কার দেখে নাও হে নেফাক্বের কীটগুলো
কাফেরদের লাঞ্চনা দেখতে যাদের লাগে না ভালো
চতুষ্পদ যন্তু অভিধায় ভূষিত করলেন যাদের প্রভূ
সেই হতভাগাদের তোষামোদ সুখকর নয় যে কভূ।

সমাধান-২

মুল্লা জিউন রহ. তাফসীরাতে আহমাদিয়াতে লেখেন- وَلا تَـسُبُّـوا الَّـذِيـنَ يَـدْعُونَ مِـنْ دُونِ ّاللهِ فَـيَـسُبُّـوا ّاللهَ عَدْواً بِـغَـيْـرِ عِلْمٍ (سورة الأنـعـام-108)। এই আয়াত সূরা হজ্জ এর ৭৩ নং আয়াত ضَعُفَ الـطَّـالِـبُ وَالْـمَطْلُـوبُ এর দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। যার অর্থ : অন্বেষনকারী (মুশরিক) ও যার কাছে অন্বেষ করা (দেবতা) দূর্বল। এবং এই আয়াত দিয়েও মানসূখ হয়ে গেছে إِنَّـكُمْ وَمَـا تَـعْبُدُونَ مِـنْ دُونِ ّاللهِ حَصَبُ جَـهَـنَّمَ (সূরা হজ্জ-৯৮) নিশ্চই তোমরা (মুশরিক) এবং যাদের ইবাদত কর (দেবতা) সকলেই জাহান্নামের ইন্ধন।

সমাধান-৩

এখন আসুন আমরা হাদীস শরীফের প্রতি একটু নজর দেই। কাফেরদের সম্পর্কে নবীজী কি এরশাদ করেছেন-

عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم "
- سنن أبي داؤود : 339/1 باب كراهية ترك الغزو. رقم الحديث: 2504 - سنن النسائى : 43/2 بَاب وُجُوبِ الْجِهَادِ

হযরত আনাস রা. বলেন নবীজী এরশাদ করেন তোমরা মুশরিকদের সাথে তোমাদের সম্পদ, জান ও জিহ্বা দ্বারা জিহাদ কর। জিহাব বিল লিসান এর যেসব পদ্ধতি "লামায়াত" এর গ্রন্থাকার উল্লেখ করেছেনতা দেখুন-

بأن تخوفوهم وتوعدوهم بالقتل والأخذ والنهب ونحو بذالك ،

(জিহাদ এভাবে কর যে,) তোমরা তাদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করবে এবং হত্যা, পাকড়াও, লুণ্ঠন ইত্যাদির হুমকি দিবে।

وبأن تذموهم وتسبوهم إذا لم يؤد ذالك إلى سب الله سبحانه ،

এবং তদের নিন্দা করবে, গালি ব্যবহার করবে যতক্ষণ তা আল্লাহ তায়ালাকে গালি দেয়া পর্যন্ত না পৌছে।

وبأن تدعوا عليهم بالخذلان والهزيمة وللمسلمين بالنصر والغنيمة ،

এবং তাদের লাঞ্চনা ও পরাজয়ের বদ দোয়া করবে আর মুসলমানদের জন্য বিজয় ও গণিমত লাভের দু'আ করবে।

وبأن تحرضوا الناس على الغزو ونحو ذالك (لمعات شرح مشكاة)

এবং মানুষদের কে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করবে, ইত্যাদি। (লাময়াত, শরহে মেশকাত) এখন একটু ইনসাফের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করুন, মুহাদ্দিসীনে কেরামের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষন অনুযায়ী কাফেরদের ---------------------স্বয়ং নবীজীর থেকে নির্দেশনা

এসেছে। অথচ আমদের কিছু অজ্ঞ দোস্ত খামাখা চিন্তিত এই বিষয়ে যে, মুজাহিদীনে কেরাম কেন কাফেরদের কে মনস্তাত্বিক ---------- করে।

সমাধান-৪

এবার আসুন সাহাবায়ে কেরামের আমল দেখি।

(১) হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ে কাফেরদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি রূপে আগত উরওয়া বিন মাসউদ সাকাফী এর সাথে কথোপকথনের এর পর্যায়ে যখন পরিবেশ একটু গরম হয়ে ওঠে তখন হযরত সায়্যিদুনা আবূ বকর রা. তাকে এমন এক গালি শুনিয়ে দেন যাতে তার চৌদ্দস্তর আলোকিত করে দেয়। তিনি বলেন-

أمصص بظر اللات ، -الصواعق المحرقة في الرد على البدع والزندقة ، إبن حجر مكى ،

(২) যা, চুপ কর/ ক্ষান্ত হ । তোর দেবতা লাতের লজ্জাস্থানের নিপুন চাট। সম্ভাবনা রয়েছে কোন বুযুর্গ এ কথা বলবেন যে, হযরত আবু বকর রা. গালি দেন নি। বরং কিছুটা শক্ত কথা বলে ছিলেন। এজন্য হযরত ইদ্রীস কান্ধলভী র. এর বর্ণনা নকল করতেছি। মাওলানা ইদ্রীস কান্ধলভী রহ. বলেন- "উরওয়া বলল, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমরা শুনেছ যে, কোন কওম স্বীয় কওমকেও ধ্বংশ করেছে। ইহা ব্যতীত যদি দ্বিতীয় কোন পরিস্থিতে এসে যায় অর্থাৎ কুরাইশ বিজয় লাভ করে তাহলে আমি দেখছি বিভিন্ন কওম থেকে যে সকল লোক তোমার সাথে একত্র হয়েছে তারা তোমাকে ছেড়ে পালাবে। হযরত আবু বকর রা. নবীজীর পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি উরওয়া কে গালি দিয়ে বললেন- কী ? আমরা নবীজীকে ছেড়ে পালাব ? উরওয়া বলল সে কে? সাহাবারা বলল আবু বকর রা.। উরওয়া বলল- খোদার শপথ! আমার উপর যদি তার অনুগ্রহ না থাকত যার বদলা আমি এখনও দিতে পারিনি তবে অবশ্যই এর জবাব দিতাম। সম্মানিত পাঠক! নবীজীর উপস্থিতিতে আবু বকর রা. কর্তৃক কাফেরকে গালি দেওয়া এবং নবীজী তাকে বাধা প্রদান না করা কাফেরকে গালি দেওয়া জায়েয হওয়ার ব্যাপারে বহুত বড় প্রমাণ।

(৩) রোমীওরা যখন দেখল হযরত আলী ও মুআবিয়া রা. এর মাঝে বিরোধ ও যুদ্ধ তুঙ্গে তখন তারা আপন স্বার্থ হাছিলের উদ্দেশ্যে হযরত মুআবিয়া রা. আর সাথে হাত মিলানোর ব্যর্থ চেষ্টা কওে চিঠি পাঠালো- আমরা শুনেছি আপনি সত্যের উপর আছেন তারপরও আলী রা. আপনাদের কে পেরেশান করে রেখেছে এবং আপনাদের উপর বাড়াবাড়ি করছে। আমরা আলী রা. এর মোকাবেলার জন্য আপনার সাহায্য করতে প্রস্তুত। আপনাদের উত্তর পাওয়ার অপেক্ষায় রইলাম। (ইতিবাচক উত্তর হলে) তৎক্ষনাৎ সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দেব। হযরত মুআবিয়া রা. রোমের সম্রাটের চিঠির উত্তরে লিখলেন-

والله لئن لم تنته وترجع إلى بلادك يا لعين لأصلحن أنا وابن عمى عليك ولأخرجنك من جميع بلادك ، ولأضيقن عليك الأرض بما رحبت ،

আল্লাহর শপথ! তুই যদি ক্ষান্ত না হস্ এবং নিজের দেশের প্রতি ফিরে না যাস্। তবে - হে অভিশপ্ত মালউন শুনে রাখ- আমি ও আমার ভাই আলী সন্ধি করে তোর বিরুদ্ধে একাত্ম হয়ে যাব এবং তোকে তোর দেশ থেকে বের করে দেব। পৃথিবী সংকীর্ণ করে দেব যদি তা প্রশস্ত। উপরোক্ত ইবারতে রেখাযুক্ত শব্দ يا لعين অর্থাৎ হে অভিশপ্ত- শব্দটির প্রতি লক্ষ্য করুন এটা কত শক্ত কথা। অন্য বর্ণনায় এসেছে- হে রোমীয় কুত্তা! আমাদের আন্তইখতিলায় দেখে ধোকা খেওনা। যদি তুই মুসলমানদের দিকে অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা করিস তবে আলী রা. এর পক্ষে সর্বপ্রথম যে সেনা তোর মোকাবেলা করবে সে হবে মুআবিয়া রা.। কথাগুলির প্রতি একটু দৃষ্টি দিলেই বিষয়টা বুঝে আসবে ইনশাআল্লাহ।

সমাধান-৫

এ বিষয়ে কুরআনে কারীমের আয়াতদ্বয়ের আলোচনা রয়ে গেছে। তা বলার আগে একটি মূলনীতি বুঝে নেই তা হল- কুরআনে কারীম নবীজীর উপর অবতীর্ণ হয়েছে সাহাবাদের উপস্থিতিতে অবতীর্ণ হয়েছে, আবার সাহাবাগণ নবীজীর থেকে সরাসরি কুরআন শুনেছেন, শিখেছেন, এবং বুঝেছেন। সুতরাং কুরআনে কারীমের ইলমী তাফসীর ও আমলী প্রতিচ্ছবি একমাত্র সাহাবায়ে কেরাম। যারা উম্মতে মুসলিমাহর

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী “সত্যের মাপকাঠি”। যার অর্থ হল তাদের প্রত্যেক কাজ ও আমল এবং কথা হুজ্জাত বা দলীল। সেহেতু আমরা যদি কুরআনে কারীমকে তাদের আমলী যিন্দেগী, ইলমী তাফসীর ও ব্যাখ্যা থেকে বোঝার চেষ্টা করি তবে কুরআন বুঝতে পারব নতুবা নয়। উপরন্তু আরও স্পষ্ট ও আত্মার প্রশান্তির জন্য উক্ত আয়াত সমূহের সঠিক উদ্দেশ্য বর্ণনা করছি।

সমাধান-৬

কুরআনে কারীমের আয়াত فقولا قولاً ليناً অথাৎ ফিরআউনের সাথে নরম ভাষায় কথাবার্তা বল- একথা আপন যায়গায় ঠিক আছে। আমরা একথা মানি। কিন্তু এটা দাওয়াত ও তাবলীগের সাথে সম্পৃক্ত। দেখুন হযরত শাইখুল ইসলাম শিব্বীর আহমাদ উসামানী রহ. এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে লেখেন- অর্থাৎ দাওয়াত তাবলীগ ও ওয়াজ-নসীহতের সময় নরম, কোমল, ও সহজ ভাষায় কথা বল। কেননা তার সীমালংঘণ ও অবাধ্যতা দেখলে কবুল করার আশা করা যায় না। সেহেতু আমার ইচ্ছা যে, সে হয়ত চিন্তা-ভাবনা করে নসীহত কবুল করে নিবে অথবা আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব ও অসীম ক্ষমতা শুনে ভয় পেয়ে আনুগত্যের প্রতি অনুরক্ত হবে। “নরম ভাষায় কথা বল” এর দ্বারা দাঈ ও মুবাল্লিগদের জন্য এটা বহুত বড় আমল বলে বুঝে আসে। কেননা অন্যত্র এসেছে-

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (سورة النحل-125)

অর্থ: আপনি আপনার রব্বের পথে ডাকুন হিকমত ও ভাল নসীহত এর মাধ্যমে এবং তাদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করুন। সূরা নাহল -১২৫ এই আয়াতের সম্পর্ক দাওয়াত ও তাবলীগের সাথে আর আমাদের কথা হল যুদ্ধ সংক্রান্ত। এ উভয়ের কথাবার্তার ধরণ ভিন্ন হয়ে থাকে। ওয়াজ-নসীহতে শ্রোতাকে একথা বুঝানো হয় যে, আমি তোমার কল্যাণকামী তোমার প্রতি আমার মুহাব্বত রয়েছে। মুহাব্বতের বহির্প্রকাশ শক্ত ভাষায় সম্ভব নয়। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা ওয়াজ ও নসীহতের পদ্ধতি বলতে গিয়ে এরশাদ করেন- ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ

وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ আপনি হিকমত ও সুন্দর নসীহতের দ্বারা আপনার রবের প্রতি ডাকুন। قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّٰهِ عَلَى بَصِيرَةٍ আপনি বলুন এটা আমার রাস্তা, আমি আল্লাহর দিকে ডাকি পরিপূর্ণ উপলব্ধির সাথে। (সূরা ইউসুফ-১০৮) ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ। সূরা হামীম-আস্‌সিজদা-৩৪ পক্ষান্তরে যুদ্ধের ক্ষেত্রে আদেশ এসেছে وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ তাদের উপর কঠোরতা কর" সূরা তাওবা-৭৩ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ কাফেরদের গর্দান কাট এবং ওদের প্রত্যেক জোড়া আলাদা করে রাখ। (সূরা আনফাল-১২) فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ হে মুহাম্মাদ সা. যুদ্ধকালে যদি তোমরা তাদের নাগালের ভেতর পাও তবে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে তাদের পিছনে যারা আছে তাদেরকেও ছিন্ন ভিন্ন করে দাও যাতে তারা স্মরণ রাখে । (সূরা আনফাল-৫৭) আমি উদাহরণ স্বরূপ মাত্র দু-চারটা আয়াত উল্লেখ করলাম। যাতে আলোচনা দীর্ঘ না হয়। নতুবা এমন আয়াত ও হাদীসের বহুত বড় ভাণ্ডার রয়েছে। সে জন্য আমার বন্ধগণ, ভাই ও বুযুর্গগণ প্রত্যেক স্থানের জন্য তার উপযুক্ত আয়াত পড় এবং উহার উপর আমল কর। তাহলে এ ধরণের ভুল বোঝার সৃষ্টি হবে না। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন

সমাধান-৭

وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ (سورة الأنعام-108)

অর্থাৎ তোমরা মুশরিকদের কে গালি দিওনা নতুবা মুর্খতা বশত তার আল্লাহ তায়ালাকে গালি দিবে। এই আয়াতের উত্তরে একটি কথা স্মৃতি পটে ধারণ করুন যে, এই আয়াতের মধ্যে নিঃশর্ত ভাবে কাফের ও মুশরিকদেরকে ঘৃণা করতে নিষেধ করা হয় নি। বরং এই আয়াতে এ বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে যে, তোমরা ওদের

দেবতাদেরকে খারাপ বল না। এর দলীল হল এই আয়াতে একথা বলা হয়েছে যে, তারা তোমাদের রবের প্রতি গালি দেবে। আর তা এজন্য যে, মা'বুদের মোকাবেলায় মা'বুদের অলোচনা আনা হয়েছে। যদি কাফেরদেরকে গালি দেয়া থেকে নিষেধ করা হত তাহলে এরশাদ হত০ তোমরা কাফের ও মুশরিকদেরকে গালি দিওনা। নতুবা তারা তোমাদেরকে গালি দিবে। যেমন তখন সাহ৯াবায়ে কেরাম আরজ করলেন হে- আল্লাহর রাসূল সা. কোন ব্যক্তি স্বীয় মাতা-পিতাকে কিভাবে গালী দিতে পারে? নবীজী এরশাদ করলেন- তোমরা কারো পিতা-মাতাকে গালি দিবে এরপর সে তোমাদের মাতা-পিতাকে গালি দিবে। কেমন যেন তোমরা নিজেই স্বীয় পিতা-মাতাকে গালি দিয়েছো।

আয়াতের জবাব:

দ্বিতীয় কথা হল আয়াতে কারীমাতে দেবতাদের কে গালি না দেয়ার কারণ এটা বলা হয়েছে যে, ওরা তোমাদের সত্য রব কে গালী দিবে। কিন্তু আজকের দৃশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। কাফের মুশরিক আজ শুধু আল্লাহ তায়ালা ও নবীদেরকে গালী দিয়েই ক্ষ্যন্ত হয় না। (আল ইয়াযু বিল্লাহ) আল্লাহ তায়ালার প্রতিকৃতি (ওদের ধারণা অনুযায়ী) সাদা দাড়ি বিশিষ্ট মানুষের আকৃতির তৈরী করে খালি ময়দানে নিয়ে উহকে টার্গেট করে ফায়ার করে মুসলমানদের রবের জানাজায় বের হওয়ার আলোচনা করে থাকে। যেমন কামিউনিষ্টরা রাশিয়াতে করেছে (আল ইয়াযু বিল্লাহ)। নবীদের এবং সাহাবাদের বিশেষ করে হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত উমার ও হযরত মুআবিয়া রাযি. এর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। হযরত উম্মুল মুমিনীন আমার সম্মাণিত আম্মাজান আয়েশা রাযি. এর নাম লিখে (আল ইয়াযু বিল্লাহ, কুফুরের বিবরণ দেয়া কুফুরী নয়) কুকুরের গলায় ঝুলানো হয়। পুরুষ ও নারী সাহাবায়ে কেরামদেরকে এত খারাপ ও নষ্ট গালি দেয়া হয় যা লিখা সম্ভব নয়। কাফেরদের পক্ষ থেকে যে গালি গুলো দেয়া হয় ত তাতো তোমাদের নিশ্চুপ থাকা অবস্থায়ও তারা দিয়ে চলছে। আর এ অবস্থায় যে কেউ এ কথা বল যে, আমরা কাফেরদের খারাপ বলব না- ইহা একটা হাস্যোকর কথা বলে মনে হয়। বরং এখন যারা কাফেরদের কে এবং ওদের নেতাদেরকে গালি দেয় তারা জিহাদ বিল লিসান করত: নিজেদের ধর্মীয় প্রতিশোধ নিচ্ছে। এবং এটা তাদের

অধিকার। কেননা কোন ব্যক্তির ব্যাপারে যদি কেউ কদর্যপূর্ণ কথা বলে তার বিপরীতে সে যদি কদর্যপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করে প্রতিশোধ নিতে পারে তাহলে ধর্মীয় ব্যক্তিদের উপর আরোপিত বিদ্বেষের জবাব কেন জবান দিয়ে দেয়া যাবে না। বরং আমাদের অধিকার হল কাফের-মুশরিকদের পক্ষ থেকে আরোপিত সকল গালমন্দের জবাব তো তৎক্ষনাত দিতে পারি না। আমাদের জিম্মায় ঋণ হিসেবে থেকে যায়। যা আদায় করা অত্যাবশ্যক। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে নিজেদের যাবতীয় কর্তব্য পালন করার তৌফিক দান করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

সংশয় -৩৩

কিছু কিছু দ্বীনি হালকা এবং দ্বীনপ্রিয় ব্যক্তিদের মাঝে একটি কথা বহুত জোরে শোরে শোনা যায় যে, উলামা এবং মেধাবী ছাত্রদের জিহাদে শরীক হওয়া ঠিক নয়। কেননা যদি উলামা ও মেধাবী ছাত্ররা ময়াদানে যাওয়া শুরু করে এবং তারা শহীদ হতে থাকে তাহলে দ্বীনের অন্যান্য কাজ কে করবে? বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ফিৎনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে উহার যথার্থ মুক্বাবালা ইলমী তাহক্বীকের সাথে হওয়া বাঞ্চণীয়। এলক্ষ্যে উলামায়ে কেরামকে ময়দানে যেয়ে ইলমী ময়দানের ফিৎনার মুক্বাবালা করা এবং উম্মতের পথ প্রদর্শন করা উচিত।

বাস্তব ঘটনা:

আমি নিজেই এর শিকার হয়েছি। তালেবে ইলমী যামানায় যখন আমি আফগানিস্তানে জিহাদে শরীক হওয়ার ইচ্ছা করি তখন পাকিস্তানের বহুত এক ইলমী ও রুহানী তরবিয়ত খানায় উপস্থিত হযে পরামর্শ চেয়েছিলাম কিন্তু যে পরামর্শ আমাকে দেয়া হয়েছিল তা হল- তোমার জন্য আফগানিস্তানে যাওয়া হারাম। কেননা এখানে যে ইলমী ফেৎনা রয়েছে মুক্বাবালা করার জন্য ইলমী ব্যক্তিদের প্রয়োজন রয়েছে। আর (তাদের কথা অনুযায়ী) আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ইলমী যোগ্যতা দান করেছেন। আমি বল্লাম, জিহাদের ময়দানে কি ইলমী ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন নেই? কেন, জিহাদ গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ও শরীয়তের হুকুম নয়? ওখানেও প্রত্যেকটি পদক্ষেপে উলামাদের প্রয়োজন। যদি জিহাদের ময়দানে উলামা না থাকে তবে জিহাদ তো ফিৎনার রূপ

ধারন করবে। এবং শরীয়তের এত গুরুত্বপূর্ণ ফরজ বিধান ভূল পথে পরিচালিত হবে যার ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়। তখন আমি উত্তর পেলাম - হাদীস শরীফে এসেছে

قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن المستشار مؤتمن .

- سنن الترمذى: 109/2 باب إن المستشار مؤتمن. رقم الحديث:2828

পরামর্শদাতা আমানতদার। অর্থাৎ যার থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা হবে সে আমানতদার হিসেবে গণ্য করা হবে। সুতরাং আমরা যা মুনাসিব মনে করেছি তোমাকে তা মাশওয়ারা দিয়েছি।

কিন্তু পরবর্তীতে যখন আল্লাহ তায়ালার দয়া ও অনুগ্রহে উক্ত ইলমী ও রূহাণী মারকায জিহাদের বাস্তবতা অনুভব করল তখন তাদের মানসিকতায় কিরূপ পরিবর্তন ঘটল দেখ। আমি তখন জামিয়া উলূমে শরইয়্যাহ সাহওয়াল ও মিশকাত শরীফ পড়ি, তারা আমার সাথে করাচী থেকে টেলিফোনে যোগাযোগ করে আদেশ করল তুমি জুনদুল্লাহ (কমাণ্ড ট্রেনিংয়ের) জন্য আফগানিস্তানে চলে যাও। তখন আমি বললাম আমি তো হাদীস শরীফ পড়তেছি? তখন বললেন পরবর্তীতে নেসাব শেষ করা যাবে।

জবাব: - দ্বীনের মূল ভিত্তি নবী ও নবুয়াত রসূল ও রিসালাতের এ বিষয়ে সর্বপ্রথম আম্বিয়া আ: দের আমল দেখা জরুরী। কুরআনে কারীমে এরশাদ হয়েছে।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ّ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوَ ّ الله وَالْيَوْمَ الآخِرَ (سورة الممتحنة-6)

অর্থ: ঈমানদারদের জন্য যারা আল্লাহ তায়ালা ও কিয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে আম্বিয়া আ: দের ত্বরীকায় তাদের রয়েছে উত্তম আদর্শ।

নবীদের সীরাত:

নবীদের আমল তো এটাই যে, তাদেরকে জিহাদের ময়দানে দেখা যায়। দেখুন হযরত হিজক্বীল আ. শামবীল আ. দাউদ আ. সুলাইমান আ. মূসা আ. হারুণ আ. এবং

খাতামুন্নাবিয়্যীণ হযরত মুহাম্মাদ সা. এর পথ হল জিহাদের ময়দানে শরীক হয়ে লড়াই করা।[২]

কোন নবীর তো এই ধারনা হয়নি যে, যদি আমি শহীদ হয়ে যাই তবে দ্বীনের কি অবস্থা হবে? দ্বীনের কাজ কে করবে? বরং নবীজী সা. তো প্রত্যেক ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সাহাবায়ে কেরামের সামনে থাকতেন। হযরত আলী রাযি. বলেন - যখন ভয়াবহ যুদ্ধ হত তখন আমরা নবীজীর আড়ালে আশ্রয় নিতাম। (আল্লাহু আকবার) এটাই হল নবীদের তরীক্বা বা পথ। সেহেতু চিন্তা করা দরকার যারা নবীদের ওয়ারিস তাদের তরীক্বা কি হওয়া উচিত।

সাহাবাদের আমলঃ

এরপর সাহাবায়ে কেরাম রা. দের আমল দেখুন, কোন সাধারণ সাহাবীও জিহাদের ময়দান থেকে অনুপস্থিত থাকতেন না। (সাধারন বলা যায় তাদের আপষের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে। নতুবা আমাদের নিকটে তারা সকলেই অতি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন।) বরং তাদের নিকট জিহাদে শরীক না হওয়া মুনাফিকদের কাজ ছিল। বড় বড় সাহবী যারা দ্বীনের ভিত্তি তাদের প্রতি লক্ষ্য করলে আমরা দেখব-

প্রথম খলীফা
নবীজীর শশুর হযরত আবু বাকার রা.
নবীজীর শশুর দ্বীতিয় খলীফা আমীরুল মুমীনিন হযরত উমার রা.
নবীজীর জামাতা তৃতীয় খলীফা আমীরুল মুমীনিন হযরত উসমান গণী রা.
নবীজীর জামাতা চতুর্থ খলীফা আমীরুল মুমীনিন হযরত আলী রা.
হযরত আবু উবাইদা রা. এর মত আমীনুল উম্মাহ
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের মত মুফাস্সির
হযরত আবু হুরায়রা রা. এর মত মুহাদ্দিস
হযরত মুআয আবনে জাবাল রা. এর মত মুজতাহিদ
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের মত ফক্বীহ

---

[২] আর নবীদের চেয়ে ইলমী ব্যক্তিত্ব ও মেধাবী পুরুষ দুনিয়াতে আর কেউ নেই। অনুবাদক

হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. এর মত ক্বারী
হযরত যায়দ ইবনে হারিসার মত কাতেবে ওহী
হযরত মুআবিয়া রা. এর মত হাদি ও মাহদী কাতেবে ওহী
হযরত হুযাইফা ইবনে য়ামান রা. যিনি নবীজী র রহস্যময় সাহাবী ছিলেন এবং অন্যান্য বড় বড় সাহাবী তো জিহাদের ময়দানে তলোয়ার চালাতেন তলোয়ার রক্তে রক্তিম করতেন। নিজের জান এবং এবং নিজেরা শহীদ হলে গেলে দ্বীনের কি হবে একথার পরওয়া না করে কাফেরদের মাথার খুলি উড়িয়ে দিতেন। এটাই আমরা দেখি।

তাবেয়ীনদের আমল:

সাহাবায়ে কেরামের পর তাবেয়ীনদের মধ্যে হযরত হাসান বসরী রহ. এর মত মুফাস্সির ও মুহাদ্দিস ও সুফী ও ফক্বীহও যখন কাবুল বিজয়ের অভিযানে ডাক্তার তাকে বাধা দিয়ে বলল আপনার সাস্থের জন্য ক্ষতি হবে তখনও তিনি জিহাদের আগ্রহে বসে থাকতে পারলেন না। ময়দানে শরীক না হওয়া ব্যতীত তার স্থীরতা অর্জন হল না।

তাবে তাবেয়ীনদের আমল:

তাবে তাবেয়ীনদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. এর মত মুহাদ্দিসের প্রতি লক্ষ্য করুন যার শাগরিদের সংখ্যা হাজারেরও অধিক। তিনি এক বছর দরস প্রদান করতেন আর এক বছর জিহাদে চলে যেতেন। প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে দুশমনের সাথে সম্মুক যুদ্ধে যে কি অপার্থিব স্বাদ অনুভব হত তা একটি ঘটনা দিয়ে অনুমান করা যায়।

একবার হযরত ফুযাইল ইবনে আয়াজ রহ. মক্কা শরীফ থেকে এক ব্যক্তির মাধ্যমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. এর প্রতি একটি চিঠি প্রেরণ করেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. তখন জিহাদের ময়দানে ছিলেন। চিঠিটির ভাবার্থ কিছুটা এমন আপনার মতো আলেম ও মুহাদ্দিসের শান তো এটাই হওয়া উচিত যে, আপনি দরসের মসনদকে অলংকৃত করে তালিবে ইলমের পিপাসা নিবরন করবেন। এবং

উলূমে নবুয়্যতের খেদমত করে আল্লাহ তায়ালার ইবাদাতের হক্ব আদায় করবেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. এর জবাবে লিখেন-

يا عابد الحرمين لو أبصرتنا ... لعلمت أنك في العبادة تلعب
من كان يخضب خده بدموعه ... فنحورنا بدمائنا تتخضب
أو كان يتعب خيله في باطل ... فخيولنا يوم الصبيحة تتعب
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا ... رهج السنابك والغبار الأطيب
ولقد أتانا من مقال نبينا ... قول صحيح صادق لا يكذب
لا يستوى غبار خيل الله في ... أنف امرئ ودخان نار تلهب
هذا كتاب الله ينطق بيننا ... ليس الشهيد بميت لا يكذب
الوسيط لسيد الطنطاوى وابن كثير

অর্থঃ হে..................

হযরত ইমাম আওযায়ী রহ. এর মত মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদকে দেখুন তিনি ইলমী ময়দানকেও শামাল দিতেন সাথে সাথে জিহাদের ময়দান থেকেও পিছে থকতেন না।

আকাবেরে দেওবন্দের আমল:

বেশী পিছনে যাওয়ার দরকার নেই নিকটবর্তী অতীতে আমাদের আকাবেরদের প্রতি লক্ষ্য করল দেখতে পাই (তাদের নিসবত হল হক্বের পরিচয়, যাদের আমলে দ্বীনের হেফাজত হয়েছে, মুসলমান তাদের থেকে ইলম পেয়েছে কুফরী শক্তির দাত ভেঙ্গে গেছে , তাদের কে আমরা জিহাদের ময়দানে দেখতে পাই। এই উপমহাদেশের তাসাউফের ইমাম সায়্যিদুত ত্বায়িফা হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কি ফক্বিহুন নাফস দ্বিতীয় ইমাম আবু হানিফা হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. হুজ্জাতুল ইসলাম কাসিমুল উলূমি ওয়াল খায়রাত হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম

নানুতুবী বারাকাতুল আস্‌র হাফেজ ইয়ামেন শহীদ রহ. প্রমুখ ব্যক্তিদের সকলকে আমরা জিহাদের ময়দানে দেখতে পাই।

তাদের অন্তরে তো এই ওয়াসওয়াসা আসেনি যে আল্লাহ না করেন যদি আমারা শহীদ হয়ে যাই তাহলে তো দ্বীনের ক্ষতি হবে। বরং হযরত নানুতুবী রহ. কে একবার বলা হল হযরত! এভাবে যদি আমারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে মাশগুল হয়ে যাই তবে তো দারুল উলুম শেষ হয়ে যাবে। তখন তিনি বললেন: দারুল উলুমের ইটের থেকে ইটের জোড়া খুলে যাবে তা বরদাশত করা হবে কিন্তু ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ ছাড়বো না।

দেওবন্দের রূহ ও ভিত আসীরে মাল্টা শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান উসমানী দেওবন্দী রহ. কে কেহ বলল: আপনার কবরের জায়গা আপনার আসাতিযা ও আকাবীরদের পাশে নির্দিষ্ট করে দিন। হযরত বললেন: তুমি এ কি বলতেছো? আমি তো চাই যে, আল্লাহর রাস্তায় আমার দেহ এত বেশী টুকরা টুকরা হবে যে, উহাকে একত্র করা অসম্ভব হবে এবং দাফনের কোন প্রয়োজন হবে না।

মাহব্বতে ইলাহিয়্যা পৃ:৩৫০ মুফতী রশীদ আহমাদ লুধীয়ানবী রহ. এর বরাত কেননা মাদ্রাসার বুনিয়াদই ছিল জিহাদ। মাদ্রাসা সমূহ ছিল মুজাহিদীনের ছাড়নি। যদি ছাউনিতে অবস্থানরত সেনাদল ও কমান্ডার যুদ্ধ ছেড়ে দেয় তাহলে লড়াই করা সম্ভব? না না কখনই না।

এজন্য বিনীত নিবেদন এই যে, রনাঙ্গনে উপস্থিত হয়ে যদি উলামায়ে কেরাম জিহাদে শরীক হয়, জখম হয়, শহীদ হয় তবে তাতে কোনদিন দ্বীন মিটেনি আর মিটবেও না ইনশাআল্লাহ। বরং ইলম আরও বৃদ্ধি পাবে, মাদ্রাসারও উত্তোরও উন্নতি হবে এবং দ্বীনে ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার হবে। কেননা যত বেশী মূল্যবান রক্ত ঝরে ততবেশী ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।

অনেক মূল্যবান প্রান যদিও হয় বিলীন

চমকাতে থাকবে ধরায় খোদার দ্বীন

ফুলের মুখাপেক্ষী নয় যে বাগান টিকে থাকতে ভূবনে।

তবু সাদা মোহিত করে ধরা সৌরভ সমিরণে।

আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত উপস্থিত, তাসখন্দ, সমরকন্দ, তিরমিয, বুখারার উলামায়ে কেরাম ময়দানে বের না হওয়ায় মাদ্রাসা সমূহকে আস্তাবলে পরিনত করা হয়, মসজিদ গুলিকে মদের আসর বানানো হয়, বরং মসজিদগুলিকে বেশ্যালয় বানানো হয় প্রতিদিন হাজার হাজার উলামায়ে কেরামকে শহীদ করা হয়। কিন্তু যেহেতু এই শাহাদাত জিহাদ এর আওতায় ছিল না তাই তাদের কুরবানীগুলো কোন ফলাফল দেখতে পরে নি।

আফগানের উলামা:

আফগানিস্তানের উলামগন যখন ময়দানে বের হয় জিহাদ শুরু করলেন, আহত হতে লাগলেন, শহীদ হতে থাকলেন, তখন সুবহানাল্লাহ কত ভাল ফলাফল দেখা গেল, রাশিয়ার দুর্দময়ী শক্তি ধুলামিশ্রিত হতে বাধ্য হল। যা দুনিয়ার উপর বিজয়ী এবং রাজত্বের স্বপ্ন দেখায়। আর তাদের রাজত্ব টিকাতে অনেক কষ্টকর হয়ে গেল। এবং কয়েক শত বছর পর খেলাফতকে আবার জিন্দা করে দিলেন। এবং মাদ্রাসার সংখ্যায় আরও কত শত বৃদ্ধি পেল। আলেমদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। দ্বীনি মাদ্রাসার ছাত্রদের পাওয়ার বেড়ে গেল। এবং কুরআন ও সুন্নাতের নেযাম ক্বায়েম হয়ে গেল।

এই জন্য এই ওয়াসওয়াসাকে অন্তর থেকে নিক্ষেপ করে ফেলে দিন। এবং কাপুরুষতা থেকে পানাহা চান যা এই ওয়াসওয়সার মূল কারণ। এবং আল্লাহর নাম নিয়ে জিহাদের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ুন। এবং শাহাদাতে অমীয় শুধা পান করুন। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকে এই উচ্চ নেয়ামত দান করুন। আমীন! ইয়া রব্বাল আলামীন!

সংশয়-৩৪

আজ কাল খুব জোরেশোরে, ধুমধাম এবং নির্লজ্জতার সাথে বলা হচ্ছে যে, ইসলাম তলোয়ারের বিনিময়ে নয় আখলাকের বিনিময়ে প্রসারিত হয়েছে এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) ও কখনো কাফেরদের সাথে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে তলোয়ার উঠান নি বরং তাঁরা তো ডাকাতদের থেকে হেফজতের জন্য তলোয়ার ব্যবহার করতেন। যদি আমাদের 'দাওয়াত' সাঠক ভাবে প্রচার হয় তাহলে কাফের আপনা-আপনি মুসলমান হয়ে যাবে। আমাদের কাউকে হত্যা করা বা কেউ নিহত হওয়ার প্রয়োজন হবে না। আজ আমদের আমল ঠিক না হওয়ার কারণে কাফেররা মুসলমান হচ্ছে না, যদি আমাদের আমল ঠিক হয়ে যায় এবং 'আখলাক' সুন্দর হয়ে যায় তাহলে কাফেররা স্ব-উদ্যেগেই মুসলমান হয়ে যাবে।

সমাধান-১

আসুন প্রথমে আমরা দেখি, 'আখলাক' কাকে বলে:

(১) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণ এবং মহত্ত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআনে কারীম ঘোষণা করেছে:

وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ (سورة القلم : 4)

অর্থাৎ আপনি সর্বোত্তম চরিত্রের নমুনায় সফল ব্যক্তি। (সূরা কালাম: ৪)

(২) উম্মুল মুমিনীন আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাযি.) কে কেউ জিজ্ঞাসা করল: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'আখলাক' কী ছিল? তখন উম্মুল

মুমিনীন আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাযি.) বললেন: كان خلقه القرآن। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লমের ‘আখলাক’ তো সম্পূর্ণ কুরআন, তাতে যা আছে তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ‘আখলাক’।

তাহলে ভেবে দেখুন, কুরআনে কারীমে জিহাদ সম্পর্কে বহু আয়াত আছে যেগুলো এ রেওয়াত অনুযায়ী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আখলাকের অংশ হবে কি হবে না ?

সুতরাং ‘তলোয়ার’কে আখলাক থেকে পৃথক করা বা আখলাক এবং তলোয়ারকে পরস্পর বিরোধী বানানো কুরআনে কারীম থেকে দুরত্ব বৈ আর কী ?

সমাধান -২

যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোবারক নাম সূমহে লক্ষ করা হয় তাহলে দেখা যাবে, যেখানে نبي الرحمة (রহমতের নবী) نبي التوبة (তওবার নবী) এর মত নাম পাওয়া যায় সেখানে نبي الملاحم (যুদ্ধা নবী) ও نبي السيف (তরবরী ওয়ালা নবী) নামও পাওয়া যায়। তাহলে কি –নাউযুবিল্লাহ– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম গুলো এমন হওয়া সম্ভব যেগুলোর মধ্যে অসদাচরণের লেশমাত্র থাকতে পারে।

সমাধান -৩

যতক্ষণ তরবারী চলে ততক্ষণ কাফেরদেরকে তরবারীর শক্তি দ্বারা গোলাম বানানো হয়, যার ফলে কাফেররা মুসলমানদের নিকট থেকে অবলোকন করার সুযোগ হয় অতপর তারা মুসলমানদের ‘আখলাক’ দেখে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়।

অন্যভাষায় বললে, কাফেরদের সেনাপতি ও জেনারেল যারা নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে গর্ব করে, তরবারী তাদের গর্ব-অহংকার ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করে ধূলোয় মিশিয়ে দেয়। তখন তাদের নিজেদের অবস্থা দেখার সুযোগ হয় এবং সমস্ত মাধ্যম থাকা সত্ত্বেও দুর্বল মুসলমানদের নিকট অপদস্থ হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালার একত্বতা স্বীকার করা ব্যতিত অন্য কোন উপায় থাকে না। তখন সে আল্লাহর একাত্বতা ও রাসূলের রেসালতের উপর ঈমান আনার মধ্যেই নিরাপত্তা বুঝতে পারে। যেমন এক

হাদীসে এসেছে যে, কিছু লোক জান্নতে যেতে চায় না কিন্তু তাদেরকে জিঞ্জির বেঁধে জান্নাতে নেওয়া হবে।

সমাধান -৪

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ:

من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله. (ابن مردويه عن أبي هريرة).

- كنز العمال: 10489 حرف الجيم. - جامع الصغير للسيوطى: 530 رقم الحديث: 8754

যে ব্যক্তি তরবারী কোষমুক্ত করল সে যেন আল্লাহ তা'য়ালার বাইআ'ত গ্রহন করল।

দুনিয়ার পীর তো বইআ'ত করে উত্তম আখলাকের জন্য, তাহলে কি আল্লাহ অসদাচরণের জন্য বাইআ'ত করবেন ?

সমাধান -৫

মেসওয়াক করে নামাজ আদায় করলে সত্তর রাকতের সওয়াব পাওয়া যায় , আর পাগড়ী পরে নামাজ আদায় করলে সত্তর রাকাতের সওয়াব পাওয়া যায়।[৩]
(ইবনে ইসহাক দাইলামী)

তো এটা আখলাক ও অনুস্বরণীয় সুন্নত কিন্তু অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নামাজ আদায় করলেও তো সত্তর রাকাত নামাজের সওয়াবের ওয়াদা আছে, (مشارع الأشواق) এটা কি আখলাক এবং অনুসরণীয় সুন্নত নয়?

যখন এ তিনটির সবগুলোই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ, তখন দুটিকে আখলাকের অন্তর্ভূক্ত করা আর একটিকে আখলাকের বহির্ভূত করা কাদিয়ানী ও দাজ্জালী পথ ছাড়া মুসলমানের কোন পথ হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন।

---

৩. যদিও এ হাদিসটি সহীহ নয়, কিন্তু শুধু পাগড়ী পরিধান করা তো সুন্নত এবং এ সন্নত সকলের নিকট পালনীয়। তাহলে অস্ত্র নিয়ে নামাজ আদায় করাও তো সুন্নত, তবে এ সুন্নত কেন পালনীয় হবে না !! (অনুবাদক)

সমাধান -৬

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেরণের উদ্দেশ্য তো সাধারণ ভাবে এমনটা বর্ণনা করা হয়

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق كذا روي عن الدراوردي .

- سنن البيهقى الكبرى: 356/10 باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليها التي من كان متخلقا بها كان من أهل المروءة. رقم الحديث:20782

অর্থাৎ আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে যাতে আমি মানুষের আখলাক সংশোধন করি।

অথবা এভাবে বয়ান করা হয় যে, انما بعثت معلما। অর্থাৎ আমাকে মানব জাতির শিক্ষক রূপে প্রেরণ করা হয়েছে।

কিন্তু আরেকটি হাদিস রয়েছে, জানি না সেটাকে বর্ণনা করতে কেন ভয় হয় ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف.

. . .

- مصنف إبن أبي شيبة 217/10 ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه. رقم الحديث:19747 - مسند أحمد : 516/4 رقم الحديث:5115

অর্থাৎ আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত তলোয়ার দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাঠদান ও আত্মশুদ্ধিকরণ আখলাক হতে পারে তাহলে তরবারীও আখলাখ হতে হবে। কেননা এটাও (তরবারী) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেয়া হয়েছিল আর যা কিছু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেয়া হয়েছে তা পুরোটাই আখলাক।

এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ২৭ গাজওয়া, ১১ তরবারী, ৭ লৌহবর্ম, ৬ কামান, ২ ধনুক, ৪ ঢাল, ২ শিরাস্ত্রণ ও মিনজানিক (প্রাচীন ক্ষেপনাস্ত্র) প্রশিক্ষণ, এবং হযরত আবু বকর (রাযি.) কে মুসলমান বনানো ও উবাই ইবনে খালফকে নিজ হাতে হত্যা করে জাহান্নমে পাঠানো সবগুলোই আখলাক এবং

রহমত। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে ঘোষণা হল, وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ (سورة القلم : 4) অর্থাৎ আপনি আখলাকের সর্বোচ্চ চূড়ায় সমাসীন।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (الانبياء : 107) অর্থাৎ আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত রূপে প্রেরণ করেছি।

এবং আমরাও নির্দেশিত হয়েছি:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (سورة الحشر:7) অর্থাৎ রাসূল তোমাদেরকে যা দেয়, তা গ্রহণ কর আর তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক।

এবং

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا (سورة الاحزاب:21) অর্থাৎ রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েচে উত্তম আদর্শ।

সুতরাং আমাদের পক্ষ থেকে কাফেরদের দাওয়াত দিয়ে মুসলমান বানানো যেমন আখলাক তেমনি কাফেরদের কতল (হত্যা) করে মানব জীবনকে কুফুরীর অন্ধকার ও অপবিত্রতা থেকে পাক করাও আখলাক।

কবিতা

সমাধান -৭

যদি শিশুর খৎনার জন্য শরীরের স্পর্শ কাতর অঙ্গ কাটা, মানবদেহের ক্যান্সার যুক্ত অঙ্গকে ফেলে দেয়া, চোরের হাত কাটা, ডাকাতের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া, মদ্যপায়ী এবং অবিবাহিত ব্যভিচারীকে দোররা মারা, বিবাহিত হলে প্রস্থরাঘাতে হত্যা করা, সেচ্ছায় হত্যাকারীকে কিসাসের ভিত্তিতে কতল করা (যদি) আখলাক এবং রহমত হয় তাহলে অনিষ্ট ও বিশৃঙ্খলা কারী কাফেরকে কতল (হত্যা) করা কিভাবে দুশ্চরিত্র হয় !!

সমাধান -৮

লক্ষণীয় বিষয় হল, আমরা যদিও নিজেদের মা-বোনদের গালি দেয়া সহ্য করতে পারি না। ঘরে ধন-সম্পত্তির হেফাজতের জন্য সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ শেষে আদালতে মামলা দায়ের করি শেষপর্যায়ে প্রতিরোধের জন্য হাত ও মুখ ব্যবহার করি। কিন্তু যখন আল্লাহর দীনের বিষয় আসে, যখন মসজিদ শহীদ করা হয়, মাদ্রাসা ভেঙ্গে দেয়া হয়, মুসলিম মেয়েদের ইজ্জত-আব্রু হরণ করা হয়, ইসলামের নিদ্র্শণ ও বিধি-নিষেধ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পবিত্রা স্ত্রীগণ, সাহাবায়ে কেরাম, কুরআনের অবমাননা করা হয় তখন এসব কমবখত্ কাফেরদের বিরুদ্ধে না যুদ্ধ করার সাহস হয় না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মুজাহিদদের সুনজরে দেখার হিম্মত হয়। এটা কি আখলাক! উদারতা কি এরই নাম!!!

সমাধান -৯

“বাকী রইল ইসলাম তরবারীর বিনিময়ে নয় বরং আখলাকের বিনিময়ে প্রসারিত হয়েছে ” কথাটি অর্থহীন মনে হয়, কারণ আমরা প্রথমেই আরজ করেছি যে, তরবারী আখলাক থেকে আলাদা কোন কিছু না বরং আখলাকেরই অংশ । তরবারীর কাজ হল, অবাধ্য, বিশৃঙ্খল ও গোঁয়ার প্রকৃতির কাফেরদের মুণ্ড ঠিক করা। যে পথের কাঁটা হয় তাকে দূর করা। কিন্তু তরবারীর জোরে কালেমা পড়ানো তো শরীয়তেরও হুকুম না বরং কাফেররা এ ব্যপারে স্বাধীন–চাই তারা কালেমা পাঠ করুক চাই কাফের হয়ে মৃত্যু বরণ করে জাহান্নমের ইন্ধন হোক।

ইসলাম তো এটা চায় যে, কাফেরদের শক্তি যেন ভেঙ্গে যায় এবং তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিদ্যমান না থাকে। যদি কাফের জীবিত থাকে তাহলে জিযিয়া (কর) দিয়ে মুসলমানদের নিকট প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে লাঞ্ছনার সাথে জীবন যাপন করবে। একারণে একথাটি অনর্থক যে, “কাফেরদের কালেমা পড়তে বাধ্য করা হয়”।

এর ব্যখ্যা সামনে প্রশ্নের অধীনে আসছে, সেখানে দেখে নিন।

সমাধান -১০

আর আপত্তি করা যে, “আমাদের আমল ঠিক নেই, কাফেররা কালেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করছে না”। এ বক্তব্য ঠিক, আমরাও এটা স্বীকার করি, কিন্তু আল কোন

জিনিসের আমল ? শুধু কি নামাজ, রোজা, হজ, যাকাতের নামই আমল ? না না বন্ধুগন, এগুলো আ'মল ইসলামের রোকন বটে কিন্তু যে আমলগুলো কুফরকে ইসলামের নিকটে আনে এগুলো সে আমল না।

আসল বিষয় হল, মুসলমানদের ঐক্য, সম্মান, ক্ষমতা এবং তাদের মান-সম্মান। বাস্তবতা হল যখন মুসলমানদের মান-মর্যাদা সংরক্ষিত না থাকে তখন তারা গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ হয় তাদের জান-মাল কাফেরদের দয়া ও করুণার উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। তখন তো কাফেররা এরকম গোলামদের দেখে কালেমা পড়বে না। যা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, الناس على دين ملوكهم। অর্থাৎ প্রজারা রাজার ধর্মের হয়, গোলামের ধর্মের নয়।

আজ পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে যদিও কতক বুযুর্গের দাওয়াতে কাফেররা ইসলাম গ্রহণ করেছে, কিন্তু ব্যপকভাবে পুরো জাতি তখনই ইসলাম গ্রহণ করেছে যখন ইসলামের ক্ষমতা এবং বিজয় হয়েছে। শুধুমাত্র রাসূলের যুগের দিকে লক্ষ্য করুন, কুরআনের ভাষায় إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجاً অর্থাৎ যখন আল্লাহর সাহায্য এল, মক্কা বিজয় হল, এবং ইসলামের জয় ও শক্তি অর্জন হল তখন লোক দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আসতে লাগল। এর আগে তো একজন একজন করে ইসলাম গ্রহণ করছিল । আমার প্রিয় বন্ধুগন ! এজন্য যেখানে অন্যান আমলের প্রয়োজন সেখানে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এবং খেলাফত কায়েমের মত আমলও অনেক বেশি প্রয়োজন। এ জন্য এ দিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টিপাত করুন যাতে ইসলাম প্রসারিত হতে পারে এবং সহীহ ও আসল রূপে ইসলাম জিন্দা থাকতে পারে। হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকি এর উসিলা বানাও। আমীন!!

সমাধান -১১

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ইসলাম গ্রহণ করা এবং ইসলাম বাস্তবায়ন করার মধ্যে পার্থক্য আছে। ইসলাম গ্রহণ করার মাসআলায় সকল ইমামগণের একমত হল, ইসলাম গ্রহণ করার বিধানের ক্ষেত্রে কারো উপর জোর বা বল প্রয়োগ করা হবে না,

অর্থাৎ কারো গলায় ছুরি রেখে কালেমা পাঠ করার তাগিদ দেয়া হবে না এবং কুরআনের আয়াত لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (দীনের মধ্যে কোন বাধ্যকতা নেই) এর উদ্দেশ্য। কিন্তু যেখানে ইসলাম বাস্তবায়ন করা এবং তার প্রসার ও প্রচলনের বিধানের কথা সেখানে যে বাধাই আসবে তা শক্ত হাতে প্রতিহত করা হবে।

সাইয়্যেদুনা হযরত আবু বকর (রা.) যারা শুধু যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে তাদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে কিয়ামত পর্যন্ত এ বিষয়টি স্পষ্ট করে গেছেন যে, ইসলামের বিরুদ্ধে কোন ধরনের ধোকাবাজি ও কৌশলবাজি সহ্য করা হবে না। তাই এ মাসআলাকে ঘোলাটে করার পরিবর্তে পূর্ণ ব্যাখ্যার সাথে বুঝা প্রয়োজন। কেননা ইসলামের মেজাজে কোন ধরনের পরিবর্তনের সুযোগ নেই।

যদি আমরা ইসলাম প্রসারিত করতে তরবারীকে উপেক্ষা করি তাহলে সাহাবায়ে কেরামের কুরবানীকে অনর্থক সাব্যস্থ করা হবে (নাউযুবিল্লাহ), যে ইসলামে প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তরবারীর তো কোন প্রয়োজন ছিল না। অথচ সাহাবায়ে কেরাম তরবারী ব্যবহার করেছেন , অধিকাংশ এলাকা তরবারী দ্বারা বিজয় করেছেন, এবং তরবারী মাধ্যমেই অসার বস্তুগুলো পরিষ্কার করেছেন।

যখন উদয় স্থল পরিষ্কার হত এবং মুসলমানগণ বিজয়ের সম্মান নিয়ে কোন এলাকায় প্রবেশ করতেন তখন সাধারণ জনগণের জন্য ঐ সকল বীরদের আখলাক দেখার সুযোগ হত এবং দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতেন। আর বাস্তবতা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, যে দায়ীর দাওয়াতের পিছনে তরবারী আছে সেই বেশি কামিয়াব হয়েছে। এ ব্যাপারে মুফতী শফী সাহেব রহ. নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ (سورة آل عمران-110)

তরজমা: তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে,.......

মুহাম্মাদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার কারণ হল, তাদের দাওয়াতকে কেউ তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারে না। কারণ তাঁদের দাওয়াতের পিছনে জিহাদের আমল বিদ্যমান আছে, যে তাদের দাওয়াতকে মানবে না জিহাদের মাধ্যমে তাদের মেষ ফায়সালা করা হবে। আগের উম্মতের মাঝে দাওয়াতের আমল

ছিল ঠিক কিন্তু তাদের দাওয়াতের পিছনে জিহাদের শক্তি ছিল না। (এ হল উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মুফতী সাহেব রহ. এর আলোচনা)

কবিতা

শেষ আবেদন

অনেক হাদীস শরীফে অস্ত্রের বিভিন্ন ফযিলত এসেছে। যেমন: এক হাদীসে এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: আল্লাহ তায়ালা তরবারী উত্তলনকারীর নামাজ নিয়ে ফেরেস্তাদের মাঝে গর্ব করেন। আরেক হাদীসে বলেন: তরবারী সাথে নিয়ে নামাজ আদায়কারীর নামাজ অন্যদের নামাজের তুলনায় সত্তর গুন বেশি উত্তম। কতক হাদীসে দুশমনকে তীর মারার ফজিলত এসেছে। সর্বোপরি এ ধরনের হাদীসের সংখ্যাও অনেক। তাহলে আখলাকের ঐ সমস্ত ব্যাখ্যাকারী যারা আখলাককে তরবারীর বিরোধী বলেন তারা এ হাদীসগুলোর ব্যাপারে কী বলবেন ? নাউযুবিল্লাহ! এগুলো কি তাহলে বদ আখলাকের দাওয়াত! কশ্মিনকালেও না। আমাদের নবী نبي السيف (তরবারীর নবী) ছিলেন, তিনি نبي الملاحم (যুদ্ধা নবী) ছিলেন। এবং তিনি সর্বোত্তম আখলাকের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে রাসূল সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বোত্তম আখলাকের অনুস্বরণ করার তৌফিক দান করেন। আমীন!!

কবিতা

সংশয় -৩৫

ব্যপক আকারে কিছু মানষ যারা নিজেদের দীনের ঠিকাদার দাবী করে বলেন, যে সমস্ত লোক আখলাক ও দাওয়াতের দ্বারা বিজয় হয়েছে সেখানে আজ পর্যন্ত ইসলাম বিদ্যমান আছে, পক্ষান্তরে যে সমস্ত এলাকা জিহাদ এবং তারবারীর জোরে বিজয় (করা) হয়েছে সে এলাকা গুলো পরবর্তীতে কুফুরীতে ফিরে গেছে। যেমন: ইরান, সমরকন্দ, বুখারা, প্রভিতী এলাকা।

সমাধান -১

আসলে এই প্রশ্নের পিছনেও সেই খারাপ মনোভাবটাও কাজ করছে যাতে তরবারীকে আখলাকের বিরোধী এবং বিপরিত বুঝানো হয়েছে। অথচ এটা স্পষ্ট মুর্খতার কথা, দ্বীন থেকে দূরত্বের আলামত এবং সীরাত সম্পর্কে অজ্ঞতা বৈ কিছু নয়।

সমাধান -২

একথা আগাগোড়া ভূল যে, যে সমস্ত এলাকা জিহাদ এবং তলোয়ারের দ্বারা বিজয় হয়েছে সেখানে পরবর্তীতে কুফুরী বিস্তার লাভ করেছে। কোন রাষ্ট্রে এমন হওয়া ভিন্ন কথা। কিন্তু একে মূলনীতি এবং সাধারণ নিয়ম হিসেবে পেশ করা অকাট্য ভাবে ভূল। দেখুন মদিনা মুনাওয়ারার আশ পাশে বনু কুরাইযা এবং বনু নযীরের এলাকা এবং খাইবার বরং মক্কা মুকার্‌রামাও তো জিহাদ এবং তলোয়রের শক্তিতে বিজয় হয়েছে। দশ হাজার সাহবী রা. সশস্ত্র অবস্থায় সেখানে গিয়েছিলেন। নাউযুবিল্লাহ! তারা কি জী! জী! বলতে বলতে কুফুরীর পায়ে লুটে পড়ে তাওহিদের দিকে দাওয়াত দিচ্ছিলেন? নাকি উচ্চ আওয়াযে তাকবীর বলতে বলতে মক্কা মুকার্‌রামায় বিজয়ী বেশে প্রবেশ করেছিলেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে পারোস্যে এবং হযরত আবু ওবায়দা রা. এর নেতৃত্বে শামে এবং হযরত হযরত আমর ইবনুল আস রা. এর নেতৃত্বে মিশরে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। এবং এসব বীর বাহাদুরেরা কাফেরদের খুলি নিয়ে খেলতে খেলতে হযরত ফারুকে আযম রা. এর যমানায় সে সকল দেশ বিজয় করেন। এবং ধন ভান্ডারের চাবি হযরত ফারুকে আযম রা. এর পদতলে এনে ফেলে দেন।

আল-হামদুলিল্লাহ এখনও পর্যন্ত মক্কা, খাইবার, হুনাইন, শাম, এবং মিশর সহ অন্যান্য সকল এলাকাগুলো ইসলামের উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

সমাধান-৩

যদি এ কথার দ্বারা এটা প্রমান করা উদ্দেশ্য হয় জিহাদের দ্বারা এ সকল এলাকা নাউযুবিল্লাহ! সাহাবায়ে কেরামের ভূল ছিল। তো এ বাক্যটি কুফুর এবং ইরতিদাদের নতুন রাস্তা খুলে দিয়েছে। কেননা সাহাবায়ে কেরাম তো রাসূল সা. এর আদেশই পালন করেছেন। রাসূল সা. শামদেশে জিহাদের উদ্দেশ্যে হযরত উসমা রা. কে সেনাপতি বানিয়ে জীবনের শেষ মুহুর্তে প্রেরণ করান। কিন্তু রাসূল সা. এর ওফাত হয়ে যায়। হযরত আবু বকর রা. সেই কফেলাকে পূনরায় প্রেরণ করেন। তাহলে এই আপত্তিতো রাসূল সা. মোবারক সাত্তার উপরও হয়ে গেল। এমনি ভাবে রাসূল সা. এরশাদ করেন। আমাকে গোটা দুনিয়ার পূর্ব-পশ্চিম একত্র করে দেখানো হয়েছে এবং আমার রাজত্ব ঐ সকল এলাকা পর্যন্ত পৌছবে তাও দেখানো হয়েছে। এই ওয়াদা হযরত ওসমান রা. এর যমানায় পূর্ণ হয়েছে।

একটু চিন্তা করুন! যেসব এলাকা যুদ্ধ জিহাদ এবং তলোয়ারের দ্বারা বিজয় করা হয়েছে। সেগুলিতো রাসূল সা. এর পক্ষ থেকে সুসংবাদ ও হুকুম ছিল। কিন্তু আজ তাহাকে দোষ হিসেবে সাব্যস্ত করা এবং উহার উপর আপত্তি তোলা এটকি দ্বীনের খেদমত না এর দ্বারা ঈমান বনবে, না অচিরেই সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

সমাধান -৪

একথা খুব ভালো করে গেঁথে নিন যে, জিহাদের উদ্দেশ্য কাফেরদেরকে মুসলমান বানানো না বরং আল্লাহ তা'য়ালার দ্বীন এবং কালেমাকে উঁচু করা। কালেমা পড়া এবং না পড়ার ব্যপার, কাফেরদের পূর্ন ইচ্ছা এবং স্বাধীনতা আছে, কাউকে জোরপূর্বক মুসলমান করা যায় না। বরং জিহাদের উদ্দেশ্য শুধু এই যে, মুসলমানদের সম্মান এবং প্রভাব তৈরি হয় এবং কাফেররা পরাজিত হয়ে থাকে।

একথা স্পষ্ট যে, যখন সাহাবায়ে কেরাম রা. গন কাফের রাষ্ট্র জয় করেছেন তখন সেখানে মানুষদেরকে কালেমা পড়ার উপর বাধ্য করা হয়নি। যারা আনন্দ চিত্তে চেয়েছে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, বাকীরা জিযিয়া (কর) দিয়ে নিজেদের জান হেফাজত করেছে।

তারপর পরবর্তি প্রজন্মের কর্তব্য ছিল, সেখানে জিহাদ চালু রাখা এবং ঐ সমস্ত এলাকায় নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি নি:শেষ না হতে দেওয়া। কিন্তু অপরাধ তো পরবর্তী প্রজন্মের লোকদের সাহাবায়ে কেরাম রা. যারা ইসলামের প্রচার প্রসারের রাস্তা সূমহ খুলে দিয়ে এবং কুফুরের মৃত্তিকার স্বাধ আস্বাদন করার উপর বাধ্য করে অনুগ্রহ করে ছিলেন তাদের নয়।

সুবহানাল্লাহ! নিজেদের অপরাধেকে ঐ সকল আকাবীরদের (মহান ব্যক্তিদের) মাথার উপর চপিয়ে দেয়া কত বড় নির্বুদ্ধিতা এবং মূর্খতা ঔদ্ধত্য এবং বেয়দবীর কথা (হতে পারে) !?

ফুকাহায়ে কেরামগন তো এপর্যন্তও লিখেছেন যে, যে সমস্ত এলাকা জিহাদের মাধ্যমে বিজয় হয়েছে সেখানে খতীব সাহেব তরবারী হাতে নিয়ে খুৎবা দিবেন। জনগনকে একথা অবহিত করার জন্য যে, এ এলাকা তরবারীর মাধ্যমে বিজয় হয়েছে। যদি মানুষ ইসলাম থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করে তাহলে এ কথা যেন স্বরণ করে নেয় যে, আজো পর্যন্ত মুসলমানদের হাতে এই তরবারী বিদ্যমান আছে যা ইসলাম থেকে বিমুখতা প্রদর্শন কারীদেরকে ঠিক করে দিবে। বিস্তারিত দেখুন (ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া খন্ড:১)

এখন যদি উলামা এবং সালেহীন গন তরবারী হাতে নিয়ে খুৎবা দেওয়ার পরিবর্তে তরবারীকে ইলেমের জন্য অসম্মানী বুঝতে থাকে বরং বয়ান করতে থাকে এবং তরবারীকে আখলাক ও যহুদ-তাক্বওয়ার বিরোধী বানায় এবং ইসলামের পথের বাঁধা মনে করে তাহলে কুফুর ছড়াবে না তো কী ছাড়াবে?

সারকথা হল, যে সমস্ত এলাকায় দ্বিতীয় বার কুফুর ছড়িয়েছে তার কারণ ছিল সেখানে মুসলমানগন জিহাদ করা ছেড়ে দিয়েছে।

সুতরাং মুসিবত জিহাদ ছাড়ার কারণে জিহাদ করার কারণে নয়। হে আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করো। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

ফারুকী শাসন ব্যবস্থা:

যদি আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ফারুক রা. শাসনকে পরবর্তী শাসক গন ও প্রতিষ্ঠা করতো এবং মুসলমানরা সেটার উপর আমল করতে থাকতো তাহলে পুনরায় কাফেররা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোন পথ ছিলো না।

দেখুন ফারুকী শাসন ব্যবস্থা যারই কোন শিশু জন্ম গ্রহন করত সে তার নাম রেজিস্ট্রি অর্ন্তভূক্ত করাত এবং সেই শিশুর ভাতা উসূল করত। যখন তখন শিশুর পনের বছর হত এবং বগলে পশম গজাত তখন যুদ্ধে যেত। (ইসলামী তাহযীব: মাওলানা আব্দুল করীম কুরাইশী.বীর শরীফ)

সংশয় -৩৬

ইমারাতে ইসলামীয়া আফগানিস্তান এর পতনের পর অনেক লোকের যাবানের এ প্রশ্ন ও তোলা হচ্ছে যে, তালোবানরা যেহেতু জোড় করে লোকদের দাড়ি রাখিয়েছিল, আর যে লোক গুলো তাদের সাথে মিলে জিহাদ করেছিল তাদের ঈমানের উপর

শুরুতে মেহানত করা হয়নি, বরং ঈমানের মেহনাত করা ব্যতিতই যুদ্ধের ময়দানে চলে গিয়েছিল তাই যখন আমেরিকা আক্রমন করল তখন লোকরা গাড়ি মুন্ডিয়ে ফেলে, মহিলারা বোরকা খুলে ফেলে তার দ্বিতীয়ত তাদের মুজাহিদ ও কমান্ডাররা ও কে কে বসলেন। এবং আমীরুল মু'মিনীন এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। যার কারনে তালেবানদের শাসন ক্ষমতা খতাম হয়ে যায়।

সমাধান-

এ প্রশ্নের আসল উৎপত্তিস্থল তো সেই জিহাদ থেকে দূরত্ব এবং অন্তরে নেফাকী (কপটতা) যা বিভিন্ন আঙ্গিকে বক্তব্যের দ্বারা প্রকাশ হতে থাকে। যদি জিহাদ ও মুজাহিদদের সাথে আন্তরিকতা থাকত তাহলে কখনো এমন কথা মুখে আসত না, আর যদি ইতিহাসের বাস্তবতা সামনে থাকত তাহলে তো এ ব্যাপারে অন্তরে সন্দেহও সৃষ্টি হত না। কেননা এমন ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে আগেও ঘটেছে। কিছু লোক যারা অন্তর থেকে ঈমান আনে নি, বরং পার্থিব সার্থ হাসিলের জন্য উদ্দেশ্যে শুধু বাহ্যিক ভাবে মুখে ঈমান প্রকাশ করত। যখন তাদের সাথে আসত এবং দ্বীনের জন্য কুরবানির পালা আসত তখন সাথে সাথে তাদের ভিতরে লুকানো কপঠতা ও নোংরামী যবানের উপর প্রকাশ হয়ে যেত।

আমি শুধু এর একটি উদহারণ নবী আলাইহিস সালামের যুগ থেকে পেশ করছি, গাযওয়ায়ে ওহুদ এর সময় যখন রাসূল সা. এক হাজার সৈন্য নিয়ে রওয়ানা করলেন তখন তিনশ মুনাফিক এ অযুহাতে মদিনায় ফিরে এল যে, আমাদের পরামর্শ ছিল মদীনা মুনাওয়ারায় থেকে যুদ্ধ করার, কিন্তু আমাদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়নি। আর যে পদ্ধতিতে আপনার যুদ্ধ করতে চাচ্ছেন তা সময় নীতির মোতাবেক যুদ্ধেই না।

এখন আপনি চিন্তা করুন এই যুদ্ধে রওয়ানা কারী তো ছিলো মাত্র সাতাশ, এবং তাঁরা শেষ নি:শ্বাস পর্যন্ত রাসূল সা. সাথেই ছিলেন। আর (পথ থেকে) প্রত্যাবর্তন কারী ছিল তিনশ মুনাফিক। কিন্তু কোন ঈমানদার ব্যক্তি ঐ তিনশ মুনফিকের কারণে রাসূল সা.

এর সভার উপর এই অপবাদ দেয়নি যে, রাসূল সা. তাদের ঈমানের উপর মেহনত কারন নি, এবং ঈমানের উপর মেহনত ব্যতিত লোকদের ময়দানে নিয়ে গিয়েছিলেন। এঘটনা সম্পর্কে শুধু মাত্র এতটুকু বলা হয় যে, মুনাফিকরা তো ভেগে গিয়েছিল। তবে মুখলেসীনগন জানের পরোয়া করা ব্যতিত রাসূল সা. সঙ্গী হয়েছিলেন। এবং এই যুদ্ধে যদিও বাহ্যিক ভাবে মুসলমানদের পরাজয় হয়েছিল। কিন্তু মুখলেস ও সত্যিকার নিবেদিত প্রান তো সাথেই ছিলো।

তালেবান ও আমীরুল মু'মিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ দামাত বারাকাতুহু এর ব্যপারটা এমন দৃষ্টি থেকেই দেখুন, যখন কঠিন মুহূর্ত ও(সামনে) আসল তখন মুনাফিকরা বেকে বসল দাঁড়ি মুন্ডিয়ে ফেলল, এবং কাফেরদের সাথে সাথ্যতা গড়তে লাগল। কিন্তু যারা অকপট তারা তো আজো হযরত আমীরুল মু'মিনীন দামাত বারাকাতুহুমের সাথে আছেন। সুতরাং আমাদের ভীরুতা ও কপটতার সমালোচনা করি, তেমনিভাবে হযরত আমীরুল মু'মিনীন এবং তাঁর একনিষ্ঠ নিবেদিত প্রাণ সাথিদের আনুগত্ব জান উৎসর্গ এবং বীরত্ব ও দৃড়তার আলোচনা ও যেন করি। আশ্চর্যের কথা হল, যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়নকারী মুনাফেকদের আলোচনা তো হাজারো মানুষের সভায় করা হয়। কিন্তু সুদৃঢ় একনিষ্ঠ মুজাহিদদের বীরত্বে কাহিনী শুধু রেখেই দেওয়া হয়। হায় আশ্চর্য!

আমার প্রিয় বন্দুগন: এজন্য আমাদের উচিৎ যে, আমরা আমাদের ঈমানকেএমন (দৃঢ়) বানাব যেমন হযরত আমীরুল মু'মিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ দামাত বারাকাতুহুম, শায়েখ উসামা বিন লাদেন রহ. এবং তাদের সাথীদের আছে। যেখানে বড় বড় শক্তিধর শাসক গুষ্টি আমেরিকার সামনে হাটু গেড়ে বসে গেছে। নিজেদের বিরুদ্ধে আবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেছে। রাজত্ব ছুটে গেছে। অধিবাশি থেকে আনবাসি হয়ে গেছেন। সাথীদের থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। উপকরনের ভরসা নি:শেষ হয়ে গেছে। অন্যদের কি আপনজনদের বিষাক্ত তীরের সম্মোখীন হতে হচ্ছে। কিন্তু এক আল্লাহর উপর তাদের এমন সুদৃঢ় ঈমান যে, আল-হামদুলিল্লাহ আজো পর্যন্ত না ঈমান বিক্রি করেছেন না জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ র মত উঁচু পথ ছেড়েছেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদেরকে তাঁদের পথে অনুস্বরণ করে চলার তৌফিক দান করেন।

সংশয় -৩৭

কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, বসনিয়া ও অন্যান্য স্থানে জিহাদ নয় বরং এটা তাদের মন্দ কর্মের আযাব। যখন তদের আমল ঠিক হয়ে যাবে তখন এ আযাব আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যাবে।

কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, বসনিয়া ও অন্যান্য রাষ্ট্রের মুসলমানদের উপর কফেরদের থেকে এই কষ্টদায়ক মসিবতের পরম্পরা তখন শুরু হয়েছে, এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষনা করেছে। যদি এই মুসলমানগন আমাদের মত আজ-ই কাফেরদের সাথে আপষ করে নেয়, তাহলে তাদের থেকেও এই মসিবত ও কষ্ট দূর হয়ে যাবে। বরং কফেরদের পক্ষ থেকে তাদের আনেক প্রাচুর্যও হবে।

সমাধান -১

আমার ভাই ও বন্দু গন! তাহলে এটা কেমন আযাব যে, কাফেরদের সাথে সন্ধি করো কুফরের আঈন-কানুনকে মান এবং এরই সাথে সবধরনের অসাধারন বদমাশী ও আত্মমর্যাদাহীনতার প্রকাশ ও ঘটাও তাহলে নাউযুবিল্লাহ আল্লাহ নিজে আমাকে উঠিয়ে নিবেন, আর যখন কুফুরের আঈন কানুন এর বিরোধিতা করবে নাউযুবিল্লাহ তখন আল্লাহ তা'য়াল মুসলমানদের উপর নারাজ হয়ে, আযাব নাযিল করবেন?

সমাধান -২

যদি দ্বীনের হুকুম জিন্দা করা যে সমস্ত মসিবত এবং কষ্ট আসে তার নাম যদি "আযাব" হয়, তহলে হযরত আম্বিয়া আলাইহিম ওয়া সাল্লাম, তাদের সাথী এবং রাসূল সা. ও তার সাহাবীগনের উপর যে সকল মসিবত এসেছে সে গুলোকে কী বলা হবে?

যখন রাসূল সা. এর উপর ওহী নাযিল হয়নি এবং তিনিও তাওহীদের ঘোষনা দেন নি তখন কাফেররা কিছুই বলেনি আর যখন ওহি নাযিল হল, এবং নবুওয়াত প্রাপ্তির পর তাওহিদের ঘোষনা দিলেন তখন কি এমন অসহনীয় দু:খ-কষ্ট শুরু হয়নি। যা থেকে পরিত্রান ও নিরাপদে থাকার জন্য আমরা কামনা করি।

সমাধান -৩

মুসলমানের উপর যখন কোন কষ্ট আসে চাই তা বড় থেকে বড় হোক বা ছোট থেকে ছোট হোক হয়তো তা আযাব, না হয় গুনাহের কাফ্ফারা নতুবা তা আস্থার উন্নতির মাধ্যম। এজন্য দু'টি মূলনিতি বুঝে নিন।

প্রথম মূলনীতি : আল্লাহর অনুগ্রহ যদি কোন ব্যক্তি শুরু থেকেই গুনাহ থেকে দূরে থাকে, আল্লাহ তা'য়ালার সাথে সম্পর্কও সুদৃঢ় থাকে, এবং দ্বীনের উপর আমলও

অতপর এই মসিবত আসে চাই দ্বীনের জন্য হোক বা দুনিয়ার কারনে হোক, তাহলে এই মসিবত ও কষ্ট আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে নেয়ামত এবং মর্যাদার উন্নতি ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম হয়। যেমন নবী আলাইহিস সাল্লাম গণ, সাহাবায়ে কেরামগণ, এবং আল্লাহর ওলীগন।

আর যদি প্রথমে গুনাহ করতে থাকে এবং কোন কষ্ট অথবা মসিবত আসার পর গুনাহ থেকে তওবা করে তাহলেও এমসিবত আল্লাহ তা'য়ালার নিয়ামত। কেননা এটা গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায়।(গুনাহকে মুছে দেয়) যেমন সাধারন গুনাহগার বান্দারা যারা কোন মসিবতের পর তওবা করে থাকে। আর যদি শুরু থেকেই গুনাহ করে তাহলে নিশ্চিত এই মসিবত আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়াতে আযাব আর আসল আযাব তো আখেরাতে হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাজাত করুক।

দ্বিতীয় মূলনীতি : খুব ভাল করে মনে রাখুন যে বিষয়টা ব্যপক ভাবে সকলের উপর ফরজ তাতে কমতি করার কারনে শাস্তি সকলের উপর আসবে আর যে বিষয় ব্যক্তি বিশেষের উপর আসে। আর "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ " সবার উপর ফরজ সুতরাং তা ছেড়ে দেওয়ার কুফল সকলেরই ভোগ করতে হবে এবং তা আদায়ের ফায়দাও সবারই হবে।

এদুই মূলনীতির পর ভেবে দেখুন যে সকল দেশে পরিবর্তন এসেছে কি না?

সর্বপ্রথম দৃষ্টিন্ত আফগানিস্তানকেই দেখুন! রুশ শাসন আমলে পুরো পৃথিবিতে চলমান বলা যথা যোগ্য হবে যে, এখন সারা দুনিয়ায় জিহাদের জন্য মৌলিক আবদান রেখেছে। এবং একথা জিহাদের যত আন্দোলন মাথা উঠাচ্ছে এ সব আফগান জিহাদেরই বরকতে।

আফগানিস্তানে তো এখন ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কোরআন-সুন্নাহর বিধান প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সারা দেশে একজনও বেপর্দা নারী একজন দাঁড়ি মুন্ডানো পুরুষ নেই। কোন সিনেমা-টিভি নেই। কোন ছবি এমনকি কোন প্রাণির ছবিও দৃষ্টি গোচর হয় না। সুদী কারবার বন্ধ হয়ে গেছে। মোট কথা হল সম্পুর্ন দ্বীনে ইসলাম যিন্দা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ।

তাছাড়া অধিকৃত কাশ্মীরে লক্ষ করলে দেখা যায়। সামাজিক ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবায়ন। সিনেমার বিলুপ্তি। এবং যুবক মুসলমানের চেহারায় মোবারক ময় সুন্নাতের ইত্যাদি দৃশ্যমান হচ্ছে।

এমনিভাবে অন্যান্য যেমন বসনিয়া, চেসনিয়ার মত দেশগুলোতেও পরিবর্তন আসছে। আমি শুধু ইঙ্গিত করলাম। এজন্য আল্লাহর রহমতকে কষ্ট এবং নেয়ামাতকে আযাব বলা নির্বোদ্ধিতা ও দ্বীন থেকে দূরত্বের প্রমান বহন করে। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সত্য লেখার, হক্ব বলার এবং হক্বের উপর আমল করার তৌফিক ও দান করেন।

সংশয়-৩৮

কশ্মীর, ফিলিস্তিন, চেচনিয়া ও অন্যান্য দেশে যেই কমান্ড ও যুদ্ধ ও ভূগর্ভের কর্মকান্ড নববী শিক্ষা হল তো প্রথমে কাফেরদেরকে দাওয়াত দেওয়ার পালা আসে।

কিন্তু এখানে তো না ইমানের দাওয়াত দেওয়া হয়। না জিযিয়া তলব করা হয়। না খোলামেলা, সামনা-সামনি যুদ্ধ হয়?

সমাধান -১

এ সন্দেহের সৃষ্টির কারনেই হল। আমার নির্বোধ বন্দু শরীয়ত ও নবুয়তের আদর্শ সম্পর্কে আবগত না। বরং নিজ চিন্তার ফলাফলকে নববী আদর্শ নাম দেওয়াটাই তার অভ্যাস আল্লাহ তা'য়লা তাকে এই বক্র স্বভাব থেকে হেফাজত করেন।

জিহাদের পূর্বে ইমানের দাওয়াত জিযিয়া অতপর জিহাদ করার বিষয়টি সামনে আসছে। সেখানে এব্যপারে আলোচনা করা হবে। এখানে শুধু কমান্ড অভিযান এবং ভূগর্ভস্থ ও গুপ্ত হামলার শুধু কুফুরের পাকড়াও করেছেন। এ কারনে গুপ্ত হামলার শুধু যুদ্ধই যুদ্ধ হয়ে থাকে। আর এতুটুকু যথেষ্ট। এবং এই যুদ্ধের দ্বারাই আসল উদ্দেশ্য আর্জন করার চেষ্টা করা হয়।

পরিভাষাই যাকে বলে গুপ্ত হামলা, জরুরীই নয় তাতে সুযোগ ও ঘোষনা থাকা। কীসের জন্য লড়ছে সে নয় কি তার জানা।

কাফের হারাবীকে দাওয়াত দেওয়াই আবশ্যক না হযরত পাক সা. মদীনার অভ্যন্তরিন এবং বর্হিগত অবস্থা সুসংহত করার পর জিহাদের সূচনাই করেছেন গুপ্ত হামলা দিয়ে। সর্ব প্রথম তো রাসূল সা. কুরাইশদের ব্যবসায়ী কাফেলার উপর আক্রমন করেন যাতে কুরাইশদের অর্থনৈতিক শক্তি ভেঙ্গে দেওয়া যায়। এবং তাদেরকে যুদ্ধের পূর্বে বড় ধরনের ক্ষতির দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করে দেওয়া যায়। এজন্য হযরত পাক সা. নিয়মতান্ত্রিক বড় বড় যুদ্ধের করতে আরম্ভ করলেন।

এখন দেখুন হযরত পাক সা. এর গুপ্ত হামলা বর্ণনা করা হবে যেগুলোতে স্বয়ং হযরত পাক সা. হাজির ছিলেন।

(১) গাযওয়ায়ে আবু ওয়ায়ে সফর ২য় হিজরীতে ষাটজন মুহাজির সাহাবায়ে কেরাম রা. দের নিয়ে হযরত পাক সা. কুরাইশদের কাফেলা এবং বনু জামরাহ্র উপর হামলা করার জন্য আবওয়ার দিকে সফর করেন। ঝান্ডা হযরত হামযা রা. এর হাতে ছিল। আর মদীনায় রাসূল পাক সা. এর স্থলাবিষিক্ত ছিলেন হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রা.

(২) গাজওয়ায়ে "বুয়াত" ২য় হিজরীর রবিউল আউয়াল অথবা রবিউস সানীতে দুইশত মুহাজির ও আনসার সাহাবায়ে কেরাম সাথী নিয়ে রাসূল সা. "বুয়াত" নমক স্থানের দিকে গমন করেন। আর মদীনা মুনাওয়ারায় হযরত পাক সা. হযরত সায়ের ইবনে উসমান রা. নিজের স্থলাবিষিক্ত করেন।

(৩) গাযওয়ায়ে "উশাইরাহ" ২য় হিজরীর জামাদিউল উলায় দুইশত মুহাজির সাহাবায়ে কেরাম রা. সঙ্গে নিয়ে হযরত পাক সা. কুরাইশ কাফেলার উপর হামলার জন্য "উশাইরাহ" দিকে রওয়ানা করেন। এবং মদীনায় হযরত আবু উসামাহ ইবনে আব্দুল আসাদ রা. কে নিয়ে স্থলাবিষিক্ত বানান

(৪) গাজওয়ায়ে "সফওয়ান" ২য় হিজরীতে হযরত পাক সা. ক্বিরয ইবনে জাবের ফাহরীর বিরোদ্ধে সফওয়ান সফর করেন। এবং মদীনা মুনাওয়ারায় হযরত যায়েদ ইবনে হারেছ রা. কে নিজের স্থলাবিষিক্ত করেন।

(১) হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব: ২য় হিজরীর রবিউল আউয়ালে অথবা রবিউস সানীতে ত্রিশজন মুহাজির সাহাবায়ে কেরামকে সাদা ঝান্ডা দিয়ে আবু জাহেলের ব্যবসায়ী সর্বপ্রথম আমীর ও সৈন্য বাহিনী বানিয়ে "ইস" নামক স্থানের দিকে রওয়ানা করান।

(২) সাহাবী উবায়দাহ ইবনে হারিছ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসে হযরত উবায়দাহ রা. এর সাথে ষাট অথবা আশিজন মুহাজির সাহাবা রা. দেরকে আবু জাহেলের অধীনে ব্যবসায়ী কাফেলার উপর আক্রমন করার জন্য "বাতনে রাবেগ" নামক জায়গায় পাঠান।

(৩) সারিয়ায়ে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস: ২য় হিজরীর যিল কা'দা মাসে কুরাইশের এক ব্যবসায়ী কাফেলার উপর আক্রমন করার জন্য হযরত সা'দ রা. কে বিষজন মুহাজির সাহাবায়ে কেরাম রা. দেরকে রওয়ানা করান।

(৪) সারিয়ায়ে যায়েদ ইবনে হারেছ : ২য় হিজরীর জামাদিল উখরা মাসে কুরাইশের এক ব্যবসায়ী কাফেলার উপর হামলার জন্য একশ সাহাবীগনের সাথে কিরদার দিকে রওয়ানা করান।

সমাধান -২

এছাড়াও হযরত পাক সা. নিজেও ব্যক্তিগত ভাবে কিছু কাফের দলপতি অতি আস্থাভাযন কিছু (মানব) শয়তান কিছু খারাপ চরিত্রবান বৃদ্ধ এবং দূ:সচরিত্রা মহিলাকে হত্যা করেছেন। কিন্তু একাজ পরিচালনা ও গোপনে এবং কমান্ডো আক্রমনের আলোকেই হয়েছে।

(১) ২য় হিজরীর ২৬ রমজান অন্ধ সাহাবী হযরত উমায়ের ইবনে আদী রা. রাতের আঁধারে এক ইয়াহুদী মহিলা ইয়াযীদ ইবনে যায়েদের স্ত্রী আসমা বিনতে মারওয়ানকে হত্যা করেন। নবী আ. এর পক্ষ থেকে সুসংবাদ গ্রহন করেন।

(২) ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসে হযরত সালেম ইবনে উমায়ের রা. ১২০ বছরের ১৪ই রবিউল আউয়াল তারিখে রাসূল সা. এর আদেশ ইয়াহুদী আবু রা'ফে আব্দুল্লাহ ইবনে আবুল হাকীক কে কতল করেন।

(৩) ৩য় হিজরীর ১৪ই রবিউল আউয়ালে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক রা. রাসূল পাক সা. এর আদেশে ইয়াহুদী নেতা আবু রা'ফে আব্দুল্লাহ ইবনে আবুল হাক্বীক কে কতল করেন।

(৪) ৩য় হিজরীর ৫ই মহর্‌রমে খালিদ ইবনে সুফিয়ান হাবালীকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রা. কে পাঠান। ফিরার পর তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ

দেন। এবং পুরুষ্কার স্বরূপ লঠি মোকবারক হাদিয়া দেন। আর বলেন। ইহা আঁকড়ে ধরে জান্নাতে চল।

সমাধান -৩

হযরত পাক সা. এর যামানায় ১০ম হিজরীতে ইয়ামানে আসওয়াদ আনাসী নবুয়াত দাবী করে। নাযরান দখল করে নেয়। অতপর সা'নার অগ্রসর হয় সেখানের গভর্নর হযরত শাহর বিন বাযাম রা. কে শহীদ করে দেয়, হযরত শাহর বিন বাযাম রা. এর স্ত্রীকে হযরত ইযায রা. কে জোরপূর্বক বাদী বানান। এবং মিথ্যক আসওয়াদ আনাসী পুরা ইয়ামানের উপর দখল নিয়ে নেন। রাসূল পাক সা. যখন এ ঘটনা সম্পর্কে অবগত হন তখন ইয়ামানে তিন মুসলমান ছিলেন তিনি তাদের সবার উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখেন । হযরত আওয়াবার ইবনে ইয়াখনাস রা. কে দিয়ে পাঠান যে চিঠির মূল ভাষন ছিল নিম্নরুপ "সকল মুসলমান নিজ ধর্মের উপর অটল থাক। এবং সকল মুসলমানের উচিত আসওয়াদ আনাসীকে হত্যা করার জন্য ঘর থেকে বের হওয়া। "চাই ময়দানের মুকাবেলায় (প্রকাশ্যে) তাকে হত্যা করুক অথবা গুপ্ত আক্রমনে (হত্যা করুক)"।

চিঠির ভাষার দিকে লক্ষ করলে দ্বীনের মেযাজ বুজতে কোন অসুবিধা হবে না।

অবশেষে হযরত ফিরুজ দাইলামী রা. তার চাচাতো বোন (যাকে আসওয়াদ আনাসী যোর পূর্বক বাদী বানিয়ে ছিল) ইয়ায, কায়েস বিন বুগুছ এবং যাশীশ ইবনে দাইলামীর সাথে মিলে রাতের আধারে গেরিল/অতর্কীত আক্রমন করলেন। যার ফলে আসওয়াদ আনাসীকে হত্যা করা হল এবং এর মাধ্যমেই তার রাজত্ব খতম হল। এবং মুসলমানদের ক্ষমতা পূনুরুদ্ধার হল।

সুতরাং এখনো এমন অবস্থায় কফেরের কর্তৃত্বের স্বীকার মুসলমানের জন্য শরীয়তের আদেশ হল সে কাফেরের কর্তৃত্বকে গ্রহন করবে না । বরং তা নিঃশেষের জন্য জিবনের মরন পন চেষ্টা করবে। আর এর মধ্যে তাদের সকল চেষ্টা ও কষ্টে শরয়ী জিহাদের ফজিলত হাসিল হবে।

সংশয়-৩৯

কাশ্মীর জিহাদের ব্যপারে ব্যপক ভাবে এ প্রশ্ন করা হয় যে, কাশ্মীর জিহাদে অংশ গ্রহনকারী সংগঠন গুলোর উপর বিভিন্ন এজেন্ডাদের নিয়ন্ত্রন আছে। এবং সেখানে এজেন্ডাদের চাহিদা অনুযায়ী-ই কাজ করা হয়। আর এজেন্ডা দ্বারাও কাশ্মীরে জিহাদে একনিষ্ঠ নয়। বরং তারা চায় এ কাজ চলতে থাকুক মুজাহিদরা মরতে থাকুক আর (এলোক গুলো) নিজেদের পকেট ভরতে থাকুক কেননা পাকিস্তানের প্রত্যেক রাষ্ট্র প্রধানই কাশ্মীরে কথা বলে। নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান উচু করে। যদি এ সকল ধাধা শেষ হয়ে যায় তাহলে তদের রাজনিতি ও শেষ হয়ে যাবে। এবং কাশ্মীর জিহাদ ওলামায়ে কেরামের ফতুয়ার ভিত্তিতে হয়েছে এমনটাও না। বরং এটাতো এজেন্ডাদের একটি চাল।

সমাধান -

এ প্রশ্নের উত্তরে আমি আমার সম্মানিত উস্তাদ হযরত মাওলানা যাহেদ আর-রাশেদী সাহেব দা.বা. এর আলোচনা হুবহু উল্লেখ করছি। যা আওসাফে আখবারের কলাম "নাওয়ায়ে কালাম" (কলামের আওয়াজ) প্রকাশ হয়েছিলো "পাকিস্তানের কিছু জ্ঞানের মজলিস ও জ্ঞানী ব্যক্তিত্বের প্রশ্ন যে, কশ্মীরের জিহাদ আফগানের জিহাদের মত না। কারন আফগান জিহাদের ফতুয়া ওলামায়ে কেরাম দিয়েছিলেন। এরই ভিত্তিতে জিহাদি দল গুলো রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলো। তারা নিজেদের কর্ম সিদ্ধান্তে মুক্ত ছিল।

কিন্তু কাশ্মীর জিহাদ তার পুরাপুরি বিপরিত। এরা নিজেদের কর্ম-সিদ্ধন্তে মুক্ত নয়। এজেন্সীদের নিয়ন্ত্রন তাদেরকে বেষ্টন করে রেখেছে। এবং নিয়ন্ত্রন কারী নিজে জিহাদের কোন ঘোষনা দেয়নি। এজন্য কাশ্মীরের জিহাদকে আফগানিস্তানের ন্যায় শরয়ী জিহাদের মর্যাদ দেয়া যাবে না। কিন্তু আমার নিকট এই দিকটি একটি ভুল ছাড়া কিছুই না। কারন কল্পিত বিষয়টি তখনই গ্রহন করা যেত যখন জিহাদী গ্রুপগুলোর

মেহনতকে কাশ্মীর জিহাদের উৎশ ধরা হত। কিন্তু বাস্তব বিষয়টি তার বিপরিত। বরং আসল ইতিহাস হল, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কাশ্মীরের উলামায়ে কেরাম যাদের মধ্যে আমীরে শরীয়ত হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আতাউল্লাহ শাহ বুখারী রহ., মাওলানা আব্দুল্লাহ কফলগায়ী, মাওলানা গোলাম হায়দার জান্তালুভী, মাওলানা ইউসুফ খান আফপলন্দরী, মাওলানা আব্দুল হামীদ কাসেমী, মাওলানা আব্দুল্লাহ সিয়াখুভী, মাওলানা মুযাফ্ফর হুসাইন নদভী সহ আরো অন্যান্য বড় বড় উলামায়ে কেরাম অন্তর্ভক্ত ছিলেন। তারা ডোগড়া শসকের আগ্রাসনের বিরোদ্ধে জিহাদের ফতোয়া দেন এবং এর ভিত্তিতে নিজেরাও ময়দানে বের হয়ে কাশ্মীরের স্বাধীনতার জন্য জিহাদের সূচনা করেন। যার ফলাফলে আযাদ কাশ্মীরের বর্তমান কর্তৃত্ব অর্জন হয়। এর পরে না ঐ সকল উলামায়ে কেরাম এ ফতোয়া ফিরিয়ে নিয়েছেন না কাশ্মীরের জনগন স্বাধীনতা ও কোশেশ-মেহনত থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছেন। এজন্য কাশ্মীর জিহাদের বর্তমান অবস্থা তারই ধারাবাহিকতার অংশ। এবং এর শরয়ী ভিত্তি উল্লেখিত উলামায়ে কেরামের ঐ ফতোয়ার উপর যার সূত্রে-ই গোগড়া উপোনিবেশ থেকে যুদ্ধ করে আযাদ কাশ্মীরের ভূখন্ড স্বাধীন করা হয়েছে। এটি কারন যে, আজো কাশ্মীর জিহাদের বড় অংশ দ্বীনি জামাত এবং মাদ্রাসার উলামায়ে কেরাম ও ছাত্রদের হাতেই। এবং তারাই মূল গোষ্ঠী। আর পাকিস্তান সরকার ও এজেন্সিদের অবস্থান আজো সহযোগী হিসেবে আছে। যেমনটা আফগান জিহাদে আছে। তবে সীমান্ত ও অসহায় এলাকা গুলোর অবস্থা সম্পূর্ন ভিন্ন। আর এ ভিন্নতাই কিছু মানুষের মেধাকে মসিবতে ফেলেছে। আমার মতে কাশ্মীর জিহাদের ব্যপারে সাবধানতা অবলম্বন কারীরা ইতিহসের দৃষ্টিতে দেখলে তাদের প্রশ্নের সমাধান করবে যে, কাশ্মীরের জনগনের চেষ্টা মেহনত শরয়ী জিহাদের মর্যাদা রাখে। যার সহযোগীতা করা আমাদের দ্বীনি দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত।

শোনা কথায় দিওনা কান বন্দু হে!
এটা শুধু রাজনৈতিক বিশৃঙ্খল বলেছে কে?
এতো ইসলাম ও কুফুরের যুদ্ধ জনাব,
কাশ্মীরের যুদ্ধ নিশ্চিতই জিহাদ।

সংশয়-৪০

কাশ্মীরের যুদ্ধ তো নিরেট দেশীয় যদ্ধ। ইসলামের যুদ্ধ নয়। কারন j.k.l.f এবং ন্যাশনাল ডেমক্রিটিক ফ্রন্ট ও অন্যান্য কিছু সংগঠন প্রকাশ্যে স্পষ্ট ভাবেই ঘোষনা দিয়েছে। আমাদের দাবি শুধু হিন্দুস্তান স্বাধীন করা। এবং কাশ্মীরে কাশ্মীরীদের শাসনের অধিকার থাকবে। চাই কাশ্মীরি মুসলমান হোক,অথবা হিন্দু শিখ, খৃষ্টান যাই হোক না কেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে তাদের যুদ্ধের মূল কথা এটাই যে কশ্মীরে ভিনদেশীদের শাসন চলবেনা। এ দাবি আদায় হলেই তাদের জিহাদের পসিমাপ্তি ঘটবে। তাহলে এখন আপনি বলুন, এটা ইসলামী জিহাদ ?

সমাধান -১

সর্ব প্রথম আমরা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে কাশ্মীরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের দিকে নজর বুলাই। এছাড়া কাশ্মীরের জিহাদ বোঝা সম্ভব নয়।

কাশ্মীরে ৮০০ সালে মুসলিম ব্যাবসায়ীদের অগমনের সূচনা হয়। কিন্তু ১২৯৫ সালে শায়েখ শরফুদ্দিন আব্দুর রহমান ওরফে বুলবুল শাহ ৯০০ মুরীদ সমিব্যিহারে তিব্বতের পথ দিয়ে কাশ্মীরে আসেন। অসংখ্য লোক হযরতের হাতে মুসলমান হন। ঐ সময় ১৩২৫ সালে রাজ নেঞ্চন স্বীয় পত্নী কোটারানী হযরতের হাতে মুসলমান হন। তখন হযরত বুলবুল শাহ তার নাম রেখে দেন সদরুদ্দীন।

এভাবে ১৩২৫ থেকে ১৮১৮ পর্যন্ত কাশ্মীরে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠত থাকে। ১৮১৯ সালে বঞ্জিত সিং আক্রমন করে গোটা জম্মু ও কাশ্মীর অধিকার করে নেয়। এই রাজা রঞ্জিত সিংয়ের বিরুদ্ধেই আমীরুল মোমেনীন সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ ও হযরত ইসমাইল শহীদ রহ. জিহাদ অবতীর্ন হন। ১৮১৯ থেকে ১৮৪৫ সন পর্যন্ত রঞ্জিত সিং, খরক সিং, রাচি চাঁদ, কোরশের সিং, দিলিপ সিং পর্যয়ক্রমে শসক হয়। রাজত্ব কালের এ শেষ সময়ে এসে ইংরেজদের মোকাবেলায় যুদ্ধে রাজার পরাজয় হয়। এবং

শিখদের উপর যুদ্ধে ভর্তুকি আসে ৫২ ভাগ, রাজা রঞ্জিত উক্ত ভর্তুকির বদলায় কহিনুর হিরা এবং জম্মু ও কাশ্মীরের কর্তৃত্ব ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়। এর কিছু কাল পর ইংরেজরা ৭৫ লাখের বিনিময়ে জম্মু ও কশ্মীরের ক্ষমতা রাজা গোলাপ সিংয়ের কাছে বিক্রি করে দেয়। এবং অস্ত্র বলে তা গোলাপ সিংয়ের দখলে এনে দেয়। এর পর মুসলমান গন ১৩ই জুলাই ১৯৩১ সালে রাজা হরি সিংয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ফলে রাজা হরি সিং জম্মু ও কাশ্মীরের কর্তৃত্ব ইংরেজ নিরাপত্তাবাহিনীর হাতে সোপর্দ করে দেয়। কিন্তু ১৯৪০ সালে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রহ তিব্র হলো। এবং জমিনের উপরেও নিচে জিহাদ শুরু হয়ে যায়। দেখতে দেখতে মুজাহিদরা গিলগিট, বেলুচিস্তান, চিলাছ এর এলাকাগুলো অধিকার করে নেয়।

অতপর ১৬ই অগষ্ট ১৯৭৪ সালে বারামুলিক মুজাফ্ফারাবাদ, মিরপুর, কোটলি, পুচঁ ও রাজুরের মুসলমানগন জিহাদের ঘোষনা দেন। যার ফলে ডেগড়া ফৌজের পা উপড়ে যায়। তাদের হাজার হাজার সৈন্য মারা যায়। আর কাফেরেরা জম্মুর দিকে পালিয়ে যায়।

অবশেষে রাজা হরি সিং ভারতের প্রধানমন্ত্রি নেহেরুর সাথে সমোজতা করে স্বীয় পুত্র ক্রিন সিংয়ের জন্য রাষ্ট্রিয় একটি পদ বরাদ্ধ করার শর্তে পুরো জম্মু ও কাশ্মীর ভারত সরকারের কাছে সপে দেয়। এভাবে ভারতিয় কাফের সরকার এই কশ্মীর দখল করে নেয়।

এই ইতিহাসের সার কথা হচ্ছে, ১৩২৫ থেকে ১৮১৮ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫০০ বছর কাশ্মীরে মুসলিম শসন প্রতিষ্ঠিত থাকে, এর পর কাফেররা দখল করে নেয়। যার বিরুদ্ধে সর্ব প্রথম আমীরুল মুমিনিন সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ রহ. ও তার পরে তার সনাম ধন্য খলিফা মাওলানা সাইয়্যেদ ইসমাইল শহীদ রহ. জিহাদের সূচনা করেন। যা কোন না কোন ভাবে আজ পর্যন্ত অব্যহত আছে এবং থাকবে -ইনশা আল্লাহ- যতক্ষন পর্যন্ত কাশ্মীরে ইসালামী শাসনের পতাকা উড্ডিন না হবে।

এই ভূমিকার পর আরজ হল, ফিক্বহে হানাফি, শাফেয়ী, মালেকীও হাম্বলী ফোকাহায়ে কেরাম একথার উপর একমত যে, যদি মুসলিম দেশে কাফেররা আক্রমন করে, তবে সেখানকার মুসলমানদের উপর যুদ্ধ করা ফরজে আঈন। আর যদি সেখানকার মুসলমারা যুদ্ধ না করে, অথবা শক্তি না থাকার কারনে যুদ্ধ করতে না পারে, তখন উভয় অবস্থায় পার্শ্ববতী মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজে আঈন হয়ে যায়। এভাবে চলতে চলতে দুনিয়া সমস্ত মুসলমান পর্যন্ত গিয়ে পৌছে। এর জন্য ফতোয়া প্রদানেরও কোন প্রয়োজন নেই।কেননা ফতোয়া আমার বিষয় নয়। এছাড়া ফতোয়া এখন ব্যাপক।

সমাধান -২

যদি একথা মেনেও নেয়া হয় যে সে খানকার মুসলমানরা শুধু নিজেদের দেশের জন্য যুদ্ধ করছে তাহলে আমার প্রশ্ন হল ,শরীয়ত কি সেটার অনুমতি দেয় যে কাফেররা আমাদের সম্পদ জীবন , ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে আমারা অনুভূতিহীন বসে থাকব? কক্ষনও না। কিছুতেই নয়। বরং শরীয়ত পুরো প্রতিশোধের অনুমতি দেয় এবং নিজের জীবন, সম্মান ও সম্পদ রক্ষার জন্য লড়াই করে নিহত হওয়াকে শাহাদাতের মর্যাদা প্রদান করে। হাদীস শরীফে দেখুন و من قتل دون نفسه فهو شهيد যে তার জীবন রক্ষার জন্য নিহত হয় সে শহীদ। و من قتل دون أهله فهو شهيد আর যে পরিবার রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ। و من قتل دون ماله فهو شهيد যে তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ। (আহকামুল কুরআন-৪য় খন্ড পৃষ্ঠা:৪৫)

সমাধান -৩

কাশ্মীরের আন্দোলন একটি বিশুদ্ধ শরয়ী আন্দোলন। এবং সেখানকার জিহাদ বিশুদ্ধ শরয়ী জিহাদ। বাকী থাকল এই আপত্তি যে এদের মধ্য হতে কয়েকটি দল ব্যক্তি স্বাধীনতার আড়ালে শুধু কাশ্মীরের কাশ্মীরীদের শাসনেরই স্লোগান দেয় চাই শাসক হিন্দু হোক বা শিখ কিংবা খৃষ্টান হোক । একেতো আলহামদুলিল্লাহ কাশ্মীরে তাদের কোন গুরুত্ব নেই। লোকজন এখন জিহাদ বুঝে গেছে । আর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, কিছু লোকের ভুল শ্লোগানের কারনে কি আমরা সঠিক শ্লোগান বর্জন করব? কেউ যদি এ কথা বলে যে মির্জা কাদিয়ানী যেহেতু মিথ্যা নবুওয়াত দাবী করেছে, তাই আমি সত্য নবীকেও মানব না-তবে কি একথাটি সঠিক হবে? যদি না হয় আর নিশ্চিতই সঠিক নয়। তাহলে কিছু লোকের ভুল শ্লোগানের কারনে আমরা সত্য শ্লোগান কিভাবে বর্জন করতে পারি?

কাশ্মীর উপত্যকার উপমা কিছুটা এমন, যেমন জমীনে জান্নাত নেমে এসেছে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমাদের শাহরগ আমাদের থেকে পৃথক, তথাপি আমাদের কাফনে ভাজ পড়েনি। যে দেশ কখনও মুসলমানদের হাতে ছিল তার পূনর্দখল মুসলমানদের উপর অবশ্য কর্তব্য।

সমাধান -৪

যদি একথা স্বীকৃত হয় যে কাশ্মীরে ৫০০ বছর পর্যন্ত মুসলিম শাসন চলছে এরপর তা ছিনিয়ে নিয়েছে। যার থেকে কাশ্মীর আযাদ করা আমাদের সবার উপর ফরজ ছিল এবং থাকবেও বটে । তবেতো ব্যাপরটা হল যে কি লোক আমাদেরই অলসতার কারনে ভুল শ্লোগান নিয়ে সামনে বেড়ে গেছে। আমরা যদি সামনে বাড়তাম তবে তাদের এই সুযোগ হতে না । তাহলে তো অপরাধ আমাদেরই।

অতএব এসব লোকদের জন্য ময়দান খালি ছেড়ে দিয়ে পরবর্তীতে আমাদের উচিৎ সামনে বেড়ে আন্দোলনের কর্তৃত্ব আমাদের হাতে নেয়ার চেষ্টা করব যাতে এই আন্দোলনকে বিশুদ্ধ ইসলামী আন্দোলন হিসেবেই জীবিত থাকে। এবং এই জিহাদ

বিশুদ্ধ ইসলামী জিহাদ হয়। যদিও তা প্রথম থেকে শরয়ী ও ইসলামীই আছে। তথাপি আমি আমার আপত্তিকারী বন্ধুর ধারনা ও চিন্তার আলোকে একথাটি বললাম।

মহা সুসংবাদ!!!

এই সময় আলহামদুলিল্লাহ! প্রায় দুনিয়ার প্রতিটি কোনায় জিহাদের আওয়াজ উঠছে। কিন্তু আমি বিশেষভাবে এসময়ে কাশ্মীরে কর্তব্যরত মুজাহিদদেরকে যারা বাস্তবে গাযওয়ায়ে হিন্দে লিপ্ত একটি এমন সুসংবাদ শুনাতে চাচ্ছি সাধারণভাবে জিহাদের কিতাবে যার উল্লেখ থাকে না। হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. হিন্দুস্তানের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم – وذكر الهند: يغزو الهند بكم جيش يفتح الله عليهم حتى يأتوا بملوكهم مغللين بالسلاسل يغفر الله ذنوبهم، فينصرفون حين ينصرفون فيجدون ابن مريم بالشام. (نعيم).
– كنز العمال: 397719 حرف قاف . 257\24 –
جامع الأحاديث للسيوطى: مسند أبي هريرة : 335\39 –
كنز المال للمتقى الهند : نزول عيسى 698\14

হিন্দুস্তানে একটি বাহিনী তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে যাদের উপর আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয় দান করবেন এমনকি ঐ মুজাহিদগন তাদের রাজাদের গলায় বেড়ি পড়িয়ে নিয়ে আসবে আল্লাহ তাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। তারা যখন বিজয় করে প্রত্যাবর্তন করবে তখন শামে ঈসা ইবনে মারইয়ামকে পাবে। অনেক নিদর্শন দৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, এখন ঈসা আ: এর অবতীর্ণ হওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। আর হিন্দুস্তানের জিহাদ তো শুরু হয়ে গেছে।

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকেও ঐ কাফেলায় শরীক করুন। আমীন!

সংশয় -৪১

মুজাহিদরা নিজ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে গিয়ে জিহাদ করে। কিন্তু তাদের দেশে কি কুফুর,শিরক, যুলুম, সীমালঙ্গন, অন্যায় পাপাচার, নগ্নতা, ব্যভিচার এবং যে সমস্ত খারপ বিষয়গুলোর কারনে জিহাদ করতে হয় সেগুলো কি খতম হয়ে গেছে? যখন

নিজ দেশেই জিহাদ ফরযের কারনগুলো বিদ্যমান তখন উচিৎ ছিল প্রথমে নিজ দেশে জিহাদ করা পরবর্তীতে অন্য দেশে (জিহাদ করা) ।

সমাধান -১

যদি এ নীতি মেনে নেয়া হয় যে, যতক্ষন পর্যন্ত নিজ দেশে কুফুর, শিরিক, ও অন্যান্য অন্যায় করা যাবেনা। তাহলে এ নীতি কি শুধু জিহাদ ও মুজাহিদদের জন্য না দ্বীনের অন্যান্য শাখা এবং সেই শাখার নেককার উলামা, মুবাল্লিগ, দায়ীদের জন্যও? যদি না হয় (অবশ্যই না) তাহলে শুধু মুজাহিদরাই কেন এর লক্ষ বস্তু হয়।

বন্ধু হে! পথা চলাচলের এপথ ভালো না

সারা পৃথিবীতেই দ্বীন জিন্দা করা জরুরি ।

শুধু নিজ দেশের উপর ক্ষান্ত থাকা উচিৎ না।

সমাধান -২

আমার মতে আমাদের উলামায়ে কেরাম শতকরা ৯৫ জন নিজের এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় দ্বীনে কাজ করছে। তাদের কি নিজ পৌত্রিক এলাকায় দ্বিনে কাজ পূর্ণ হয়ে গেছে? না তাদের এই খেদমত আল্লাহ না করুন বেকার হয়ে যাবে। তদ্রুপ দাওয়াত তাবলিগের জন্য মানুষ অন্য দেশে যায় ।অথবা উলামায়ে কেরাম অন্য দেশে যান। তাদের এই সফর বা অনন্য বিষয়গুলো কি শরিয়ত পরিপন্থী এবং নাজায়েজ হবেনা? আল্লাহ না করুন বেহুদা এবং বেকার হবে?

সমাধান -৩

একটি গুরুত্বপুর্ন কথা হল আমাদের দেশে পাকিস্তানের অবস্থা অন্যান্য দেশের তুলন ায় অনেক ভিন্ন দ্বীনি মাদরাসাৎগুলো স্বাধীন । জিহাদের আলোচনা বরং ট্রেনীং

পর্যন্ত প্রকাশ্য হচ্ছে। জিহাদের কেন্দ্রগুলো খোলা আছে । তা ছাড়া কোন বাধা বিপত্তি ছাড়াই দ্বিনের সকল কাজ করা যাচ্ছে , যদিও মাঝে মাঝে সরকারের পক্ষ থেকে অনেক মুশকিল বিষয় দাড় করিয়ে দেওয়া হয় । কিন্তু সাধরণত অবস্থা হল , পাকিস্তানে অস্ত্রযুদ্ধের ক্ষতি বেশি এবং উপকার কম হবে ।

সবছেয়ে বড় কথা হল পাকিস্তান এখন সারাা দুনিয়াতে ইসলামি জিহাদের জন্য বিশটি ক্যাম্পের ভুমিকা পালন করছে। রাশিয়ার মত পরাশক্তিকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে এখন ভারতকে টুকরো টুকরো করার পথে । আর এর সর্বত্রই পাকিস্তানের উসিলায় এপর্যন্ত হয়েছে।

যদি এই সময় পাকিস্তানে প্রশিক্ষনের উপর বিধি-নিষেধ আরম্ভ হয় তাহলে কাশ্মীরে জিহাদী আন্দোলনের উপর আনেক খারাপ প্রভাব পড়বে আনেক এবং ইসলামী ইমারত আফগানিস্তান এর স্থায়ীত্ব উপর অনেক বড় ঝুকি আসবে। এধরনের আরো অনেক বিপদ সামনে রেখ পাকিস্তানে জিহাদের পরিবর্তে শুধু জিহাদের দাওয়াত এবং অস্ত্র-সস্ত্রের প্রশিক্ষনের উপর বেশি জোড় দেওয়া হচ্ছে।

সমাধান -৪

তাই যদি কোন এক রাষ্ট্রের বিবাদমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে শরঈ কল্যানের ভিত্তিতে সেখানে আপাতত জিহাদ করা না যায় তাহলে এর অর্থ কি এটা যে, এ কারনে অন্য কোন রাষ্ট্রেও জিহাদ করা যাবেনা। যদিও সেখানে জিহাদ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে যায়। আর রাষ্ট্রের জনগন এ প্রয়োজন পুরনের সামর্থ ও রাখে।

সামন্য অনুভুতিও যার আছে সে এরকম ধ্যান ধারনা দ্বীনের ব্যাপারে দূরে থাক দুনিয়ার ব্যাপারে ও পোষন করতে রাজী না।

আপনিকি কখনো দেখেছেন কিংবা শুনেছেন যে, কোন ব্যাক্তি অপর এলাকায় বা অন্য রাষ্ট্রে চাকুরীর জন্য যায় না শুধু এ কারনে যে, আমার দেশেই কাজ নেই অন্য দেশে কেন যাবো।

পূর্বোক্ত ধ্যান ধারনা টি না দুনিয়ার কোন ব্যাপারে কেউ বয়ান করে না জিহাদ ব্যতিত ইসলামের অন্য কোন বিধানের ব্যাপারে বয়ান করে। কিন্তু জিহাদের প্রতি যে বৈরিতা আছে তা তো কোন এক ভাবে প্রকাশ করতেই হবে।

উল্লেখ্য

কাফেররা যদিও জিহাদের কঠোর বিরোধী এবং জিহাদ নিয়েই তাদের সবচে বেশী মাথাব্যথা তা সত্ত্বেও তাদের মনো বাসনা হল যে পাকিস্তানী মুজাহিদগন পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধেই জিহাদ ঘোষনা করুক। এটা দ্বীনে ইসলামের প্রতি মহাব্বত থাকার কারনে নয়। বরং এতে তাদের বড় অর্জন হল যে, মুজাহিদগন তাদের নিজ ভূমিতেই জড়িয়ে যাক। আর মুসলমানরা উভয় মুখী ক্ষতির স্বীকার। যদি ধ্বংস হয় তাহলে মুসলমানদের দেশই ধ্বংস হোক। মুজাহিদদের জিহাদী শক্তি নিজ ভূখন্ডেই ব্যায় হোক আর কুদরী ভূখন্ড থাকুক এ শক্তির নাগালের বাইরে।

সমাধান -৫

প্রকৃত কথা তো এটাই যে, ইসলামী শরীয়তের মেযাজ হল, একজন মুসলমান সারাটা জীবন দ্বীন সাথে লেগে থাকবে এবং মৃত্যু অবধি আখেরাতের প্রস্তুতিতে লিপ্ত থাকবে। পরিস্থিতি যেমনই হোক দ্বীনের ফিকির ও আমল গুলো থেকে সে উদাসীন হবে না। এর জন্য যথাসাধ্য অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে পর্যায় ক্রমে নিজ রাষ্ট্র থেকেই কাজ শুরু করবে। যদি নিজ এলাকা ও রাষ্ট্রের লোক গুলোর মাঝে কাজ চালু করার কোন সম্ভাবনা না দেখা যায় তাহলে তখন অন্য এলাকা ও রাষ্ট্রের অভীমুখী হবে। এবং সময় সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে। এটাই নবুয়তের মেজায, শরীয়তের মেজায ও সাহাবীগনের মেযাজ।

আপনি যদি নববী যুগ ও পরবর্তী যুগের ইসলামী ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দেন তবে এ বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে সামনে আসবে। চাই রাসূলে আরাবী সা. এর মক্কী জীবন হোক বা মাদানী জীবন।

সমাধান -৬

যদি নিজের দেশের প্রতি এতটাই দরদ থাকে আর জিহাদের আগ্রহ ও থাকে তাহলে প্রিয় বন্ধু! এই কাজ নিজেই কেন আঞ্জাম দিচ্ছেন না। হিম্মত করুন। বড় মজা লাগবে। পরিক্ষা শর্ত

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন!

সংশয় -৪২

অনেক সময় কোন মুজাহিদ নিজের গুলি দ্বারা, অথবা অন্য কোন মুজাহিদের অসতর্কতা বসতঃ তাহার হাতে, অথবা ট্রেনিংয়ের সময় গ্রেনেড অথবা গুলি বিস্ফোরনে মৃত্যু বরণ কতে দেখা যায়। তখন মুজাহিদরা নিজের দলের শহীদ বাড়ানোর লক্ষে তাকে শহিদদের মাঝে গন্য করেন।

অথচ শহীদ কেবলমাত্র সেই হয়ে থাকে যে কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে কাফের কতৃক আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করে।

সমাধান -

এসব প্রশ্ন আমাদের নিতান্ত মুর্খতার কারণেই হয়ে থাকে, কেননা হাদীসের কিতাবগুলোতে এমন অসংখ্য হাদীস পাওয়া যায়, যেখানে কোন কোন সাহাবী নিজের তলোয়ারেই শহীদ হয়েছেন। অথবা নিজের অন্য কোন সহ যোদ্ধার অস্ত্রে শহীদ হয়েছেন। অথচ রাসূল সা. তাকে শহীদদের মাঝে অন্তরভূক্ত করেছেন। এখন তাদের প্রকৃত শাহাদাতের ব্যাপারে কারো সন্দেহ আছে?

অন্যথায় আমার অবুঝ বন্দুদের কথা অনুসারে রাসূল সা. এর শহীদদের সংখ্যা বাড়ানো উদ্দেশ্য ছিলো:- নাউজুবিল্লাহ।

এখন আপনি নিজেই আপনার উত্তর পেয়ে যাবেন। যে আমার জন্য রাসূল সা. এর আমল প্রমান, দলিল, এবং সনদ বরং সব চেয়ে বড় সনদ।

দলীল নং :-১

বদর যুদ্ধে একজন সাহবী শহীদ হলে তাঁর মা উম্মে হারেছা রা. রাসূল সা. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করলেন হে আল্লাহর রাসূল সা. আমার ছেলে শহীদ, কিন্তু সে অজানা তীরে বিদ্ধ হল। এবং এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য নেই যে এ তীর কি কফেরের ছিল না মুসলমানের ছিল, যদি সে জান্নাতে হয় তাহলে আমি ধর্য ধারন করব অন্যথায় আমি কাঁদব! তখন রাসূল সা. বললেন তুমি এসব কি বল ? জেনে রেখ জান্নাতে তো অনেক স্তর রয়েছে

وإن ابنك أصاب جنة الفردوس

- صحيح البخارى : 394/1 باب من أتاه سهم غرب فقتله. رقم الحديث:2809 - سنن الترمذى : 151/2 ومن سورة

المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم. رقم الحديث:3198 -
مسند أحمد : 328/11 رقم الحديث:13946 ،
এবং তোমার ছেলে সর্বোচ্চ স্তর জান্নাতুল ফিরদাউসে আছে। (ছহীহুল বুখারী)

দলীল নং :-২

খায়বার যুদ্ধে ইহুদিদের সর্দার ও বীর যার মারহব উচ্চ আওয়াজে এই কবিতা পড়তে পড়তে যুদ্ধের ময়দানে আসলো।

قد علمت خيبر أني مرحب *
شاكي السلاح بطل مجرب
إذا الحروب أقبلت تلهب

খায়বার বাসী জানে যে আমি মারহব, আমি অস্ত্রে সজ্জিত এবং অভিজ্ঞ বীর এবং যুদ্ধের সময় আমি গর্জে উঠি । হযরত আমের রা. তার মোকাবেলায় এই শের পড়লেন

قد علمت خيبر انى عامر *
شاكى السلاح بطل مغامر

হযরত আমের রা. মারহাবের উপর হামলা করলেন, তখন সে পিছনে সরে গিয়ে প্রাণ বাচালেন। কিন্তু হযরত আমেরের তলোয়ার ছোট ছিল ফলোশ্রুতিতে হাঁটুতে এসে আঘাত লাগল। যার কারণে হযরত আমের রা. শহীদ হলেন তখন কিছু লোক বলতে লাগল কি আশ্চর্য কথা, যে সে নিজের তলোয়ারেই মারা গেল। তখনই ভলো লাগতো যদি সে কোন কাফেরের তলোয়ারে শহীদ হতো। হযরত আমেরের ভাগিনা বলেন, মানুষ আমার মামার ব্যাপারে যা বলে তা শুনে আমি মর্মাহত হলাম, এই ভেবে যে যদি সত্তিকারে তাঁর মর্যাদায় ঘাটতি আসে?

তখন আমি রাসূল সা. এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিঙ্গাসা করলাম হে! আল্লাহর রাসূল সা. আমার মামা যেভাবে শহীদ হলেন সে ব্যাপারে তো মানুষ বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলিতেছে। তখন রাসূল সা. বললেন তাঁকে সাধারণ শহীদদের চেয়ে দ্বীগুণ

প্রতিদান দেওয়া হবে (এক. শাহদাতের সাওয়াব দুই. তাঁর শাহদতের উপর মানুষের সমালোচনের সাওয়াব) (বুখারী)

شعر

দলীল নং :- ৩

উহুদ প্রান্তরে হযরত মুছআব বিন উমায়ের রা. শহীদ হলেন, যেহেতু তিনি রাসূল সা. এর সাদৃশ্য পূর্ণ ছিলেন, এসযোগে সয়তান রাসূল সা. এর শহাদাতের মিথ্যা খবর প্রচার করল। তখন মুসলমানরা বিক্ষিপ্ত ও বেহুশ হয়ে গেল, এই বেহুশ হওয়ার কারণে শত্রু এবং মিত্রের মাঝে পার্থক্য দূর হয়ে গেল। হযরত ইয়ামান রা. এই বেহুশদের মাঝে এসে গেলেন, ফলে তিনি মুসলমান দের হাতে শহীদ হয়ে গেলেন। তখন মুসলমানরা অনেক লজ্জিত হলেন। এবং হযরত হুজাইফা রা. কে বললেন, আল্লাহর শপথ আমরা চিনি নি। হযরত হুজাইফা রা. বললেন, يغفر الله لكم وهو أرحم الرحمين আর্থাৎ আল্লহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিন তিনি সর্বাধিক দয়ালু।

রাসূল সা. যখন রাসূল সা. দিয়ৎ দেয়ার ইচ্ছে পোশন করলেন তখন হযরত হুজাইফা রা. অস্বিকৃতি জানালেন, যার ফলে রাসূল সা.এর কাছে হযরত হুজাইফা রা. এর মর্যাদা ও বেড়ে গেল।

দলীল নং :-৪

আপগানিস্তানে মুজাহিদদের খালিদ বিন ওয়ালিদ নামিয় সেনা ছাউনির মুজাহিদরা পেশওয়ারে অরস্থানরত তার উস্তাদ জামিল ইমরান সকনা বিন বুজাহ এর সাথে সম্পর্ক রাখনে ওয়ালিদদের কে তিনি গ্রেনেডের ট্রেনিং দিতেন ঘটনাক্রমে তিনি গ্রেনেড বিস্ফরনে শহীদ হয়ে গেলেন।

প্রতাক্ষ্য দর্শিরা বলেন শহীদ হওয়ার সাথে সাথে সেনা ছাউনি থেকে এক অপূর্ব সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ল। এবং তাঁকে পাহড়ের পদদেশে সেনাছাউনিতেই মসজিদের দক্ষিন পশ্চিম পাশে দাফন করা হলো। তখন আসমান থেকে তাঁর কবর পর্যন্ত লম্বা এক আলোর ঝলক অনেক দিন পর্যন্ত পরিলক্ষিত হতো পরে আবার তা চলে যেত।

এটা এমন এক শহীদের কারামত যিনি নিজ গ্রেনেডের বিস্ফরনে মারা গেলেন। আল্লাহ যেন তাঁর মাক্বাম আরো বাড়িয়ে দেন। উল্লেখিত ঘটনা থেকে আর কিছু বুঝে না আসুক অন্তত একথা তো বুঝে আসলো যে সে আল্লাহর দরবারে শহীদ হিসেবে গন্য হয়েছেন।

সংশয় -৪৩

মুজাহিদগন যারা দ্বীনের হেফাজত ও বিজয় এবং শরয়ী আইন বাস্তবায়নের জন্য জিহাদ করে। কিন্তু যখন নিজেরা কোন বিপদে পড়ে তখন শত্রুর ভয়ে নিজেদের দাঁড়ি কেটে ফেলে। যখন দ্বীনের রক্ষক দ্বীনের জন্য জীবন উৎসর্গ কারী ব্যাক্তি সামান্য একটি সুন্নতের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পরল না। তখন ইসলামের ব্যাপারে অন্যদের থেকে কি আশা করা যায়?

সমাধান -১

শরীয়তের হুকুম সমূহের মধ্যে হতে সবচে বড় শরয়ী হুকুম আল্লাহর সত্তার উপর সুদৃড় ঈমান, এবং সবচে বড় গুনাহ হলো কুফুরী করা।

যখন কোন ব্যাক্তি প্রান নাশের ভয় হয় অথবা শরীরের কোন অঙ্গের ধংশের ভয় হয়। তখন অন্তরের ঈমান পরিপূর্ন ও শান্ত থাকার শর্তে মুখে কুফুরী কালিমা উচ্চারন করা জায়েয আছে।

এমনি ভাবে শরয়ী দৃষ্টিকোন থেকে অমার্জনিয় গুনাহ হলো রাসীল সা. এর শানে বেয়াদবী মুলক কথাবার্তা এবং গালি দেওয়া। এটা এমন গুনাহ যে মক্কা বিজয়ের সময় যেখানে সাধারন ক্ষমার ঘোষনা দেওয়া এসেছে। সেখানে পনের ব্যাক্তির ব্যাপাওে বলা হয়েছে তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই হত্যা হবে। এমন কি এই নির্দেশের আওতায় অনেক মহিলাও ছিলো।

এরং তার মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন খাতালের হত্যার নির্দেশ ঐসময় আসলো (দেয়া হলো) যখন সে বাইতুল্লাহর গিলাফের সাথে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে।

কিন্তু নিজের প্রান এবং তার শরীরের কোন অঙ্গের উপর যখন আশংকা হয় তখন শরীয়তে তার অনুমতি দিয়েছে।

প্রথম দলীল : (এর জন্য অনেক গুলো ঘটনা রয়েছে)

হযরত আম্মারে বিন ইয়াছের রা. এর ব্যাপারে তার ছেলে হযরত মুহম্মদ বিন আম্মার রা. বলেন, যে আমার পিতা আম্মারকে মুশরিকরা গ্রেফতার করল অর্থাৎ আমার আব্বকে ছাড়েনি । যতক্ষন না রাসূল সা. এর শানের খেলাফ কথবার্তা ও তাদের মুর্তির প্রশংসা করেন। তখন হযরত আম্মারে রা. এর খেদমতে উপস্থিত হলো এবং ঘটনা খুলে বলল। তখন রাসূল সা. জিজ্ঞাসা করলন তোমার আন্তরের অবস্থা তখন কেমন ছিলো? তিনি বললেন ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল। রাসূল সা. বললেন অর্থাৎ পূনরায় যদি কাফেররা গ্রেফতার কারে তখন তুমিও এমন কৌশল অবলম্বন করে কথা বলে নিজের প্রান রক্ষা করবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই আয়াত নযিল হলো।

مَنْ كَفَرَ بِاَّللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللهّٰ

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (سورة النحل-106)

যার উপর জবরদস্তি করা হয়, এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যাতিত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহ তা'য়ালা হতে অবিশ্বাসী হয়। তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি।

২য় দলীল :

হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা যখন কা'ব বিন আশ্রাফের হত্যার ব্যাপারে হলেন তখন তিনি রাসূল সা. কে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ এই বদবখত কে আমার শিকারে আনতে যদি আপনার শানের খিলাফ অশ্রাব কোন কথা যদি বলতে হয় তাহলে অনুমতি আছে কি না ? তখন রাসূল সা. বললেন হ্যাঁ (অনুমতি আছে)

৩নং দলীল:

এমনি ভাবে যদি আমরা লক্ষ করি তাহলে ুদখি যে ঈমানের পওে ইসলামে সরজেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রোকন হলো নামাজ, কিন্তু জিহাদেও ময়দানে যদি শত্রু পক্ষ থেকে এমন আশংকা করা হং যে যদি সাওয়ারী থেকে নেমে নামায পড়লে দুশমন আক্রমন করে বসবে, তাহলে সাওয়ারীর উপর থেকে নেমে নামায পড়ার অনুমতি আছে।

এবং যদি সাওয়ারীর থেকে নিচে নেমে নামায পড়ার কারনে দুশমনের পক্ষ খেকে আক্রমনের ভয় হয় তাহলে যে দিকে ইচ্ছা ও দিকে ফিরে নামায আদায় করতে পরবে।

এবং যদি এ আশংকা হয় যে, যদি যুদ্ধাবস্থায় নামায পড়লে শত্রু এসে আক্রমন করে বসবে। তাহলে শরীয়তের নির্দেশ হলো নামায কাযা কর কিন্তু জিহাদকে বিলম্ব করোনা। যেমন খন্দকের যুদ্ধে রাসূল সা. এর আসরের নামায এবং কোন কোন বর্ণনা মতে চার ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে গেল।

এমনি ভাবে রমাযানের রোজা যা নামাযের পর ইসলামের সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব বহন করে। যদি যুদ্ধের ময়দানে রোযা রাখার কারনে দূর্বলতা এসে যায় এবং শত্রুর মোকাবেলা করতে ব্যার্থ হওয়ার আশংকা হয় তাহলে ইসলাম বলে রোজা কাযা কর। কিন্তু জিহাদে বিলম্ব করার অনুমতি নেই।

ভেবে দেখুন (এখন আমাদের বলতে হবে) যে প্রাণের রক্ষার জন্য মুখে কুফরী কালিমা এবং রাসূলের শানে বেয়াদবি মূলক কথা বার্তা বলা, এবং জিহাদের মায়দানে সমস্যার সম্মুখিন হওয়ার ফলে নামায ও রোজা কাযা করা যায়া। তাহলে নিজের প্রাণকে রক্ষা করার জন্য দাড়ি মুন্ডানো যায়েজ হওয়ার ব্যাপারে কারো সন্দেহ থাকতে পারে?

শের

হ্যাঁ কোন অবস্থার সম্মুখিন হলে মুজাহিদরা দাঁড়ি ফেলে দিবে এটাতে মুজাহিদরাই ঠিক করবে। কিন্তু সবার ক্ষেত্রে রসূল সা. এর সূন্নতের সম্মান থাকা জরুরী এবং দাড়ি ফেলে দেয়ার দুঃখ কষ্ট অন্তরে অনুভব করা উচিত।

যেমন আমরা কোন কোন আরব মুজাহিদের দেখলাম, যখন তারা আফগান যুদ্ধ শেষে নিজ নিজ দেশে ফিরত যেতে লাগলেন। বিশেষ করে মিশরিয় মুজাহিদরা যখন তাদের এক মুষ্টি দাঁড়ি যা চেহারার সৌন্দর্য এবং নবুয়তের বাগানের ফুল, করাচিতে এসে তারা দাঁড়ি ফেলে দিতে লাগলেন। একদিকে তারা দাঁড়ি ফেলে দিচ্ছে। অন্য দিকে তাদের চোখ থেকে অনর্গত অশ্রু বের হচ্ছিল। ইনশাআল্লাহ এই অশ্রু

হোসনি মোবারকের জন্য ভেসে যাওয়ার কারণ হবে। আল্লাহ আমাদের দ্বীনের হেফাজত করুন। আমীন!

সতর্কবাণী:

জন সাধারণ মনে করে, দাঁড়ি রাখা সুন্নত, এবং দাড়ি এতটুকু লম্বা রাখাই যথেষ্ট, যে কেউ দেখলেই বলতে পারে যে, অমুক ব্যাক্তির দাঁড়ি আছে। যেটা মওদুদির মতবাদ ছিলো।

কিন্তু উপরের মতবাদটি সঠিক নয়, প্রথমত দাড়ি রাখা ওয়াজিব দ্বিতীয়, ঐ দাঁড়ি যা মুষ্টি থেকে কম হবে, তা সেভ করার মতই। দাঁড়ি সেভ করা আর এক মুষ্টি থেকে কম রাখার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এক মুষ্টির চেয়ে কম দাঁড়িকে সুন্নত মনে করাটা সেভ করার চাইতেও বড় গুনাহ। কেননা সে এমন দাঁড়িকে দাঁড়ি মনে করে। যাকে শরীয়ত দাঁড়ি হিসেবে গন্য করে না। এবং সে শরীয়তের হুকুমকে পরিবর্তন করতেছে। যা ঈমান থাকা না থাকা নিয়েও প্রশ্ন উঠায়। আর যেহেতু সে গুনাহকে গুনাহ মনে করেনা। তাই এমন ব্যাক্তির তাওবা ও নছিব হয়না। সে সারা জিবন আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত থাকবে। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করেন। এবং আমল করার তাওফিক দিন। আমীন!

সংশয় -৪৪

মুজাহিদগন তাদের মেহমান আগমনে অস্ত্র বাজির মাধ্যমে স্বাগত জানায়, শরীয়তে কি তার কোন ভিত্তি আছে?

সমাধান -১

হ্যাঁ স্পষ্ট প্রমান রয়েছে, যেমন হযরত আনাস রা. বলেন,

عن أنس ، قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة لقدومه فرحا بذلك ، لعبوا بحرابهم .
- سنن أبي داؤود: 674/2 باب في الغناء . رقم الحديث:4923 - مسند أحمد 12670 مسند أنس بن مالك 161/3

যখন রাসূল সা. মদিনায় আগমন করলেন তখন হাবশার লোকেরা খুশিতে তীরান্দাজের মাধ্যমে মোহড়া দেখালেন।

সমাধান -২

এমনি ভাবে এটা সর্ব স্বীকৃত কথা সমাজে বহুল প্রচলিত যে মেহমানের ক্ষেত্রে প্রত্যেকে নিজেদের সংস্কৃতির বিকাশ ঘটায়। যেমন যদি কোন মাদ্রাসায় কোন মেহমান আসে তখন মাদ্রাসা কতৃপক্ষ ছাত্রদের দিয়ে কোরআন তেলাওয়াত শুনায়। আর যদি কোন ক্লাবে কোন মেহমান আসে তাহলে ক্লাব কতৃপক্ষ তাদের খেলাধুলার মাধ্যমে স্বাগত জানায় যদি কোন হোটেলে কোন মেহমান আনে তখন সেখানে মূল্যবান খাবার উপস্থাপন করার মাধ্যমে স্বাগত জানায়। এমনি ভাবে মুজাহিদরাও নিজেদের বস্তু অর্থাৎ যুদ্ধের মোহড়ার মাধ্যমে হেমানদের স্বাগত জানায়। যা সামাজিক ভাবে বহুল প্রচলিত এবং জনগনের স্বভাবগত বিষয়। সমাজ প্রচলন এবং মানুষের প্রাকৃতির সাথে মিল রয়েছে।

সমাধান -৩

অস্ত্রের মহড়ার মাধ্যমে যেমন স্বাগত জানানো এটা যেমন মুজাহিদদের আনন্দ দেয় তেমনি কাফেরদেরও ভয়ের একটা প্রভাব পড়ে। যদিও তারা স্বচক্ষে দেখেনি কিন্তু তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে তাদের কাছে খবর পৌছে যায়। এবং মুজাহিদদেও খুশিতে কাফেররা জ্বলে পুড়ে মরে।

সমাধান -৪

এমনি এতে অনেক মানুষ অস্ত্রের প্রতি আগ্রহী হয় এবং অনেক নতুন ওলামায়ে কেরাম যারা অস্ত্র থেকে অনেক দূরে থাকার কারণে তাদের মধ্যে অস্ত্র ভিতি কাজ করে। আর এই মহড়া তাদের অস্ত্র ভিতি দূর করে দেয়। এছাড়া আরো অনেক উপকারিতা রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের মধ্য অস্ত্রের ভালোবাসা সষ্টি করে দিন। আমীন!

শের

সংশয় -৪৫

যদি নিজের জান ও মালের হেফাযত করা ওয়াজিবই হয় তাহলে হযরত আদম (আ.) এর ছেলে হবিল কেন নিজের আত্মরক্ষা করেননি। কেননা তার ভাই কাবিল যখন তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করল তখন হাবিল বলেছিলেন لَئِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لأَقْتُلَكَ (سورة المائدة-28)

'যদি তুমি আমার প্রতি তোমার হাত প্রসারিত কর আমাকে হত্যা করার জন্য, আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য আমার হাত তোমার প্রতি প্রসারিত করব না।

সমাধান -১

রঈসূল মুফাসসিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যদি তোমার অন্তরে আমাকে হত্যা করার ইচ্ছা হয়। তারপরও আমি তোমাকে হত্যা করার ইচ্ছা রাখিনা এটা দ্বারা এ উদ্দেশ্য নেয়া যে যদি তুমি আমাকে হত্যা কর আমি প্রতিহতও করবো না। এটা একেবারে ভ্রান্ত কথা।

সমাধান -২

আর যদি এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, যদি তুমি আমাকে হত্যা কর তাহলে আমি প্রতিহতও করবো না। তাহলে বলব এটা আগের শরীয়তে ছিলো, এখন তা রহিত হয়ে গিয়াছে।

বিঃ দ্রঃ

হযরত হাবিলকে এমন অবস্থায় হত্যা করা হয়েছে যখন তিনি শুয়ে ছিলেন।

সংশয় -৪৬

অনেক সময় দেখা যায় কোন এলাকায় শহীদদের মৃত দেহ আনা হলে তার শরীর থেকে সুগন্ধি আসে না। তখন মানুষ প্রশ্ন করে যে, সে শহীদ না। কেননা যদি সে সত্যিকারে শহীদ হতো তাহলে শরীর থেকে সগন্ধি আসেনা কেন?

সমাধান -১

প্রথমে এটা ভালো ভাবে অনুধাবন করা উচিত যে শহীদের শরীর থেকে যে সগন্ধি বের হয় এটা তার কারামাত আর কারমাত এটা আল্লাহ প্রদত্ত জিনিস যা বন্দার হাতে প্রকাশ পায়, এবং এবং এতে বন্দার কোন হস্তক্ষেপ চলেনা। একারণে কোন শহীদের শরীর থেকে সগন্ধি না আসা তার শাহাদাতের মধ্যে ত্রুটির কারনে নয়। সর্বোচ্চ এটা বলা যেতে পারে যে, এ কারামত এই শহীদ থেকে প্রকাশ পায়নি।

সমাধান -২

দ্বিতীয় কথা হলো শহীদের শরীর থেকে খুশবু আশাটা শাহাদাত কবুল হওয়ার আলামত নয়, এবং সুগন্ধি আসাটা জরুরীও না। এবং কোন হাদিসে শাহাদাতের ফযিলতে এটা আসেনি যে শহীদের শরীর থেকে সুগন্ধি বের হবে।

সমাধান -৩

শহীদের শরীর খেকে সুগন্ধি আসাতো দূরের কথা তাঁর শরীরটা শাহাদাতের পর অবিকল বকি থাকা এবং মাটি না খাওয়াও জরুরী নয়। এটা শুধু আম্বিয়া আ. এর সাথে খাছ। আম্বিয়া আ. ছাড়া চাই সে শহীদ হোক অথবা ছালেহ হোক মাটি শরীর খেয়ে ফেললেও শহীদ ও ওলি হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। একারনে কোন শহীদ থেকে সুগন্ধি না অসলে অথবা তার শরীর মাটি খেয়ে ফেললে তার শাহাদাতের ব্যাপারে সন্দেহ না করাটা উচিত। আল্লাহ আমাদের দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন!

সংশয় -৪৭

মুজাহিদদের জন্য ব্যাপক আইন করা উচিত, যেন তারা অস্ত্র নিয়ে মসজিদে প্রবেশ না করে। কেননা এতে মানুষের অস্ত্রের ভয়ে মসজিদে আসা কমে যাবে, এতে মানুষ কম আসার কারণে অস্ত্র বহন কারীরা গুনাহগার হবে। এছাড়াও অস্ত্রের কারণে নামাযে খুশুখুজুর মধ্যে সমস্যা হয়। এবং মানুষের অন্তর নামায থেকে অস্ত্রের দিকে চলে যায়।

সমাধান -১

আল্লাহু আকবার! দ্বীনের ব্যাপারে কত দরদী অতচ অস্ত্রের ব্যাপারে এত ঘৃণা! প্রকৃতপক্ষে আমাদের অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত হওয়া ছেড়ে দেয়ার করণে আমাদের মনে এই প্রশ্ন জেগেছে, অন্যথায় এই কুমন্ত্রনা অন্তরে কখনো আসতো না।

এই কুমন্ত্রনাকে দূর করার লক্ষে অস্ত্রের এমন ভাবে ব্যাপকতা লাভ করা উচিত যেন প্রত্যেক নামাযীর কাঁধ অস্ত্র সজ্জিত থাকে। যেমনি ভাবে নামাযীর জন্য টুপি ও পাগড়ি সৌন্দর্য তেমনি ভাবে অস্ত্রের সৌন্দর্যও ব্যাপক হওয়া উচিৎ।

কেননা অস্ত্রের এভাবে ব্যাপক হওয়ার কারনে অস্ত্রের প্রতি ঘৃণা ও ভয় কমে যাবে। এর পর কোন নামাযী অস্ত্রের কারনে জামাতের সহিত নামায ছাড়বে না। এবং তার খুশুখুজুতেও কোন সমস্যা হবে না। কেননা কোন জিনিস যদি ব্যাপকতা লাভ করে, তাহলে তার থেকে ঘৃণা ও ভয় দূর হয়ে যায়।

শের

আপনি দেখুন বর্তমানে পাকিস্থানে বিভিন্ন গোত্রের মানুষের কাছে কি পরিমান অস্ত্র আছে। কই তাদের তো জামাতের লোকজন কম হয় না? এবং তাদের খুশুখুজুতেও কোন প্রভাব পড়ে না।

এখন আমাদের চিন্তা করা উচিত, যে আমরা কি মানুষকে অস্ত্রের কারনে সমস্যা হওয়ার কথা বলব? না মানুষকে অস্ত্র নিয়ে নামায পড়তে উৎসাহিত করবো?

উদাহরন:

এর দৃষ্টান্ত এভবে দেয়া যায় যে, মনে করুন আমাদের এলাকায় কোন মাওলানা বা মুজাহিদ এসেছে যার কারনে তার দাঁড়ি দেখে বাচ্ছারা ভয়ে চিৎকার শুরু

করল। এখন এ সমস্যার সমধান দু ভাবে হতে পারে। একটাতো নাউজুবিল্লাহ যা কোন ক্রমেই যায়েয হবে না তা হলো, যাদের দাঁড়ি আছে তাদের দাঁড়ি ফেলে দেয়া, দ্বিতীয় সমাধান হলো, এলাকা বাসী সবাই দাঁড়ি রেখে দেয়া। যাতে শিশুরা দাঁড়ি ওয়ালাদের দেখলে চিৎকার না করে।

একটা ঘটনা শুনেছি এর সত্যতা কতটুকু জানিনা, আফগানিস্থানে যুদ্ধ চলাকালিন সময়ে এক বৃটিশ খৃষ্টান আফগানিস্থানে আসলে বচ্ছারা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে, এবং তারা দুষ্টোমিতে বললো, এটা কোন ধরনের মানুষ, তখন তারা বাচ্ছাদের দুষ্টোমির কারন জিজ্ঞাসা করিলে তারা উত্তর দেয় তাদের কাছে দাঁড়িহীন পুরুষ কল্পনাতেই আসেনা। একারণে তারা তোমাদের ব্যাপারে এতে আগ্রহী কেননা তোমরা তাদের দৃষ্টিতে পুরুষও না মহিলাও না।

এখন এ ব্যপারে আমরা রাসূল সা. ও সাহাবাদের আমল দেখব তাহলে আমাদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

রাসূল সা. মসজিদে অস্ত্র আনার আদব বর্ণনা করেছেন। হাদীছে এসেছে,

أَبَا بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّىُ ّاللہ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا لَا يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا.
الصحيح للبخاري: 64/1 -بَاب الْمُرُورِ فِي الْمَسْجِدِ. رقم الحديث:452 - الصحيح لمسلم 328/2 -باب أَمْرِ مَنْ مَرَّ بِسِلاَحٍ فِى مَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنَ الْمَوَاضِعِ الْجَامِعَةِ لِلنَّاسِ أَنْ يُمْسِكَ بِنِصَالِهَا. رقم الحديث:6622 - صحيح ابن حبان: 527/4 باب المساجد. رقم الحديث:1649

হযরত বুরদা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তীর নিয়ে মসজিদে আসবে সে যেন তীরের অগ্রভাগ বেধে নেয়। যাতে কোন হতাহত না হয়। (সহীহ বুখারী-১)

সমাধান -৩

এমনকি রাসূল সা. এ পবিত্র যমানায় মসজিদে আস্ত্র দান করা হত।

عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها وقال ابن رمح كان يصدق بالنبل .
- صحيح مسلم :328/2 باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها. رقم الحديث:6620
- مسند أحمد : 14781 مسند جابر بن عبد الله . - سنن أبي داؤود : 349/1 باب في النبل يدخل به المسجد .

রাসূল সা. থেকে বর্ণিত জনৈক সাহাবি মসজিদে তীর সদকা করছিলেন। তখন রাসূল সা. বললেন, তার অগ্রভগ ধরে রেখ যাতে কেউ যখম না হয়। এমনকি রাসূল সা. ঈদুল আযহার খুতবা কামানের উপর ভর করে দিয়েছিলেন। (মুসান্নাফে আ:রাজ্জাক-৩)

সমাধান -৪

আরেকটু অগ্রসর হলে আমরা দেখি রাসূল সা. এর মুবারক সময়ে সাহাবায়ে কিরাম রা. মসজিদে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতেন। যেমন উম্মল মুমিনিন হযরত আয়েশা রা. বলেন,

عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير : أن عائشة قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه و سلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم . زاد إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه و سلم والحبشة يلعبون بحرابهم

- صحيح البخارى: 65/1 باب أصحاب الحراب في المسجد 65/1 رقم الحديث:454 ،
454 - مسند أحمد : 360/17 رقم الحديث: 24414،

আমি নবীজিকে আমার হুজরার দরজায় দেখেছি, একদিন হবশার লোকেরা মসজিদে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন। তিনি তা পর্যবেক্ষণ করছিলেন

সমাধান -৫

ফোকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, যেসব অঞ্চল জিহাদের মাধ্যমে বিজয় হয়েছে সেখানের খতিবগণের তলোয়ার হাতে খুৎবা দেয়া উচিত। যাতে মানুষ জানতে পারে যে এঅঞ্চল তলোয়ারের মাধ্যমে বিজয় হয়েছে। আর যারা ইসলাম থেকে ফিরে যেতে চায় তারা যেন এই চিন্তা করে যে, মুসলমানদের হাতে এখনো তলোয়ার আছে। এবং এই তলোয়ার ইসলামের অপব্যাখ্যা কারীদের মস্তিষ্ক ঠিক করে দিবে। (বিস্তারিত আর দেখুন ফতুয়ায়ে আলমগীরী-১)

এখন যদি ওলামা ও সুলাহাগণ খুৎবায় তলোয়ার হতে নেয়ার স্থলে তলোয়ারকেই ইসলামের জন্য অপমান জনক মনে করে , তলোয়ারকে আখলাক এবং যুহুদও তাক্ওয়ার পরিপন্থি আখ্যা দেয়, ইসলামের জন্য এটাকে প্রতিবন্ধক মনে করে। তবে কুফুর বিস্তার না করে আর কি বিস্তার লাভ করবে ?

সম্মানিত পাঠক! তাই আসুন আমরা চেষ্টা করি এবং দোয়া করি আল্লাহ যেন মুসলমানদের অন্তরে অস্ত্রের এমন ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেয় যেন জীবিত থাকার জন্য জীবনের মায়াও ভালোবাসা থাকে। আমীন!

সংশয় -৪৮

আমরা যদি আমাদের সাথে তলোয়ার নিয়ে চলাফেরা করি। তাহলে ইসলামের ব্যাপারে মানুষের অন্তরে খারাপ চিত্র ফুটে উঠবে এবং ইসলামের ব্যাপারে মানুষের ঘৃণা ও অবহেলা জন্মাবে। কাফেররা এটা বলার সুযোগ পাবে যে, ইসলাম সংস্কৃত ধর্ম নয়।

সমাধান -১

আমাদের জন্য প্রত্যেকটা বিষয়ে রাসূল সা.ও সাহাবাগণের আমলই প্রমাণ স্বরুপ। রাসূল সা. সর্বাধিক বাহাদুর হওয়া সত্তেও নিজের সাথে অস্ত্র রাখতেন।

হাদীসে বর্ণিত আছে একবার মদিনাতে রত্রিবেলা বিকট আওয়াজের কারণে লোকেরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আওয়াজের দিকে ছুটে গেলে সেখানে সবার অগ্রে ছিলেন রাসূল সা.। তিনি লোকদেরকে সান্তনা বানী শুনাতে লাগলেন। এসময় রাসূল সা. আবু তালাহা রা. এর গদি বিহীন ঘোড়ায় সওয়ার ছিলেন। এবং গর্দান মোবারকে তলোয়ার ঝুলন্ত ছিলো। (সহীহ বুখারী-১/৪০৭)

এবার আমরা এব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের আমল কি ছিলো তা দেখার চেষ্টা করব।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. বন্দি চুক্তির ব্যাপারে রোম সম্রাটের নিকটে গেলেন। যখন তিনি সম্রাটের বাসভবনের নিকট পৌছলেন। তখন কাফের সেনাপতি

বলল আপনি এতক্ষনে সম্রাটের বসভবনের নিকট চলে এসেছেন। অতএব আপনি ঘোড়া থেকে নেমে যান এবং তলোয়ার পরিত্যাগ করুন। তখন খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. উত্তর দিলেন। ঘোড়া থেকে নেমে যাবো কিন্তু আমরা কখনো তলোয়ার পরিত্যাগ করব না। কেননা তলোয়ারেই রয়েছে আমাদের সম্মান। আর কেনইবা আমরা ঐ সম্মানকে অবহেলা করবো যা নিয়ে আমাদের নবী প্রেরিত হয়েছেন? (ফুতুহুশ শাম)

মিশর বিজেতা হজরত আমর ইবনুল আস রা. যখন তলোয়ার নিয়ে রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করতে লাগলেন, তখন নিরাপত্তা কর্মীরা তার গর্দান থেকে তলোয়ার মিতে চেষ্টা করলে তিনি বললেন আমি এখান থেকে ফেরত যেতে প্রস্তুত কিন্তু আমার তলোয়ার ব্যতীত আমি প্রবেশ করতে পারব না ।

তোমরা হয়তো জাননা আমরা ঐসব লোক যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের মাধ্যমে সম্মাণ দান করেছেন ,ঈমান দ্বারা সাহায্য করেছেন এবং তলোয়ারের মাধ্যমে আমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত এবং মজবুত করেছেন। এবং এটা ঐ তলোয়ার যার মাধ্যমে আমরা মুশরিক ও অহংকারীদের মস্তিষ্ক ঠিক করেছি। (ফুতুহুল মিসর)

সমাধান -২

যদি আমরা অস্ত্র বহণ করা ছেড়ে দেই এবং অস্ত্র ছাড়া চলাফেরা করি, তাহলে কাফেরদেও মনের আকাংখা পূর্ণ হবে যেমন কুরআন কারীম আমাদের প্রতিনিয়ত আমাদের চিৎকার দিয়ে বলে

وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً (سورة النساء-102)

......কাফিররা কামনা করে যদি তোমরা তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও আসবাব-পত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও তাহলে তারা তোমাদের উপর একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়বে।......

এ কারনে মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে:

وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ (سورة النساء-102)

এবং তারা যেন তাদের সতর্কতা অবলম্বন ও অস্ত্র ধারণ করে।............

এখন আমাদের চিন্তা করা দরকার আমরা অস্ত্রহীন জীবন গড়ে কি আল্লাহকে খুশী করতেছি? না কাফেরদের মনের আশা পূরণ করতেছি। বিষয়টা শুধু কি এখানেই শেষ তা নয়। কুরআন কারীম আমাদের বলতেছে , কাফেররা ততদিন পর্যন্ত তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হবেনা যতদিন তোমরা তাদের দ্বীনের অনুসারী না হবে।

সমাধান -৩

আমি বলি আমাদের মধ্যে কাপুরুষতার রোগ অনেক বেড়ে গিয়েছে, যদি আমরা সত্যিই আমাদের এ রোগ দূর করতে এবং নিরাপত্তা লাভ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়তাম তাহলে আমাদের একমাত্র পথ হল যুদ্ধ-জিহাদের পথ বেছে নেয়া। কেননা বীরত্ব কোন দরবারের অনুদানের প্লেটে বন্টন করা হয় না।

তাই বন্ধুরা আসুন আমরা এই পথে ধাবিত হই, যে পথের দিশা দিয়ে আমাদের প্রাণের নবী রাসূল সা.। আল্লাহ আমদের সবাইকে জিহাদে যাওয়ার তাওফীক দিন এবং আমাদের কাপুরুষতা দূর করে দিন। আমীন!

কয়েকটি চিরন্তন বাণী:

তোমরা হয়তো জাননা আমরা ঐসব লোক যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের মাধ্যমে সম্মাণ দান করেছেন ,ঈমান দ্বারা সাহায্য করেছেন এবং তলোয়ারের মাধ্যমে আমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত এবং মজবুত করেছেন। এবং এটা ঐ তলোয়ার যার মাধ্যমে আমরা মুশরিক ও অহংকারীদের মস্তিষ্ক ঠিক করেছি।

- হযরত আমর ইবনুল আস রা.(ফুতুহুল মিসর)

তোমরা হয়তো জাননা অমরা সেই বাহাদুর জাতি যারা নিজেদের তলোয়ার অন্যদের হস্তান্তর করিনা এবং তোমরা ভালভাবে জেনে রেখ আমাদের নবীকে তলোয়ার দিয়ে পাঠানো হয়েছে। এবং আমাদেরকে আমাদের নবী এ তলোয়ার পরিয়ে গিয়েছেন। সুতরাং যে সম্মান আমাদের আল্লাহ ও রাসূল দিয়েছেন,আমরা তা থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হতে পারি না ।

- হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. (ফুতুহুশ শাম)

আমি জানি না ইসলামকি তলোয়ারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা হয়েছে না উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে? তবে আমি ইসলাম রক্ষার জন্য তলোয়ারকে জরুরী মনে করি।

- কুদ্স বিজয়ী সেনাপতি সালাহুদ্দীন আইয়ুবী।

ইবী এবং মনুষের চিন্তাধারা এক নয়। কাউকে আল্লাহ কিতাব দিয়ে পাঠিয়েছেন আর কাউকে লোহা দিয়ে পাঠিয়েছেন।

- আল্লামা ইদ্রীস কান্দলবী রহ.।

শের ///

সংশয় -৪৯

সাহসীকতা নয় বরং হটকারিতা এবং লজ্জাহীনতা বশতঃ আমরা বলে থাকি আল-হামদুল্লিাহ দুনিয়াতে এখন জিহদ ছাড়াই ইসলাম প্রচার হচ্ছে। এবং কাফেরেরা ইসলাম গ্রহণ করতেছে। তাহলে জিহাদের কোন প্রয়োজনিতা আছে কি? বরং জিহাদ তো এখন ইসলাম প্রচারে বাধা হয়ে দাড়িয়েছে। কেননা কাফেরেরা বলে ইসলাম অনেক ভালো ধর্ম, এখানে অনেক ভালো ভালো হুকুমাবলি আছে। তাই বলে এই লড়াই এবং বাড়াবড়িতো ঠিক না। এবং ভয় হয়। এটাকে আমরা বর্বরতা মনে করি।

সমাধান -১

কিছু মানুষের একক ভাবে ইসলাম গ্রহণ করাকে ইসলামের বিজয় হওয়াতো দূরের কথা এটাকে ইসলামের প্রচারও বলা যায় না। ইসলামের প্রচার ও প্রসার ওটাই যা কুরআনে বর্নিত আছে।

إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللهِ أَفْوَاجاً (سورة النصر1-2)

যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে, * আর তুমি লোকদেরকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে,

এবং ইসলামের বিজয়ের পরিষ্কার পথ হলে কুফুর না থাকা আর যদি থাকেও, তাহলে কর দেয়ার মাধ্যমে জীবন ভিক্ষা চেয়ে অপমানের সাথে থাকবে।

حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (سورة التوبة-

(29

বিষয়টাতো এমন হয়ে গেল, যেমন জিকরী ফেরকারা মনে করে, নামাজের দ্বারা আল্লাহ তা"য়ালার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা"য়ালার জিকির কেননা বর্ণিত আছে

(14-سورة طه) وَأَقِمْ الصَّلاةَ لِذِكْرِي যে নামায আদায় কর আমার জাকরের জন্য। যখন নামায ছাড়াই আল্লাহর জিকির হয়ে যায়। তাহলে এ অযু, গোসল, কিয়াম, ক্বিরাত, রুকু, সিজদা, এবং ইমাম মসজিদের কি প্রয়োজন? এটা তো জনগনের অর্থ নষ্ট করা বৈ কিছুই না।

হাঁ আমরা ঐ সব লোকদের কাফের বলি যারা জিহাদের অস্বিকার কারী কিন্তু যারা জিহাদের অস্বিকার করে না বরং বিভিন্ন ধরনের মনগড়া ব্যাক্ষা করে, এবং তারা তাদের দ্বীনের ভালোবাসার দাবিদার ও ঠিকাদার মনে করে। তাই জিকরী ফেরকার যে হুকুম হবে এমন দ্বীনদারদের ক্ষেত্রে একই হুকুম হবে বলে মনে করি।

সমাধান -২

মূলকথা এবং চিন্তার বিষয় হলো, আমরা দেখবো জিহাদের হুকুম শরীয়তে কেন আসলো এবং কাফেরদের সঙ্গে কেন জিহাদ করা হয়, যদি আমরা এ বিষয়গুলো চিন্তা করি তাহলে সব প্রশ্নের আপনা আপনিই উত্তর হয়ে যাবে।

এজন্য মাওলানা ফজল মুহাম্মদের কিতাব "ফিতনায়ে ইরতিদাদ আওর জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ " যাতে তিনি লিখেছেন।

কাফেরদের সাথে আমরা কেন জিহাদ করব?

আল্লাহ তা"য়ালা মানষ সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদাতের জন্য, মানুষ আল্লাহ তা"য়ালার গোলাম, আর আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের মালিক যে সকল লোক আল্লাহ কে মানে না, এবং ইবাদাতও করে না বরং প্রকাশ্য বিদ্রোহ করে। এবং কুফুর ও শিরকে থেকে

আল্লাহ তা"য়ালার বিশ্বাসকে নিজেদের করে নেয়। এসব লোক মানুষের কাতার থেকে পশুর কাতারে শামিল হয়ে যায়।

أُوْلَـئِكَ كَـالأَنْـعَـامِ بَـلْ هُمْ أَضَلُّ (سورة الأعراف-179)

...... তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তারা আরো অধিক নিকৃষ্ট।....

অর্থাৎ তারা পশুর চেয়েও অধম হয়ে যায়।

এখন আল্লাহর পক্ষ হতে ঐ সব মানুষদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যারা আল্লাহর ইবাদাত করে ও আল্লাহর কাছে প্রতিশ্রুত বান্দা যে ঐ সব খোদাদ্রহিদের প্রাণ হায়ওয়ান জানোয়ারের মত, যাকে জবাই করা জায়েয আছে এবং তার ক্রয় বিক্রয় ও জায়েয, এবং ঘরের সেবয় লাগানো ও জায়েয আছে। ঠিক তেমনি আল্লাহ তা"য়ালা ঐসব মানুষের জান-মালের ব্যাপারে মুসলমানদের অনুমতি দিয়েছেন। কেননা এসব লোক আল্লাহ দ্রোহী হয়ে গেছে। এবং এই আল্লাহ দ্রোহী হওয়ার কারণে আল্লাহ তা"য়ালা তাদের কে হত্যা ছাড়াও গোলাম বান্দি বানানো জয়েয করে দিয়েছেন। তবে শর্ত হলো জিহাদের ঘোষনা হতে হবে।

এবং ঐ মাসআলাকে উসূলে ফেকাহ বীদরা গোলাম বানানোর কারন সূমহের মধ্যে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছে।

উদাহরণ:

এর দৃষ্টান্ত হলো, যেমন একটা রাষ্টে বিদ্রোহ হলো এবং সেনাবাহীনি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলো, একটা গ্রুপ বিদ্রোহী হয়ে গেল, আরেক গ্রুপ সরকারের আনুগত রয়ে গেল, তখন সরকার তার পক্ষের সেনাহিনীকে আদেশ দেয় তোমরা বিদ্রোহীদের হত্যা কর, প্রত্যেক প্রকার শাস্তির ব্যাবস্থা কর। তাদের ধন-সম্পদকে নিয়ে নাও, এবয় তাদের শেষ করে দাও।

এখন সরকারী বহিনী জান বাজী রেখে রড়াই কওে এবয় বিদোহীদের দূর্গ শেষ করে দেয়, তখন পৃথীবি বাসি তা সমর্থন ও বাহ্বাহ্ দিয়ে থাকেন এমনি ভাবে মুসলমানরাও আল্লাহর পতিশ্রুত সৌনিক তাদের ও আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ রয়েছে, যে বিদ্রোহী গ্রুপ অর্থাৎ যারা কাফের তাদেও হত্যা কর। এবয় তাদের জান-মাল বিবি বাচ্ছা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে গোলাম বানিয়ে দাও কেননা এরা আমার গোলাম এখন তোমাদের গোলাম বনিয়ে দিলাম।এখন যদি বিদ্রোহী সেনারা সরকারী সেনাদের হত্যা করে অথবা বন্ধি করে। তখন তারা একটা জোরালো দাবী উত্থাপন করতে পারে এই বলে যে, আমরা আনুগত্যরা কেন মারা যাচ্ছি? কিন্তু যদি কাফেরদের হত্যা করা হয়, তাহলে আঈন অনুযায় তাদের চিৎকার করার অধিকার হারিয়ে ফেলে। কেননা তারা আল্লাহ দ্রোহী, ফলে তারা দাবি উত্থাপন হতে বঞ্চিত।

একারনে ইমামুল মাকুলাত ও মানকুলাত এবং শয়খে তাফসির মাওলানা ইদ্রীস কান্ধলভী রহ. বলেছেন, অবশ্যই উপদেশাবলীর একটা প্রভাব আছে তবে যাদের সুস্থ মস্তিস্ক ও সুস্থ বিবেক রয়েছে তাদের জন্য।

আপনি খুব ইখলাসের সাথে দরদ মাখা বক্তব্য অসুস্থ বিবেক ওয়ালাদের কাছে জতই আলোচনা করেন। কখনো তাদের অন্তরে প্রভাব ফেলবে না।

বনী আদমের চিন্তাধারা ভিবিন্ন ধরনের হয়। একরনেই আল্লাহ কারো জন্য কিতাব পাঠিয়েছেন আর কারো জন্য লোহা পাঠিয়েছেন।

সংশয় -৫০

শুধু এই শতাব্দিতে নয় বরং প্রত্যেক শতাব্দিতে ইসলামকে নিয়ে বড় বড় প্রশ্ন গুলোর মধ্যে এটাও একটা প্রশ্ন করা হয় যে, জিহাদের ফলাফলের দিকে তাকালে আমরা দেখি যে, জিহাদের মাধ্যমে মানুষকে অপমান ও স্বাধিনতা হরণ করা হয়। কেননা জিহাদের মাধ্যমে পুরুষদেরকে গোলাম বানিয়ে পুরুষদের মতামতকে জন সাধারণের মাঝে বিক্রি করা হয়, এবং তার থেকে সেবা নেওয়া হয়। এবং তার ব্যক্তি জীবন শেষ করে দেয়া হয়। এবং মহিলাদেরকে বান্দি বানানো হয় এবং বিবাহ ব্যাতিত তার আয়ত্তে রাখা ও তাকে ব্যাবহারের অনুমতি দেয়া হয়।এটা তো একেবারেই মনুষত্বের অপমান বৈ কিছুই নয়।

সমাধান -

আমি নিজ থেকে কিছু বলার চেয়ে শাইখুল মাকুলাত ও মানকুলাত শাইখুত তাফসির মাওলানা ইদ্রিস কান্ধলভী রহ. এর কিতাব "সীরাতে মুস্তফা" এর ২য় খন্ড থেকে এর উত্তর হুবহু তুলে ধরব।

ইসলাম ও গোলামের মাসআলা:

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে সম্মান মানুষকে দিয়েছেন, তা অন্য কোন সৃষ্টিকে দেননি। নিজের বিষেশ সিফাতে কামালিয়া, যেমন শুনা,দেখা, কথাবর্তা বলা এবং ইচ্ছার প্রকাশ স্থল এবং আলোকিত ঘর বানালেন এবং তার প্রতিনিধিত্বের দ্বারা সম্মানিত করেছেন। এবং ফেরেস্তাদের দ্বারা সিজদা করালেন সমস্ত সৃষ্টি থেকে তাদেরকে সম্মান দিয়েছেন। এমনকি অভিসপ্ত ইবলিস ও বলে উঠেছে هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ। আপনার যে, সৃষ্টি কুলকে তার জন্য সৃষ্টি করেছ আর তাকে আপনারই ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছ।

তাকে সৃষ্টি করে তাকে স্বাধিনতা দান করেছ এবং সারা পৃথীবি তার অধিনে পরিচালনার ক্ষমতা দিয়েছে। خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً। কিন্তু যখন এই মুর্খ ইনসান গুলো নিজের সৃষ্টি কর্তার আনুগত্য ওয়াজিব হওয়াকে অস্বিকার করে। অথবা কুফুরির মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ ঘোষনা করে এবং নবী রাসূলদের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহ করতে যুদ্ধাস্থলে চলে আসে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে সৃষ্টিগত যত সম্মান ও ইজ্জত দিয়েছে। সবটুকু যেন সে ধলার সাথে মিশিয়ে ুদয়েছে। ফলে যে স্বাধিনতা দিয়ে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা নিমিশেই নিয়ে নেওয়া হয়েছে।

এবং আল্লাহ তায়ালা এই অহংকারী ও আল্লাহ দ্রোহীকে তার নেককার বান্দাদেও যারা তার আঈনকে প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে তাদের গোলাম বানিয়ে দিয়েছেন। এবং আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এ অধিকার দিয়েছেন যে, যেমনি ভাবে চতুষ্পদ জন্তুর এবং মালিকানাধীন সম্পদ যেভাবে ইচ্ছা ক্রয় বিক্রয় করতে পার তেমন এদেরকে ক্রয় বিক্রয় এ বন্ধ রাখার অনুমতি পুরা আছে। এবং এরা তোমাদের অনুমতি ব্যতিত সেচ্ছায় কোন জিনিসে পরিবর্তন করতে পরবে না।

গুনাহের শাস্তি তার প্রকার বেদের দিকে লক্ষ রেখে নির্নয় করা হয়। যে মাপের গুনাহ হবে ঐ মাপেরই শাস্তি হবে।

যিনা এবং চুরির শাস্তি মাত্র কয়েক দিন স্থায়ী থাকে এর পর মুক্তি পেয়ে যায়। কেননা অন্যায়টা সৃষ্টির বিরুদ্ধাচরণ, কিন্তু বিদ্রোহের গুনাহ মাফ করা যায় না। কেননা ওটা রাজত্বের বিরুদ্ধাচরণ এবং এটা রাজত্বের অহংকারী করা এবং অবাধ্য হওয়া। একারনেই কোরআনে বর্ণিত আছে,

إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (سورة النساء-48)

নিশ্চই আল্লাহ তা"য়ালা তার সাথে শিরিক করার গুনাহ ক্ষমা করবেন না এ ছাড়া যত গুনাহ আছে, যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।

কেননা কাফের এবং অস্বিকারকারী প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যকে এবং তার পাঠানো আঈনকে পালন করাকে আবশ্যক মনে করে না। এ কারনেই এরা আল্লাহ দ্রোহী এখন তারা জন্মগত অথবা যুক্তিগত অথবা চরিত্রিক ভাবে তাদের থেকে এমন আমল প্রকাশ পায়, যা শরীয়তের আওতায় চলে আসে। তবুও এটা আনুগত্য ও অনুশরন নয়। বরং এটা বহ্যিক দৃষ্টিতে শরিয়তের সাথে মিলে যাওয়া প্রকৃত পক্ষে এটা বিদ্রোহ ও বিরোধিতা। এবং এটা সুস্পষ্ট কথা যে প্রকৃত পক্ষে পক্ষে বিরোধিতা। এবং পরিপূর্ন অবাধ্যতা এবং আক্বিদা গত বিচ্যুতি ধাকা সত্বেও জাহেরী কিছু মিলের কোন গ্রহন যোগ্যতা থাকতে পরে না?

একারনেই ঈমান এবং আত্ম সমর্পন ব্যতিত আল্লাহর কাছে ক্ষমা পাওয়া অসম্বভ, এবং সমস্ত ভালো কাছ এবং উত্তম চরিত্র ঈমান ব্যাতিত বেকার। (কোন কাজে আসবে না)

কিন্তু মু'মিনের ব্যাপারটা ভিন্ন কেননা তার বিরোধিতাটা সাময়িক, কেননা সে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ ও রাসূল সা. এর আনুগত্যকে জরুরী। যখন তার থেকে কোন গুনাহ প্রকাষ পেয়ে যায়। তখন সে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চেয়ে নেয় এ জন্যই আল্লাহ তা"য়ালা বলেন,

وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ (سورة البقرة-221)

আর অবশ্যই একজন মুমিন দাস একজন মুশরিক পুরুষের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে। (কেননা) তারা তোমাদেরকে আগুনের দিকে আহ্বান করে,

জীবন উৎসর্গকারী ও অঙ্গীকারাবদ্ধ ব্যাক্তিকে আল্লাহ দ্রোহী এবং গাদ্দারের সমমান দিয়ে দেওয়া, যক্তি এবং বিবেক এবং আল্লাহর আঈনে স্পষ্ট জুলুম। দুনিয়াতে

কোন রাজত্ব এমন আছে? যেখানে আনুগত্য ও পাপিষ্টদের হুকুম পালন করা হবে? আল্লাহ তা"য়ালা বলেন।

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (سورة القلم-٣٥)

আমি কি আনুগত্যদের কে পাপিষ্টদের সমান বনিয়ে দিব? (যে উভয়ের হুকুমে কোন পার্থক্য হবে না?)

সব সভ্য সরকারই বিদ্রোহী এবং রাজনৈতিক অপরাধির শাস্তি চোর বদমাশ ও ধোকাবাজ দের থেকে বেশি দিয়ে থাকে।

যার বিরুদ্ধে রাষ্টদ্রোহ অপরাধ প্রমানিত হয়েছে। তার এক মাত্র শাস্তি মৃত্যু দন্ড কিংবা আজিবন কারাগারে বন্দি থাকা। যদিও যে কোন ধরনের অপরাধই অপরাধ হিসাবে গন্য করা হয়। কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তারা অনেক বড় করে দেখে কেননা তারা সরকারের পতন কামনা করে। দুনিয়াতে যত ধরনের রাজনৈতিক মতবাদ জন্ম নিয়েছে সবার দৃষ্টিতে রাষ্ট্রদ্রোহ থেকে বড় কোন অপরাধ নেই তাদের দৃষ্টিতে রষ্ট্রদ্রোহ এর তুলনায় চুরি ডাকাতি কোন অপরাধই না। রাষ্ট্রের সর্বস্বীকৃত আঈন হলো বিদ্রোহির ব্যক্তি স্বাধীনতা সহ সব ধরনের স্বাধীনতা হরণ করা হবে। এবং তার সকল ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে। এর পর তাকে লাঞ্চিত ও অপদস্ত করে তার সথে পাশবিক অচরণ করা হবে। যদিও এ রাজনৈতিক অপরাধ যতই উপযুক্ত এবং ব্যক্তি যতই অভিগ্য হউক না কেন। এমকি অনেক সময় দেখা যায় তার জ্ঞান-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা প্রধানমন্ত্রিকেও হার মানায়।

যখন এই অনর্থক ও ভিত্তিহীন রাজনিতিতে রাষ্ট্র প্রধান বিদ্রোহীদের সব অধিকার হরণ করার অধিকার রাখে। তখন উভয় জাহানের সৃষ্টিকর্তা মাহান রাব্বুল আলামীনের প্রদত্ত স্বাধীনতা ও অধিকার বিদ্রোহীর থেকে উঠিয়ে নিলে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে।

সারকথা:

যেহেতু গোলাম হওয়া আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ অর্থাৎ কুফুরীর শাস্তি এক তাই তাওরত ইঞ্জিলে ও এর আলোচনা পাওয়া যায়। বরং পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম নেই। যাতে গোলাম বান্দির বিষয় নেই। এতে বুঝা গেলো গোলামের মাসআলা সকল ধর্মে ঐক্যমতে স্বীকৃত।

গোলাম বান্দির মাসআলা যদি কবিহ লি যাতিহি হত তাহলে কোন শরীয়তে এটা যায়েয হতো না।

তাওরত ও ইঞ্জিল থেকে বুঝা যায় হযরত ইব্রাহিম আ. থেকে হযরত ঈসা আ. পর্যন্ত সকল নবী গোলাম বান্দিকে যায়েয রেখেছেন।

নাউযুবিল্লাহ! যদি গোলাম-বান্দি কবিহ লি যাতিহি হতো, এতে কোন অমানুষত্য্য থাকত অথবা স্পর্ষ কাতর কোন বিষয় থাকত কিংবা যদি ফিতরতের বহির্বুত হত তাহলে রাসূল সা. মারিয়া ক্বিবতিয়া রা. কে বান্দি হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এবং তার থেকে হযরত ইব্রাহীম রা. জন্ম লাভ করেছেন। তবে কি নাউযুবিল্লাহ! রাসূল সা. কবিহ লি যাতিহীতে লিপ্ত ছিলেন? ফিতরতের বর্হিবত কাজ করেছেন? যদি আমরা ধরে নেই হযরত আম্বিয়া আ. থেকে এগুলো ইযতেহাদি ভুল হয়েছে তাহলে প্রশ্ন যাগে মহাজ্ঞাণী ও সর্বশক্তি মান আল্লাহ তা"য়ালা কেন অহীর মাধ্যমে সতের্ক করেন নি।

ইসলাম পূর্ব সময়ে কোন গুষ্টি এমন ছিলোনা যাদের গোলাম-বান্দির প্রথা ছিলোনা। ইসলাম এসে গোলাম-বান্দি প্রথাকে বৈধ রেখেছে এবং তাদের সাথে যে সকল অমানুষিক আচরণ করা হতো। তা বন্ধ করে দিয়েছেন। মালিকদের অধিকার সমুহ ঠিক করে দিয়েছেন। উপরোক্ত বিভিন্ন ভাবে তাদেরকে আজাদ করার পথ বলে দিয়েছেন। যা ফিক্বহ ও হাদিসের কিতাবে পাওয়া যায়। তবে হ্যাঁ ইসলাম গোলাম-বান্দির প্রথাকে বন্ধ করেনি। কারণ এটা আল্লাহ তা"য়ালার সাথে বিদ্রোহ অর্থাৎ কুফুরের শস্তি যতদিন এই পৃথিবীতে কুফুরও শিরক থাকবে ততদিন গোলামের প্রথাও

বাকি থাকবে। এবং থাকা উচিৎ যখন গুনাহ আছে শাস্তি কেন থাকবে না। শরীয়ত অসল গোলামীকে বাকি রেখে সকল ক্ষতিকর দিক গুলিকে শুধরিয়ে দিয়েছেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে গোলামী একটি লাঞ্ছনার বিষয়। কিন্তু কুফুরও শিরিক এর থেকেও অনেক বেশি লাঞ্ছনা কর ও অপমান জনক। প্রত্যেক গুনাহের ক্ষতিকর দিক সমুহ সীমিত কিন্তু আল্লাহ তা"য়ালার সাথে বিদ্রোহ ও অহংকার করার ক্ষতিও লাঞ্ছনার কোন সীমা-রেখা নেই। কেননা কুফুরের শাস্তি চিরস্থায়ী আজাব। আর ঈমানের উপহার হলো চিরস্থায়ী সাওয়াব।কেননা ইসলামের উদ্দেশ্য হলো কুফুরকে লাঞ্ছনা করা। চুরি ব্যাবিচার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো লোভ ও কুপ্রবৃত্তির অনুশরণ করা। আল্লাহ তা"য়ালার সাথে বিদ্রোহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অস্বীকার ও অহংকার করা। আল্লাহ তা"য়ালা বলেন,

أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ (سورة البقرة- ٣٤)

একারনে প্রথমেই গুনাহের শাস্তি তার বরাবর সাব্যস্ত করা হয়েছে। যে ব্যক্তির উদ্দেশ্য হলো অস্বীকার ও অহংকার করা। তার শস্তি হলো লাঞ্ছনা। অর্থাৎ গোলামী করা। আল্লাহ তা"য়ালা বলেন,

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا .....(سورة الشورى-40)

যে সব লোক আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কে মেনে নিয়েছে এবং তার পথে জীবন বজি রেখে লড়াই করেছে। আল্লাহ তা"য়ালা তাদের সম্মান বড়িয়ে দিয়েছেন।এ ভাবেই তাদেরকে অহংকারি ও বিদ্রোহিদের মালিক ও সরদার বানিয়ে দিয়েছে।

وَلله الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ (سورة المنافقون-8)

বন্ধুরা যে ব্যক্তি এ পৃথিবীতে ভলো-মন্দ ঈমানও কুফুর নেক-বদ কজ এবং মুমিন ও কাফেরের পার্থক্য করার পক্ষে তার জন্য এসব বিষয়কে মেনে নেয়ায় কোন সমস্যা

নেই। হ্যাঁ যে ব্যক্তি একে বারেই এসব বিষয়াদি বিশ্বাশ করেনা তার সাথে আমাদের কোন কথা নেই। সে তো মানুষই না বরং আস্ত একটা জানোয়ার কোরআনে কারীমের ভাষ্য مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ বাক্যটি পনের জায়গায় এসেছে। গুনাহের কাফ্‌ফারার মধ্যে গোলাম আযাদ করার কথা কোরআন শরীফে স্পষ্ট ভাবে এসেছে। এমনি ভাবে কোরআনে কারীমে গোলামকে মুকাতাবা বানানোর কথাও স্পষ্ট এসেছে।এ ধরণের আয়াত সমূহের দ্বারা গোলাম-বান্দি এতো স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় যেকোন চাক্ষুসমান ও শ্রবণকারী তা অস্বীকার করতে পরবে না। হাদীস শরীফে এসেছে,

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم " .
- سنن أبي داؤود : 547/2 باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت - سنن البيهقى الكبرى: 602/10 باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. رقم الحديث: 21638 - مصنف إبن أبي شيبة: 10/621-22 رقم الحديث: 20945، 20954،20955 ،

অর্থাৎ মুকাতাব যতদিন তার উপর এক দেরহমও বাকি থাকবে সে গোলাম হিসেবে গন্য হবে।

হযরত সা’দ বিন মুআয রা. বনী কুরাইযার ব্যাপারে ফয়সালা করলে تقتل مقاتلهم وتسبى ذريتهم অর্থাৎ তাদের যোদ্ধা (যুবকদের) হত্যা করা হবে এবং তাদের সন্তানদের গোলাম বানান হবে ।
তখন রাসূল সা. বলেন, قضيت بحكم الله অর্থাৎ হে সা’দ তুমি আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী ফয়সালা করেছ। এবং গাযওয়ায়ে আওতাসে গোলামের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হল।

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (سورة النساء -24)

অর্থাৎ কুরআন-হাদীস দ্বারা গোলাম-বান্দিও বিধান থাকাটা সূর্যেও থেকেও বেশী স্পষ্ট।

মূলকথা:

মানুষের মধ্যে স্বাধীন সত্তা অছে । কিন্তু তার সত্তাগত এটা চায় না যে এই গুণটা তার থেকে পৃথক হওয়া অসম্ভব, বরং মালিকানা গুণে গুণান্বিত হওয়ার ফলাফল মাত্র। যতক্ষণ সে মালিকানার গুণে গুণান্বিত থাকবে ততক্ষণ তার স্বাধীনতা আছে। আর যখন সে জানোয়ারের গুণে গুণান্বিত হবে তখন ঐ স্বাধীনতা একবারেই চলে যাবে। কুরআনের অনেকগুলো আয়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে মানুষ কুফুর এবং শিরক করার কারনে হায়াওয়ান-জানোয়ারের আওতায় চলে আসে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً (سورة الفرقان-44)

...... তারা পশুদের মতো; বরং তারা আরো অধিক নিকৃষ্ট।

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ ّاللهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (سورة الأنفال-55)

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণী তারা, যারা কুফরী করে, অতঃপর ঈমান আনে না।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأَنْعَامُ ... (سورة محمد-12)

......কিন্তু যারা কুফরী করে তারা ভোগ–বিলাসে মত্ত থাকে এবং তারা আহার করে যেমন চতুষ্পদ জন্তুরা আহার করে।

যেমনি আজকাল এই হায়াওয়ানি সংস্কৃতি চতুষ্পদ জন্তুর সভ্যতার দুনিয়াতে চর্চা চলতেছে।আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এ ব্যাপারে যে যে খবর আগ থেকে দিয়েছিল তার সত্যতা বর্তমান সভ্য দাবীদারদের মজলিসে পরিলক্ষিত হচ্ছে। যে দুনিয়ার জ্ঞানী ব্যক্তিরা চারিত্রিক অপরাধীদেরকে পশুর থেকেও অধম মনে করেনা,তাহলে ইসলাম আল্লাহদ্রোহীদরেকে পশুর থেকে নিকৃষ্ট বলে তাহলে কি ভুল বলে? বোঝা গেল যেমনি হায়াওয়ানকে শিকার করা ও ধরার মাধ্যমে হায়াওয়ানের মালিক হয়ে যায় , এমনিভাবে আল্লাহদ্রোহী ও আল্লাহকে অস্বীকারকারীদেরকে গ্রেফতার করার দ্বারাও তারা মালিকানাধীন হয়ে যায় । আর যেমনিভাবে পশু শিকার করাটাই মালিকানার কারন হয় এমনি কাফের দের উপর বিজয় হওয়া কর্তৃত্ব অর্জন করাটাই গোলাম ও মালিক হওয়ার কারন।

মানুষ এবং হায়াওয়ানের মাঝে যে পার্থক্য তা শুধু বিবেক এবং অনুভুতির কারনেই হয়ে থাকে। পশুরা অনুভুতিহীন হওয়ার কারনে জ্ঞাণীদের নিকট বেচা-বিক্রির শূধূ জায়েজই নয় বরং এটাকে জরুরী মনে করা হয় । আবার কখনও আদালত তার ধন-সম্পদেও হস্তক্ষেপ করে। তার মালিকানাধীন সম্পদকে বিক্রি করে জনগনের হক পরিশোধ করা হয় এটাকি তাদের স্বাধীনতার কারনে সম্ভব হয়নি?

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

জেনে নেয়া দরকার মানুষকে যে জন্মগত ভাবে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে এর দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে,সেটা মানুষের সাথে সব সময় লেগেই থাকবে এবং এটা তার পাওনা।বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল সব মানুষই সৃষ্টিগত ভাবে ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে। এবং এ কারনেই তাকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। যখন পরবর্তীতে ইসলামকে বাদ দিয়ে দিল এতে তার স্বাধীনতাও চলে গেল, এবং এ পাপের শাস্তি হল গোলাম হয়ে থাকা ।

যদি আমরা কিছুক্ষনের জন্য এটা মেনেও নেই মানুষের স্বাধীনতাটা এটা তার জন্মগত পাওনা। তখন প্রশ্ন জাগবে এ আধিকারটা কার প্রদত্ত, এবং এটাস কি এমন অধিকার যে কোন ধরনের অপরাধ করবে ,কুফুর ও শিরক করবে এবং আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করবে? এবং আল্লাহর প্রদত্ত সংবিধান কুরআনের আইনের বিরোধীতা করবে।তার প্রেরিত রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলবে? তাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করবে? তাদের সাথে যুদ্ধ করবে ?এবং তার অনুসারীদের কষ্ট দেবে অর্থাৎ যে কোন ধরনের অপরাধ সত্তেও তোমাদের স্বাধীনতার অধিকার উঠিয়ে নেয়া হবে না?

জেনে রেখ এবং ভালভাবে জেনে রেখ আল্লাহ প্রদত্ত পূর্বের সকল ধর্মে এবং আসমানী কিতাব এ কথার উপর একমত যে কুফুর ও শিরকের পরে কোন ব্যক্তি দুনিয়াতে থাকার অধিকার হারিয়ে ফেলে। আর গোলাম হওয়া না হওয়ার ব্যপারটা তো অগেই উল্লেখ করেছি।

এমন স্বাধীনতা তো যারপরনাই সভ্য আধুনিক রাষ্ট্র ও গণতন্ত্রের মধ্যেও নেই। যে, সে সরকারকে মানবে না ,মন্ত্রীদের ও তার দেশের আইন মানবে না ,রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিবৃতি দেবে,এবং তার প্রণিত আইনের বিরোধীতা করবে । এতকিছু করার পরও কি আপনি স্বাধীন থাকবেন? যে, আপনাকে গ্রেফতারের পরোয়ারা জারি হবেনা? এবং আপনার বিরুদ্ধে কোন মামলা করা হবে না? এবং আপনার ধন-সম্পদের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ত চ লবেনা ?এব ং আপনার ব্যাংক একাউন্ট জব্দ করা হবে না? যখন আপনি সরকারের সাথে বিদ্রোহ করবেন তখন বাদশাহ ঐসব পদক্ষেপ নেবে আপনি যার উপযুক্ত।

যদি কিছু কিছু পাপ করার কারনে শাস্তি হিসেবে অঙ্গ-প্রতঙ্গ কাটাও মৃত্যু অনিবার্য হয়ে যায় তাহলে বলতে হবে কুফুর থেকে বড় অপরাধ আর কি আছে ?

রাজনৈতিক গোলামী

ফিরিঙ্গীরা ইসলামের মধ্যে গোলামের প্রথাকে সমালোচনা করে কিন্তু তাওরাত এবং বাইবেলের যে গোলামীর কথা উল্লেখ আছে তার নাম ও নেয় না। এবং রাজনৈতিক গোলমী নিজেদের জন্য জরুরী মনে করে।

বর্তমান রাজনৈতিক চিন্তাধারা পুরো গোষ্ঠী এবং দেশকে গোলাম বানানোর পদ্ধতি বের করে দিয়ছে। এ কারনে একক মালিকানায় গোলামের প্রয়োজন নেই।এবং আজও এ শতাব্দীতে গনতন্ত্র ও সাম্যবাদে শ্বেতাঙ্গকে কৃষ্ণাঙ্গের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়। আমেরিকাতে শ্বেতাঙ্গ অধিবাসিদের জন্য ভিন্ন আঈন পাশ করা হয়েছে।

সংশয় -৫১

কতিপয় দুর্ভাগা লোক আপত্তি করে এবং ভাগ্যবান ব্যক্তি সাধারণত আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করে দাসী বাদীদের সাথে মিলিত হওয়া কিভাবে বৈধ হয় অথচ মিলিত হওয়া তো কেবল বিবাহের মাধ্যমে জায়েয ?

সমাধান -১

আল-হামদুলিল্লাহ আমরা মুসলমান তাইতো আমাদের জন্য প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ যোগ্য হবে কুরআনে কারীম, হাদীসে রাসূল সা. ও সাহাবায়ে কিরামের আমল।
কুরআনে কারীমে কয়েক জায়গায় এই মাসয়ালা উল্লেখ আছে। উদাহরণ স্বরূপ:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ (سورة المؤمنون-5-6)

সফলকাম মুমিনদের আলোচনায় আল্লাহ বলেন যে, তারা নিজের স্ত্রী ও বাদীগণ ব্যতিত (অন্যস্থানে) নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।

এই আয়াতে স্ত্রী ও বাদীদের আলোচনা পৃথক ভাবে করা হয়েছে যা একথার দলীল যে, স্ত্রী ও বাদী ভিন্ন ব্যক্তি কেননা বাদীর সাথে যদি বিবাহ হয় তাহলে তো সে স্ত্রী বলেই গণ্য হবে।

তাছাড়া যুদ্ধের মাঝে রাসূল সা. বাদীদেগর কে সাহাবা কেরামের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া ও সাহাবায়ে কিরামের বিবাহ ব্যতিত তাদের কে নিজের ঘরে রাখা একথার দলীল যে, বাদীদের সাথে বিবাহ ব্যতিত মিলিত হওয়া বৈধ। যেমন ভাবে বিবাহের পর স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়া বৈধ।

সমাধান -২

এখানেও মূল কথা এটাই যে, আল্লাহ তায়াল সৃষ্টিকর্তা তিনিই মাখলূকের অবস্থা সবচেয়ে ভাল জানেন তাই তিনি মাখলূকের জন্য যে ফয়সালা করবেন সেটা নির্দিধায় মেনে নেওয়াই বন্দেগী।

আর আল্লাহর বিধানে (খুত ধরা) প্রশ্ন করা ইমান ও ইসলাম বিরোধী কাজ। তাই ইহা ও আল্লাহর নেয়ামত মনে করে কবুল করে নেওয়া উচিত।

আল্লাহ কবুল করুন। আমীন!

ইরতিদাদের (ইসলাম ত্যাগের আলোচনা)

মুরতাদের পরিচয়:

قطع الإسلام بقول أو فعل أو نية অর্থাৎ কথা কাজ ও নিয়তে ইসলামকে পরিত্যাগ করাই ইরতিদাদ। (রহমাতুল উম্মাহ ফি ইখতিফিল আইম্মাহ পৃ: ২৬৯)

ইরতিদাদের প্রকার ভেদ: ইরতিদাদ তিন প্রকার।

১ - মুসলমান হওয়ার পর পরিপূর্ণ ভাবে ইসলাম ত্যাগ করা ও অন্য ধর্ম যেমন খৃষ্টবাদ, ইহুদীবাদ ইত্যাদি ধর্ম গ্রহণ করা।

২ - ইসলামের কোন গুরুত্বপূর্ণ বিধান বা রুকন অস্বীকার করা যেমন নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ জিহাদ ইত্যাদি অস্বীকার করা।

৩ - ইসলামের কোন ফরজ ওয়াজিব বা সুন্নত বিধান কে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা।

মুরতাদের শাস্তি:

মুরতাদকে বুঝা ও বুঝানোর জন্য তিন দিনের সুযোগ দেওয়া হবে তারপরও যদি সে অস্বীকার করে তাহলে তাকে ক্বতল করার ব্যপারে ফুক্বাহা কেরাম একমত। তবে ইমাম আযম আবু হানিফা রহ. মুরতাদ মহিলাকে হত্যার পরিবর্তে বন্দি করে রাখার হুকুম দেন। দলীল প্রমাণ সমূহ ঃ

দলীল -১

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ (سورة البقرة -54)

হযরত মূসা স্বীয় ক্বওমকে বললেন: তোমরা বাছুর কে মাবুদ বানিয়ে নিজেদের উপর জুলুম করেছো তাই তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা চাও এবং নিজেরা নিজেদের কে হত্যা করো।

দলীল -২ রাসূল সা. ইরশাদ করেন:

من بدل دينه فاقتلوه (صحيح البخاري)

যে ব্যক্তি নিজের ধর্ম (ইসলামকে) ছেড়ে দেয় তাকে হত্যা করে দাও।

দলীল -৩ হযরত সিদ্দিকে আকবার রা. এর হুকুম এবং সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র আমল হল যাকাত অস্বীকার কারী এবং মুসাইলামাতুল কাজ্জাব, আসওয়াদে আনাসী, তুলাইহা ও তার অনুসারীদেরকে হত্যা নিশ্চিত করা।

দলীল: ৪ এই বিধান শুধু আমাদের শরীয়তেই না বরং পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে ও এই বিধান ছিল বরং আজও পরিবর্তিত বাইবেলের ক্বাদীম অধ্যায় ৬-১৬ নং আয়াত মোতাবেক হযরত মূসা আ. বনী ইসরাঈলকে এই হেদায়েত দিয়েছেন যে, যদি তোমার ভাই তোমার মায়ের ছেলে অথবা তোমার সহধর্মীনী বা তোমার প্রিয় বন্ধু যাকে তুমি তোমার প্রাণের মত ভালবাস তোমাকে চুপে চুপে ফুঁসলায় যে, চলো আমরা অন্য দেবতার পুজা করি যে দেবতার ব্যাপারে তোমার বাপ দাদাও অবহিত নন/জানেনা। অর্থাৎ ঐ সকল লোকের দেবতা যারা তোমার আশে পাশে থাকে অথবা দূরে থাকে তাহলে তুমি এ বিষয়ে তার সাথে রাজি হবেনা এবং তার কথাও শুনবেনা এবং তার প্রতি দয়া করবেনা এবং তাকে ছাড় দিবে না, এবং তা গোপন রাখবে না। বরং তুমি অবশ্যই হত্যা করবে এবং হত্যার সময় তোমার হাত তার উপর পড়বে এবং পুরো ক্বওমের হাত পড়বে। এবং তুমি তাতে প্রস্তরাঘাত করবে যেন সে মারা যায়। কেননা সে তোমাকে তোমার প্রতিপালক যিনি তোমাকে মিশরের রাজত্ব তথা গোলামী থেকে করে এনেছেন। সেই খোদার বিদ্রোহী করতে চেয়েছে। (যদি তুমি তাকে হত্যা করো) তাহলে সকল ইসরাঈলী ভয় পাবে এবং পুণরায় তোমার এমন ক্ষতি করবেনা।

ইসলাম ত্যাগের কারণ সমূহ:

মুরতাদ হওয়ার কারণ সাধারণত এ কয়েকটি হয়ে থাকে।

১- এই মুরতাদ হয়তো অন্তর থেকে ইসলাম গ্রহণ করেনি বরং বাহ্যিক কোন ফায়দা বা লোভে ইসলাম গ্রহণ করেছে। আর যখনই সে ফায়দা বা মাক্বসাদ পূর্ণ হয়েছে তখন কুফুরীর দিকে (পুণরায়) ফিরে গেছে।

২- কিছু লোক ধন-দৌলত অর্জনের জন্য স্বীয় ধর্ম ইসলাম পরিত্যাগ করে।

৩- কোন যুবক সুন্দরী কাফের যুবতীর প্রেমে পড়ে অথবা কোন মহিলাকে পাওয়ার লোভে ইসলাম থেকে সরে দাঁড়ায়।

৪- কখনো দুর্বল মুসলমান কাফের দের প্রতিপত্তি ও জুলুম-অত্যাচারে বিপদে পড়ে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে।

৫- কিছু দুভাগা সামান্য খ্যাতি ও দুনিয়াবী সম্মান-পদবী অর্জনের লক্ষেও ইসলাম থেকে সড়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ আমাদেরকে তা থেকে হেফাজত করুন।

সংশয় -৫২

শরীয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত মুরতাদের এই শাস্তির উপর আপত্তি তোলা হয় যে, এটা তো মানুষের স্বাধীণতার বিরোধী ও বাধ্য করা হলো অথচ কুরআনে কারীমে আছে لا إكراه في الدين এই ঘোষনা দিয়ে ধর্মে কাউকে বাধ্য করানোর ব্যাপারে নিষেধ করেছেন।

সমাধান -১

কাউকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য বাস্তবে কোন বাধ্য করা হয়না। বরং ইসলামী ইতিহাস সাক্ষি যে, আজ পর্যন্ত যারাই ইসলাম গ্রহণ করেছেন সানন্দে ইসলামের প্রতি আগ্রহি হয়েই করেছেন।

সত্য ধর্ম কাউকে বাধ্য করেনা কভু

সানন্দে মুসলমান হয় লোকেরা তবু

দুনিয়ার আইনেও শাস্তি তার মওত

জেনে বুঝে করে যে অন্যের সাথে বাগাওত

এজন্য সাহাবায়ে কেরামের উজ্জল দৃষ্টান্ত লক্ষ করুন যে, তারা সে সময় ইসলাম গ্রহণ করেছেন যখন ইসলাম গ্রহণ করা আল্লাহকে এক মানা কয়লা হাতে নেওয়ার মতো কঠিন কাজ ছিল। বরং বাস্তবেও আগুনের কয়লার উপর চিৎ হয়ে শুইতে হয়েছিল। আরো অনেক বড় বিপদের সম্মুখিন হয়েছেন তা সত্ত্বেও যখন কুফরীর জন্য বাধ্য করা হতো তখন ইসলামকে ছাড়েনি।

সমাধান -২

আর জোর পূর্বক ইসলাম কবুল করলে তাহা গ্রহণ যোগ্যই হয়না। বরং নিজ ইচ্ছা ও খুশিতে ইসলাম ও ঈমান কবুল করলে তা গ্রহণ যোগ্য হয়। আর অন্তরে (ইসলাম) কবুল না করলে তাহা ইসলামই নয় বরং তা মোনাফেকী/কপটতা।

সমাধান -৩

জোর পূর্বক কাউকে মুখে ইসলাম উচ্চারণ করা গেলেও অন্তরে ইসলাম প্রবেশ করানো যায়না। তাই মুসলামনগণ কাউকে ইসলাম গ্রহণের জন্য কাউকে বাধ্য করেনি, জোর করেনি। বরং প্রকাশ্য ভাবে অনুমতি দিয়েছে যার ইচ্ছা ইসলাম গ্রহণ করবে না হলে করবে না।

বাস্তবতা:

ইসলামের বিধান হলো যদি কোন অমুসলিম ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের বিধান মেনে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করতে চায় তাহলে তাহলে তার জন্য নিজ ধর্মের বিধান

মানা, ইবাদাত করা এবং নিজেদের রুসুম রেওয়াজের জন্য ইবাদাত খানা বানানো এবং একটি সীমার মধ্যে থেকে নিজ ধর্মের শিক্ষা-দিক্ষার অনুমতি আছে। আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ফারুক রা. একবার একজন গভর্ণর কে শুধু এ কারণে পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন যে, সে একটি খৃষ্টান পরিবারকে ইসলাম গ্রহণের জন্য জোর করেছিল। তবে ইসলাম গ্রহণের পর ইসলাম ত্যাগ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তার উদাহরণ হল যেমন এক ব্যক্তি কোন দেশের নাগরীক নয় তাহলে সারাজীবন নাগরীক হওয়ার জন্য বাধ্য করবে না। কিন্তু যদি সে দেশের নাগরীক হওয়ার জন্য আবেদন করে নাগরিকত্ব লাভ করে তাহলে সে দেশের আইন কানুন মেনে চলা ও সম্মান তার জন্য আবশ্যক হয়ে যায়। কোন আইন অমান্য করলে তাকে শাস্তি দেওয়া হয় কিন্তু তার কিছু বলার অধিকার থাকে না।

আর যদি এ দেশেই আইনের বিরোধিতা করে এবং সে নিয়মের বিপরীতে নিয়ম বানিয়ে তা চালানোর প্রচেষ্টা করে তাহলে তো ফাঁসি দেওয়া ছাড়া তার জন্য অন্য কোন পন্থা/পথ নেই। এবং দুনিয়ার কোন দর্শন এবং আইন কানুন স্বাধীণতার নামে রাষ্ট্রের আইনের বিরোধীতা করার অনুমতি প্রদান করবে না।

পার্থক্য একটাই যে, দুনিয়াতে এই বিধান কে শুধু সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় আইনের সাথে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়নি। অথচ একটি ইসলামী রাষ্ট্রে ধর্ম শুধু প্রথাগত ধর্মের মর্যাদা পায়না বরাং তা রাষ্ট্রীয় সংবিধান ও অথরিটির মর্যাদা লাভ করে এবং রাষ্ট্রের বিধানের পূর্ণ ভিত্তি এই (ইসলাম) ধর্মের উপরই হয়ে থাকে। এ জন্য যেমনীভাবে অন্যান্য রাষ্ট্রের আইন কানুন সংবিধান ও অথরিটির বিদ্রোহের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড তেমনিভাবে ইসলামী রাষ্ট্রেও রাষ্ট্রীয় আইন সংবিধান ও অথরিটির বিদ্রোহের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, আর ইসলামী রাষ্ট্রে ধর্ম অথরিটির মর্যাদা পায়।

কেউ যদি রাষ্ট্রীয় আইনের অস্বীকার করে,

কীভাবে আসবে না তার উপর অভিযোগ বিদ্রোহের।

শাস্তি তাহার মৃত্যুদণ্ড যে, ইসলাম কে দেয় ছেড়ে,

হে বন্ধু! জেনে রাখ) এটাই বিধান ইমারতের/হুকুমতের/রাষ্ট্রের

সংশয় -৫৩

এবার মুসলমান দের পক্ষ থেকে ই একটি প্রশ্ন করা হয়, যদি আমরা ইসলামী রাষ্ট্রে মানুষকে খৃষ্টবাদের প্রচারের অনুমতি প্রদান না করি এবং যারা খৃষ্টান,ইহুদী ও হিন্দু হয়ে যায় তাদের হত্যা করে ফেলি তাহলে তো কাফের রাও আমাদের কে তাদের রাষ্ট্রে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার অনুমতি দিবে না/প্রদান করবেনা।

সমাধান -১

এই প্রশ্নের মূল কারণ তো আমাাদের বর্তমান অবস্থা ও পরিবেশ। বরং আমাদের ভাগ্য খারাপ যে, জিহাদ ও খেলাফত না থাকার কারণে মুসলমানগণ অবনতি ও

নীচতার চুড়ান্ত সীমায় পৌছে গেছে। আর এটা দূরের কথা নয় যখন মুসলিম রাষ্ট্রের হিফাজতের পর মুসলিম মুজাহিদগণ কাফেরদের রাষ্ট্রকে খেলাফতের অধিনস্ত করার প্রচেষ্টায় ছিলেন। আল্লাহ এ অবস্থা পূণরায় দান করুন এবং জলদি দান করুন। আমীন তখন এরকম দূর্বল দূর্বল প্রশ্ন আসবেই না এবং কোন কাফিরেরও এমন দুঃসাহস হবে না যে, আমাদের কে ইসলামের দাওয়াত দিতে বাধা দিবে।

সমাধান -২

আসল কথা এটাই যা পূর্বে আমি বলেছি যে, ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলাম ধর্ম রাষ্ট্রিয় সংবিধান ও আইনের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত এজন্য কোন মুসলমান ইসলাম ধর্ম থেকে সরে যাওয়ার অনুমতি কে রাষ্ট্রিয় সংবিধানের বিদ্রোহ করার শামিল অথচ কুফুরি রাষ্ট্রে ইসলাম ধর্ম শুধু প্রথাগত ধর্মের মর্যাদা পায় আর সেখানে যেহেতু ধর্ম রাষ্ট্রিয় মর্যাদা পায়না তাই ধর্ম ত্যাগ করাটা অপরাধও নয়। তাইতো তারা নিজেদের বিধান অনুযায়ী আমাদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়া থেকে বাধা ও দিতে পারবে না। তবে যদি কাফেরদের রাজত্ব ও ধর্মকে রাষ্ট্রিয় সংবিধানের মর্যাদা দেয় এবং ধর্ম ত্যাগ করাটা রাষ্ট্রীয় বিদ্রোহের শামিল করে তাহলে তখন অবস্থাও ভিন্ন রকম হয়ে যাবে। এবং তাদের আইন রক্ষার্থে আমাদের কে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবেনা। এবং তাদের দেশে সফর করতে হলে আইন মেনে করতে হবে যেমন অন্য আইন সমূহ মেনে চলা হয়।

একটি চিন্তার বিষয়:

প্রিয় পাঠক! আল্লাহর দয়ায় বর্তমান একটি জামাত কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করছে। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান জিহাদ থেকে দূরে থেকে দুনিয়াবী কাজে ব্যস্ত। তবে তারা মুজাহিদ ভাইদের মুহাব্বত করে তাদের জন্য দুয়া করে সাধ্যানুযায়ী সহযোগীতা করে। কিন্তু মুসলামানদের মধ্যেই অনেক লোক এমনও আছে যারা জিহাদের ব্যাপারে শুধু গাফেলই না বরং তারা জিহাদ না করার সাথে সাথে জিহাদকে ভাল মনেও করে না। এবং মুজাহিদদের পথে বাঁধা প্রদান করে। জিহাদের অর্থ বিকৃত করে ও অনর্থক ব্যাখ্যা করে। এমনকি জিহাদের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন

করে সাধারণ মুসলামান ও মুজাহিদদের অন্তরে সংশয় সৃষ্টি কারার অপচেষ্টায় লিপ্ত। তবে তাদের অন্তরের অবস্থা আল্লাহই জানেন। এজন্য আমি সে সকল ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে, তারা যেন একটু ভাবে যে, তারা ইসলামের কোন খেদমতটি আঞ্জাম দিচ্ছে। এবং তারা কোন কাতারে শামিল এবং তারা হাশরের মাঠে কাদের সাথে দাঁড়াবে? মুসলামান মুজাহিদদের সাথে নাকি মুসলমান মুজাহিদদের সহযোগীকারীদের সাথে নাকি জিহাদ তরককারী কাফেরদের সাথে নাকি জিহাদের অপব্যাখ্যাকারী মুনাফিরদের সাথে। কেননা রাসূল সা. বলেছেন من تشبه بقوم فهو منهم (أبو داؤد) যে ব্যক্তি কোন কওমের সাদৃশ্যতা গ্রহণ করে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। من كثر سواد قومٍ فهو منهم (مسند أبي يعلي যে ব্যাক্তি কোন কওমের জামাতকে বড় করলো সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। হে আল্লাহ হাশরের মাঠে আমাদের কে মুজাহিদদের কাতারে শামিল করো। আমীন!

হাদীসের ব্যাখ্যা জিহাদের দৃষ্টিকোণ থেকে:

حدثنا مسلم بن إبراهيم .... " إن الغناء ينبت النفاق في القلب " .

- سنن أبي داؤود : 674/2 باب كراهية الغناء والزمر.

- سنن البيهقى: 420/10 رقم الحديث:21006، 21007 ، 21008 .

গান-বাদ্য অন্তরে তেমনি নেফাকী সৃষ্টি করে যেমনীভাবে পানি শস্য-ক্ষেত উৎপন্ন করে।

এক---- যেহেতু গান বাদ্যের কারণে অন্তরে নেফাকী সৃষ্টি হয় তাই জিহাদ থেকে দূরে থাকাটা স্বভাবগত বিষয় হয়ে গেছে কেননা জিহাদ ও নেফাকী কখনো একত্রিত হতে পারেনা। মুনাফেক্বরা তো রাসূল সা. এর সাথে মিলে কাফের বিরুদ্ধে জিহাদই করেনি উম্মতের সাথে মিলে কীভাবে করবে। হয়তো এখন কারো অন্তরে এমন একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, রাসূল সা. এর যুগে তো মুনাফেকরা কাফের ও বিশ্বাসগত ভাবে

মুনাফেক ছিল আর গান-বাদ্যের কারণে যে নেফাকী সৃষ্টি হয় সেটার প্রভাব শুধু কাজের ক্ষেত্রে আক্বীদার ক্ষেত্রে নয় অতএব উভয়ের মাঝে আকাশ সমান পার্থক্য?

তার জবাব হলো রাসূলের যুগে মুনাফেকরা যেহেতু কাফের ছিল তাই তারা জিহাদ বিরোধী ও কার্যত বিদ্রোহী ছিল। কিন্তু মুসলামানদের মাঝে আজকাল গান-বাদ্যের কারণে যে নেফাকী সৃষ্টি হয় যেহেতু সে মুসলমান তাই সে আক্বীদাগত ভাবে তো জিহাদের পক্ষেই কিন্তু কার্যত সে জিহাদ থেকে দূরে সরে আছে।

মোট কথা নবীযুগে মুনাফেকরা অন্তরে ও কাজে উভয় ভাবে জিহাদ বিরোধী ছিল কেননা তারা আক্বীদাগত ভাবে মুনাফেক ছিল। আর বর্তমানে আক্বীদাগত জিহাদের পক্ষে তবে শুধু কার্যত জিহাদের বিপরীত করে আর তারা আক্বীদাগত মুনাফেক নয়।

দুই--- গান-বাদ্য অন্তরে কু প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে যে ব্যক্তি নিজেই টিভি,ভিসি আর, ডিশ, সিনেমা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিদিন ইজ্জত নষ্ট করা ও ইজ্জত সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলার দৃশ্য দেখে বরং নিজেও ইজ্জতের ক্ষতি করে সে ব্যক্তি অন্যের ইজ্জত কীভাবে রক্ষা করবে। ইজ্জতের গুরুত্ব না থাকার এটাও অন্যতম কারণ। একারণেই হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যদিও জালেম ছিল কিন্তু এক মুসলিম বোনের ফরিয়াদ তাকে অস্থির করে দিয়েছিল। কিন্তু বর্তমান সমাজে আত্ম মর্যাদার গুরুত্ব নেই। ঘরে ঘরে মর্যাদা নষ্ট হচ্ছে তাই যখন কোন কাফের মুসলমান মেয়ের ইজ্জত নষ্ট করে নেয় সে আর্তনাদ করে কিন্তু মুসলিম যুবকের মাঝে তার কোন প্রভাবই পড়েনা। সে নির্বিকার থাকে। বর্মমানে কাশ্মীর ফিলিস্তিনে এমনই হচ্ছে।

জিহাদ, উলামা এবং খতমে নবুওত

عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان وإنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

- سنن الترمذي: 45/2 رقم الحديث: 2217 - سنن أبي داؤود: 584/2 رقم الحديث: 4252 - مجمع الزوائد: 453/7 رقم الحديث: 12481

আমিই সর্বশেষ নবী আমার পর কোন নবী নাই।

عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث من أصل الايمان : الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا تكفره بذنب ولا تخرجه من الاسلام بعمل ، والجهاد ماض منذ بعثنى الله إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل ،

- سنن أبي داؤود: 342/1 باب في الغزو مع أئمة الجور. رقم الحديث:2532 - سنن البيهقى الكبرى : 292/9 باب في الغزو مع أئمة الجور. رقم الحديث:18480

আল্লাহ আমাকে যখন নবী বানিয়ে প্রেরণ করেছেন তখন থেকেই চালু/জারী (এবং জিহাদের আদেশ দিয়েছেন) আর এই উম্মতের সর্বশেষ ব্যক্তি দাজ্জালকে হত্যা করা পর্যন্ত জিহাদ চালু থাকবে।

أقرب الناس من درجة النبوة أهل الجهاد وأهل العلم لأن أهل الجهاد يجاهدون على ما جاءت به الرسل، وأما أهل العلم فدلوا الناس على ما جاءت به الأنبياء. (الديلمي عن ابن عباس).

- كنز العمال: 10647 أورده أيضاً : الذهبى فى السير (524/18) . وعزاه العجلونى (83/2) لأبى نعيم بسند ضعيف عن ابن عباس

মানুষের মধ্য হতে নবুয়তের সবচেয়ে নিকবর্তী মুজাহিদ ও আলেমগণ এজন্য যে, মুজাহিদগণ রাসূল আণীত দ্বীনের জন্য জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে। আর আলেমগণ স্বীয় ইলমের মাধ্যমে নবীগণের বর্ণিত পথের দিশা দেয়। এই তিন হাদীস থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, নবুয়তের ধারাবাহিকতা বন্ধ হওয়ার পর রাসূল সা. স্বীয় উম্মতকে অভিভাবকহীন ছেড়ে দেননি। বরং ক্বিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের প্রচার-প্রসার, ইসলাম ও মুসলমানদের হেফাজত এবং দ্বীনকে বুলন্দ করার দায়িত্ব আলেম ও মুজাহিদ গনের উপর ন্যাস্ত করেছেন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত নবী সা. যে কাজ করতেন

তা ইলম ও জিহাদে মাধ্যমে আদায় হবে সত্যিই বড়ই ভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি আল্লাহ যাকে ইলম ও জিহাদ উভয় নেয়ামত দান করেছেন।

একটি লক্ষণীয় বিষয়

الجهاد ماض إلى يوم القيامة

যদিও এটা সহীহ হদীস হিসেবে প্রমানিত নয়, তবে তার বিষয়বস্তু একেবারে সঠিক। সুতরাং বুঝানোর জন্য এ বর্ণনাটিকে হুবহু এ শব্দমালা দ্বারা বলতে কোন অসুবিধে নেই। তারপরেও উলামায়ে কেরামদের জিহাদ ও খতমে নবুয়াতের শিরনামের অধিনে উল্লিখিত সহীহ হাদীসগুলোই বর্ণনা করা উচিত।

একটি উপদেশ

যেমনি খতমে নবুয়াতের বিষয়ে ছায়া নবী ও বুরুজে নবীতে ভাগ করা অবৈধ অমনি জিহাদের ব্যপারে কোন ধরণের অপব্যাখ্যা করাও আকীদাগত কোন ধরণের পরিবর্তন আনাও অবৈধ।

আমি কিছু মুজাহিদ ভাইদের বলতে শুনেছি যে, তারা এ হাদীসের ব্যাখ্যা এ ভাবে বর্ণনা করেন যে, “জিহাদ কেয়ামত পর্যন্ত চলবে” এর অর্থ হল, এর মাঝে এমন কোন সময় আসবেনা যে পৃথিবীর কোন প্রান্তে জিহাদ হচ্ছে না। অর্থাৎ পৃথিবীর কোন না কোন স্থানে জিহাদ চলবেই। তাদের এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়, বরং তার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, “জিহাদের হুকুম কেয়ামত পর্যন্ত” তাই পৃথিবীতে এমন সময় যদি অতিবাহিত হয় যখন কোথাও জিহাদ হচ্ছে না, এবং উম্মত এ আমল ছেড়ে দিলো তাহলে তা এ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হবে না।

একটি সুক্ষ্ম বিষয়

এ উম্মতের ফেরাউন এবং নববী যুগের সবচে বড় ফেতনা আবু জাহেলের ফেতনা ছিল তা জিহাদের মাধ্যমে কবররচিত হয়েছে, এবং নববী যুগের পরবর্তী সময়ে উম্মতের জন্য সবচে বড় চ্যালেঞ্জের ফেতনা ছিল যাকাত অস্বীকার এবং ইরতিদাদের ফিতানা। মুসাইলামাতুল কায্যাবকে জিহাদের মাধ্যমে শেষ করে এই ফেতনা নির্মূল করা হয়েছে। উম্মতের শেষ পরিক্ষা হবে দাজ্জালের ফেতনা তাও জিহাদের মাধ্যমে শেষ করা হবে ইন্‌শাআল্লাহ!

সবচে বড় নেক কাজ

ফিক্‌হ শাস্ত্রে একটি মাসআলা রয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি তার সম্পদকে নেক কাজ সমুহের মধ্যে সবচে ফজিলত পূর্ণ নেক কাজের জন্য ওয়াকফ্ করে, অথবা কেউ মৃত্যুর সময় ওসিয়ত করে গেল যে, তার মৃত্যুর পর তার সম্পদ যেন সর্বাধিক পূন্যের কজে ব্যায় করা হয়। তাহলে তার সম্পদগুলো জিহাদের সম্পদ বলেই বিবেচিত হবে।

খলীফা নির্বাচনের শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি

খলীফা নির্বাচন করা ফরজ। মুসলমানদের খলীফা এবং শরয়ী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সকল মুসলমানদের উপর ফরজ। যার থেকে কোন মুসলমান দায় মুক্ত হতে পারে না। কেননা এমন অনেক শরয়ী হুকুম রয়েছে যা ইসলামিক রাষ্ট্র ও খলীফাতুল মুসলিমীন ছাড়া পালন করা সম্ভব নয়। যেমন: শরীয়তের দন্ডবিধি বাস্তবায়ন করা, ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রতিরক্ষা করা, ইসলামী সৈন্য বাহিনীকে জিহাদের জন্য প্রেরণ করা, যাকাত ও সদকা উসুল করা, রাষ্ট্রদ্রোহী, চোর-ডাকাতকে নির্মূল করা, ঈদ এবং জুমা ক্বায়েম করা, মানুষের বিবাদ নিরসন এবং তাতে ফয়সাল করা, বান্দার হক্বের ব্যপারে সাক্ষী গ্রহন করত: তার উপর আমল করা, পিতা-মাতাহীন বাচ্চাদের বিবাহের ব্যবস্থা করা, যুদ্ধের পর যুদ্ধলব্দ সম্পদের সঠিক বন্টন করা ইত্যাদি। শরহে আকাইদ পৃ: ১০৬

হযরত আমের রা. বলেন রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন :

من مات وليست عليه طاعة مات ميتة جاهلية فإن خلعها من بعد عقدها في عنقه لقي الله تبارك وتعالى وليست له حجة

কোন ব্যক্তি যদি এমন অবস্থায় মারা যায় যে সে কোন আমীরের বাইআত গ্রহণ করেনি, তাহলে সে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু পেল। আর যে ব্যক্তি বাইআতের পরে আনুগত্য করলো না সে কেয়ামতের দিন কোন ভরসা ছাড়াই আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে।

সাহবায়ে কিরাম রা. খলীফা নির্বাচনের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে তাকে রাসূলুল্লাহ সা. এর দাফনের চেয়েও প্রাধান্য দিয়েছেন। এর উপর সকল ইমামগন সহমত যে, খলীফাতুল মুসলিমীন নির্বাচন করা ওয়াজিব।

ফায়েদা.

মূলনীতিতো হলো এটাই যে পুরো দুনিয়ার মুসলমানদের খলীফা একজন হবে, এবং সব মুসলিমরা ঐ খলীফার আনুগত্য গ্রহণ করবে, তবে এর ধারাবাহিকতায় বেঘাত ঘটে অথবা তা মুশকিল হয়ে পড়ে, তাহলে এমন অপারগতার সময় ঐ রাষ্ট্রের ইসলামী সূরা অর্থাৎ জাতির কর্ণধারগন একজন আমীর নির্বাচন করে নিবে। যদি এটাও অসম্ভব হয়, তাহলে মুসলমানদের থেকে যতটুকু সম্ভব নিজেদের আমীর নির্বাচন করে নিবে এবং তার আনুগত্যে জীবন কাটিয়ে দিবে।

খলীফা হওয়ার শর্তাবলী

১. মুসলমান হওয়া।
২. জ্ঞান সম্পন্ন, প্রাপ্ত বয়স্ক এবং পুরুষ হওয়া।
৩. স্বাধীন হওয়া।

৪. ইলমে দ্বীনে অভিজ্ঞ হওয়া।
৫. আল্লাহ ভীরু ও দ্বীনদার হওয়া।
৬. নববী রাজনীতির অনুসরণ করা।
৭. বীর পুরুষ হওয়া।
৮. সিদ্ধান্ত প্রদানে ও পরিচালনার যগ্যতা রাখা।
৯. শরীরীক ভাবে এমন কোন সমস্যা না থাকা যা খিলাফাহ পরিচালনায় বিঘ্নতা ঘটায়।
১০. (কোন কোন ফুকাহার মতে) কুরাইশী হওয়া। (অর্থাৎ কুরাইশ বংশ থেকে হওয়া।

খিলাফত আল্লাহ প্রদত্ত একটি নিয়ামত।

এর বিবরণ সংক্ষিপ্ত ভাবে একটু দেখে নেয়া যাক।

১. হযরত শামওয়েল আ. এর নিকট যখন তার সম্প্রদায় একজন বাদশাহ চাইল, তখন আল্লাহ তা'য়ালা বললেন:

إِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً

২. হযরত দাউদ আ. এর উপর আল্লাহর অনুগ্রহের আলোচনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন:

وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ

৩. হযরত ইব্রাহীম আ. এর পরিবারের উপর তার পুরুষ্কারের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন:

وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكاً عَظِيماً

৪. হযরত মুসা আ. স্বীয় সম্প্রদায়ের সামনে নেয়ামতের আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন:

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً

৫. হযরত ইউসুফ আ. এই নেয়ামতের আলোচনা এভাবে করেছেন:

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ

৬. প্রতিনিধী বানানোর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালা মুসলমানদেরকে খিলাফত এবং হুকুমত দেয়াকে অনুগ্রহ বলে উল্লেখ করেছেন:

وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

৭. হযরত সুলাইমান আ. আল্লাহ তা'য়ালার কছে এ নেয়ামত পাওয়ার জন্য দোয়া করলেন:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي

খেলাফত ব্যবস্থা

১. এটা এমন এক ব্যবস্থা যাতে চলমান খলীফাকেও অদালতের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

২. এটা এমন এক ব্যবস্থা যাতে সর্বদা মাজলুমের অশ্রু মোছা হয়।

৩. এটা এমন এক ব্যবস্থা যাতে রাজা প্রজা সাবার জন্য আঈন-কানুন সমান ও অভিন্ন হয়।

৪. এটা এমন এক ব্যবস্থা যাতে গর্ভণরের ছেলেকে জনসম্মুখে বেত্রাঘাত করা হয়।

৫. এটা এমন এক ব্যবস্থা যাতে এক মাত্র আল্লাহর হুকুমই চলে।

৬. এটা এমন এক ব্যবস্থা যাতে মা-বোনদের সতীত্ব রক্ষা করা হয় এবং তার জন্য জীবনবাজী রাখা হয়।

পাঁচটি কথা:

ইমাম আব্দুর রহমান আওজায়ী রহ. বলেন:

পাঁচটি বিষয়ে সকল সাহাবায়ে কেরাম রা. অংশীদার ছিলেন।

১. সংঘবদ্ধতা।
২. সুন্নতের অনুসরণ।
৩. মসজিদ নির্মাণ।
৪. তিলাওয়াতে কুরআন।
৫. জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।

বিদায়া নিহায়া:১০/১১৭

লেখকের জীবনী

নাম: মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস ঘুম্মান

জন্মস্থান:৮৭ দক্ষিণ সারগোধা

কুরআন হিফজ: ভুড়ওয়ালী জামে মসজিদ, গখড়মন্ডি, গুজরানাওয়ালা।

তরজমা এবং তাফসীর: ইমামে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত মাওলানা সরফরাজ খান সাফদার দা. বা. নুসরাতুল উলুম মাদ্রাসা, গুজরানাওয়ালা।

দরসে নেযামী: (শুরু) জামিয়া বিন্নুরীয়া করাচী। (শেষ) জামিয়া ইসলামীয়া ইমদাদীয়া ফয়যাবাদ।

শিক্ষকতা: (সাবেক) শায়েখ যাকারীয়া ইনস্টিটিউট, চিটা, জাম্বিয়া, আফ্রিকা।

মুয়াল্লিম মারকাজে ইছলাহুন নিসা, ছারগুদা।

বাৎসরিক ৪০ দিন ব্যাপি সীরাতে মুস্তাক্বিম কোর্স, ছারগুদা।

জিহাদী কার্যক্রম: খুস্ত, গরদীয, জালালাবাদ, কাবেল, বামিয়নের রানাঙ্গনে বীরত্বের সাথে কাজ আঞ্জাম দিয়েছিলেন।

বন্দি জীবন:

১. ৫ই আগস্ট ১৯৯৬ থেকে ৫ই আগস্ট ১৯৯৮ পর্যন্ত দুই বছর।
ছারগুদা,ফয়যাবাদ,এবং মিয়ানওয়ালির বিভিন্ন জেলে।

২. ২৯ সে আগস্ট ১৯৯৯ থেকে ২৯ সে সেপ্টেমম্বর ১৯৯৯ পর্যন্ত এক মাস। চুহাঙ্গ জেলে।

৩. ৩০ সেপ্টেমম্বর ১৯৯৯ থেকে ৭ই অক্টবর ২০০২ পর্যন্ত তিন বছর। জেলহাম, ভাহাওয়াল পুর এবং রাওয়াল পেন্ডির বিভিন্ন জেলে।

৪. ১৭ই অক্টবর ২০০৩ থেকে ১৮ই নবেম্বর ২০০৩ পর্যন্ত এক মাস নযর বন্দি ছারগুদা ডিষ্টিক জেলে।

৫. ৩ই ফেব্রুয়ারী ২০০৫ থেকে ২৯ সে এপ্রিল ২০০৫ পর্যন্ত দুই মাস ২৬ দিন। ছারগুদা ডিষ্টিক জেলে।

পদবী: (সাবেক) আমীর হরকতুল আনসার, পাঞ্জাব প্রদেশ।

(সাবেক) ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারী,হরকতুল মুজাহিদীন, পাকিস্তান।

তাবলীগের সফর: আযাদ কাশ্মির, সাউদ আফ্রিকা, মালাওয়ী, জাম্বিয়া, কেনিয়া, সিঙ্গাপুর, সাউদি আরব।

বর্তমান জিম্মাদারী: মহা সচিব মারকাজে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ছেরগুদা।

মহা সচিব মারকাজে ইসলাহুন নিসা ছেরগুদা।

রচনা বলী: জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ পর ইরতিরাযাত কা ইলমী যায়েযা, যুবদাতুস সামায়েল (শামায়েলে তিরমিজীর শরাহ), ক্বয়দীকে তারানে, সাত নাম্বার।

বাইয়াত ও খিলাফত: আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মোহাম্মদ আখতার সাহেব দা. বা.

ইছলাহ ও ইরশাদ: খানকায়ে আশরাফিয়া আখতারিয়া, ৮৭ দক্ষিন ছারগুদা।